রহস্যভেদী

মেঘনাদ সমগ্র

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

www.banglabooks.in
www.banglabooks.in

It isn't original cover page

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

রহস্যভেদী

মেঘনাদ সমগ্র

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

RAHASYAVEDI MEGHNAD SAMAGRA
By Swapan Bandyapadhyay
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণে ঃ
ভাগীরথী প্রেস

ISBN-81-7334-165-6

মুখবন্ধ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই দীর্ঘকায় সুঠাম সুপুরুষ, অথচ সদাহাস্যময় এক প্রাণশক্তি। কিন্তু এই শক্তি যে কলমের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে, তা এই লেখকের লেখা গল্প-উপন্যাসগুলো পড়লেই টের পাওয়া যায়। আতীব্র প্রাণশক্তির আধার এই লেখকেরে হাতে ধরা কলম দুর্নিবার বেগে এগিয়ে চলে রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার-কল্পবিজ্ঞানের দম-আটকানো কাহিনীর পর কাহিনী রচনায়। আর যখন দেখি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নায়ক মেঘনাদ ভরদ্বাজ গভীর রসবোধ দিয়ে প্রহেলিকার জাল নিপুণ ভঙ্গিমায় রচনা করে, অনায়াস কৌশলে তা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যাচ্ছে—তখন মনে হয় লেখক মনসায়রে ডুব দিয়ে নিজের অন্তর্জগতের ছবিই পাতার পর পাতা জুড়ে এঁকে যাচ্ছে। মেঘনাদ নামকরণের মধ্যেই রয়েছে মেঘগম্ভীর ধ্বনি, কাহিনীর মধ্যে রয়েছে মেঘমন্দ্র তুল্যশব্দ, প্রতিটি উপাখ্যানে রয়েছে মেঘাড়ম্বর, রহস্য-মেঘঙ্কর আলেখ্য-নিচয়ের মেঘ-আন্ধারী কিন্তু তা সুতীর বুদ্ধিবাণে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যাচ্ছে মেঘনাদ স্বয়ং!
তাই তো বলি সার্থক নামকরণ। সার্থক কল্পনাবিন্যাস। রহস্যভেদী মেঘনাদ তার প্রতিটি রহস্যভেদের কাহিনীতে রহস্যনিবিড় ইন্দ্রজালে ইন্দ্রধনুর রোশনাই বিকীরণ ঘটিয়েছে, ছোটদের অ্যাডভেঞ্চারের পিপাসা মিটিয়েছে—এবং কোন গল্প উপন্যাসে কিশোর মনগুলোয় রোপন করে গেছে বিজ্ঞানের গুটিকা।

মেঘনাদ আমাকে মুগ্ধ করেছে তার প্রথম আবির্ভাব থেকেই—যেমন করেছে মেঘনাদ চরিত্রের শিল্পী। আনন্দের রসদগুলো এতদিন ছোট ছোট বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল— এই প্রথম বেরুচ্ছে রহস্যভেদী মেঘনাদ সমগ্র—দীর্ঘ প্রত্যাশার পর। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি হয়েছি। যারা পড়বে, তারাও খুশিতে ফেটে পড়ে মেঘনাদ-মায়ায় নিবিষ্ট হবে, এ বিশ্বাসও রাখছি। কারণ, প্রতিটি পংক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে ম্যাজিক! শব্দের ম্যাজিক, কল্পনার ম্যাজিক, রহস্যভেদের ম্যাজিক!

অদ্রীশ বর্ধন

এই লেখকের অন্যান্য বই

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

দ্বিতীয় বিশ্বের অভিযাত্রী

চিঙ্কার চিংড়ি বিভীষিকা

রহস্যভেদী মেসোদা

তিব্বতী গুম্ফার রহস্য

বিভীষিকা দ্বীপে সাথে সত্যপ্রকাশ

কিশোর কল্পবিজ্ঞান

লুসাই পাহাড়ের ভয়ঙ্কর

সাহেব বাংলোর ভূত

ডঃ জীমূতবাহনের বিচিত্র জগৎ

সেদিন মহেঞ্জোদাড়ো

[illegible] পাহাড়ের হাতছানি

তুষার মানবের দেশে

ডাইনোসরের হারানো জগৎ

নিজেই করো গোয়েন্দাগিরি

সেরা অ্যাডভেঞ্চার

স্পাইরা পাশেই আছে

আতঙ্কের দ্বীপ

আবার ড্রাগন পাহাড়ে

প্রকাশের [illegible] নতুন গল্প

পরম কল্যাণীয় অনুজ

শ্রীমান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

—দাদা

নিবেদন

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য রহস্যভেদী মেঘনাদ অর্ণব জুটির প্রথম দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চার। সম্প্রতি এই জুটি বাংলার কিশোর পাঠকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রসঙ্গতঃ ডাইনোসর নিয়ে বিশ্বজুড়ে জুরাসিক পার্ক এর মাতামাতি শুরু হবার অনেক আগেই এই লেখক বাংলায় কল্পবিজ্ঞানে ডাইনোসর সৃষ্টির মৌলিক উপাখ্যান রচনা করে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছেন।

এক

[এক অবিশ্বাস্য চিঠি]

ঘরে ঢুকতেই সর্বপ্রথমে চোখে পড়ল বই-এর মলাটটা। মলাটে অদ্ভুত জীবন্ত একটা প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের ছবি। থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম—ফিজিক্যাল ফিজিওলজি। লেখক—লিড অ্যান্ড জুডান।

মেঘনাদ আমার উপস্থিতি টের পায় নি। সোফায় আধশোয়া ভাবে বসে একমনে বইটা পড়ে চলেছে।

অগত্যা গলাঝাড়া দিতে হল। মনোযোগী পাঠকের ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায় অনির্দিষ্ট কাল তো আর অপেক্ষা করা যায় না।

মেঘনাদ আমার দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—আরে অর্ণব, এতক্ষণ তোর অপেক্ষাতেই ছিলাম। আমি কিন্তু একেবারে রেডি!

ঘরের দিকে এতক্ষণ নজর দিই নি। এবার দেখলাম—সুটকেশ, সাইড ব্যাগ সব গুছোন, এমন কি সেগুলো ঘরের কোণে নিখুঁত ভাবে সাজানো পর্যন্ত রয়েছে।

—তুই যাচ্ছিস তো আমার সঙ্গে?

মেঘনাদের কথা শুনে এবার সত্যিই হাসি পেল। ও কি আমার সম্মতির অপেক্ষায় কখনও বসে থেকেছে? আর সেই মুহূর্তে আমার ভাবনার প্রতিধ্বনিটাই শুনতে পেলাম ওর মুখে—আমি কিন্তু তোকে না জানিয়েই দিল্লি কালকা মেলের দুখানা বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছি। আজ রাত আটটা পঁয়ত্রিশে ট্রেন হাওড়া ছাড়বে।

আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই আকস্মিক। আজই দুপুরে মেঘনাদ আমার অফিসে হঠাৎ ফোন করেছিল—কথা একটাই, পরের দিন থেকে কমসে-কম পনের দিনের ছুটি নিয়ে যেন ওর সঙ্গে আজই দেখা করি।

আমি স্বভাবতই জানতে চেয়েছিলাম, কারণটা কি? ও শুধু বলেছে ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এর বেশি আর ভাঙতে চায় নি।

আমিও অবশ্য খুব বেশি জেদাজেদি করি নি। মেঘনাদের স্বভাবটা ভালমতো জানি বলেই। মেঘনাদ আমার সব থেকে নিকট বন্ধু। স্কুল, কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, যদিও কর্মক্ষেত্রে দুজনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি সরকারী অফিসের মসীজীবী আর মেঘনাদ চাকরি করে এক পাক্ষিক সংবাদ-পত্রিকার অফিসে। সাংবাদিক এবং সেই সঙ্গে মিলিটারীর একজন এক্সসার্ভিস ম্যান। জার্নালিজম পাশ করে কি খেয়াল হতে মিলিটারীতে ঢুকেছিল। তারপর সেখানকার কার্যকাল শেষ

হয়ে যাবার পর গত বছর থেকে পাক্ষিক 'তাজা খবর'-এ রিপোর্টারের চাকরিটা নিয়েছে। কিন্তু দুঃসাহসের নেশাটা ছাড়তে পারেনি। পত্রিকার মালিক হরিসাধনবাবুও খুব চালাক লোক। এসব ব্যাপারে মেঘনাদকে বরং উৎসাহিতই করেন—অবশ্যই তাঁর পত্রিকার বৃহত্তর স্বার্থে। আর আমি মেঘনাদকে শুধু বন্ধু হিসেবেই ভালবাসি না, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভরসা করি। শ্রদ্ধা করি ওর সাহস আর বুদ্ধিকে। কোন কিছুতেই ওকে কখনও নার্ভাস হতে দেখি নি, ভয় পেতেও না। বরং যে কোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পাড়াটাই বোধহয় ওর নেশা।

তাই মেঘনাদ যখন ফোনে সংক্ষেপে ওর বক্তব্য সারলো তখনই বুঝলাম নতুন কোন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে ও। সুতরাং আমায় সঙ্গে না নিয়ে ছাড়বে না।

মেঘনাদের সামনে বসেই কথাগুলো ভাবছিলাম।

হঠাৎ মেঘনাদ বলল—ক্যাপ্টেন সিংকে তোর মনে আছে?

—ক্যাপ্টেন সিং। মনের মধ্যে আমি হাতড়াতে থাকি।

—হ্যাঁ রে, মিলিটারীতে থাকতে আমার খুব বন্ধু ছিল। তোর সঙ্গেও তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। লম্বা চওড়া বিশাল চেহারা। আমায় খুব পছন্দ করতো।

এবার মনে পড়েছে। বললাম—হঠাৎ ক্যাপ্টেন সিং-এর প্রসঙ্গ তুললি যে?

—ক্যাপ্টেন সিং এখন আছেন ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয়-পাদদেশে শিনকি গিরিসংকট অঞ্চলে। এখানে টহলদারী এক ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তিনি। কয়েকদিন আগে সিং আমায় একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। চিঠিটা তুই পড়ে দেখতে পারিস।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে কয়েক পৃষ্ঠার একটা দীর্ঘ চিঠি মেঘনাদ আমার দিকে এগিয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদকে যা লিখেছেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। সত্যিই, চিঠির বক্তব্য ভারি অদ্ভুত এবং সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য।

হিমালয়-পাদদেশে গভীর অরণ্য অঞ্চল শিনকি গিরিসংকট এলাকায় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে। সেখানে নাকি এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের আবির্ভাব হয়েছে, সেই অঞ্চলের এক আদিবাসী সম্প্রদায় এই ড্রাগনকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে এবং প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে একটি করে জীবন্ত মানুষ নিবেদন করে ড্রাগন দেবতার নৈবেদ্য হিসেবে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে চলেছে গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ। কত বছর তা ক্যাপ্টেন সিং বলতে পারেন না, কারণ ওই আদিবাসী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে আশ্চর্য গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে এবং ওরা আশপাশের সমস্ত ট্রাইব থেকে বিচ্ছিন্ন এক ভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে। তবে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যার ফলে ওদের সম্পর্কে সরকারী কর্তাদের টনক নড়ে গেছে। তবে ক্যাপ্টেন সিং যেটুকু অনুসন্ধান করে জেনেছেন তাতে তিনি স্থির নিশ্চিত যে একটা

কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার দিনের পর দিন ঘটে চলেছে ওখানে। এমন কি ভয়ঙ্কর ড্রাগন আকারের বিশাল এক জানোয়ারকে নিজের চোখে একদিন পাহাড়ী পথে হাঁটতে দেখেছেন তিনি। বীভৎস তার আকৃতি। লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুটের মতো। সামনের পা দুটো ছোট ছোট। পেছনের দুটি পা এবং ল্যাজের উপর ভর দিয়ে হাঁটে। তার অমানুষিক গর্জনে পাহাড়ের চাঙড় পর্যন্ত নাকি ভেঙে পড়ে—লিখেছেন ক্যাপ্টেন সিং।

ভারত সরকার ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক গোপন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে ভার পড়েছে ক্যাপ্টেন সিং-এর উপরই। এখানকার পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকঅবস্থা সম্পর্কে সরকারী তরফে সব থেকে বেশি পরিচিত তিনিই।

ক্যাপ্টেন সিং এ তদন্তের ব্যাপারে মেঘনাদের কাছে প্রত্যক্ষ সাহায্য চান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আরো তথ্য তিনি মেঘনাদকে সাক্ষাতে জানাবেন।

চিঠিটা পড়তে পড়তে সব কিছুই আমার কাছে অস্বচ্ছ মনে হচ্ছিল। রূপকথার ড্রাগন কি কখনও বাস্তবে সত্য হতে পারে?

চিঠিটা পড়া শেষ করে মেঘনাদের হাতে ফেরত দিতেই ও বলল—কি বুঝলি?

—কিস্যু না। স্রেফ ধোঁয়া। চীন জাপানের রূপকথার ভূত যে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সিং-এর মতো এক জাঁদরেল মিলিটারী অফিসারের ঘাড়ে চাপবে, তা আগে ভাবতেই পারি নি।

—তার মানে তুই বলতে চাস সবটাই গাঁজাখুরি?

—অন্ততঃ কষ্টকল্পনা তো বটেই। ওই সব অঞ্চল সম্পর্কে আজগুবি নানা ধরনের কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। ইয়েতি বা তুষারমানব নিয়ে কিছুদিন আগে কি কম হৈ চৈ হয়েছিল? আসলে নিঃসঙ্গ নির্জন এলাকায় বিভ্রান্তি খুব বেশি করে তাড়া করে বেড়ায়। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার কবলে প্রচুর লোক প্রাণ হারিয়েছে। একটু থেমে বললাম—ক্যাপ্টেন সিং হিমালয়ের পাদদেশে বর্তমানে যে অঞ্চলে বাস করছেন সেখানে এমন ধরনের বিভ্রান্তি খুবই সম্ভব মেঘনাদ।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—কিন্তু সেখানে যেতে আমাকে হবেই অর্ণব। ক্যাপ্টেন সিংকে আমি আজই সকালে টেলিগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দুই

[মেঘনাদের ফিজিক্যাল ফিজিওলজি]

অগত্যা আমাকেও সেই দিনই দিল্লি কালকা মেলের যাত্রী হতে হল।

মনে যাই ভাবি, সমস্ত ব্যাপারটা আমার যতই অবাস্তব মনে হোক, মেঘনাদকে আমি কখনও অস্বীকার করতে পারি নি।

আমি জানতাম একবার যখন মনস্থ করেছে, এ সংকল্প থেকে মেঘনাদকে নড়ানো যাবে না।

তাছাড়া লোকসানটাই বা কোথায়? ড্রাগন রহস্যের মীমাংসা হোক বা না হোক এই সুযোগে কটা দিন বেড়িয়ে নেয়া তো যাবে। হিমাচল প্রদেশের ওই সব পাহাড়ী অঞ্চলে ইচ্ছে করলেই সব সময় বেড়িয়ে আসার সুযোগ হয়ে ওঠে না। অথচ সাধ বহুদিনের।

এতদিনে সে সাধ পূরণ হতে চলেছে।

গন্তব্য আমাদের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা ছাড়িয়ে তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি দুর্গম পাহাড়ী এলাকা শিনকি গিরিসংকটের নিকটবর্তী গিরি উপত্যকা।

তবে আপাতত এই ট্রেনে গিয়ে পৌঁছবো প্রথমে কালকায়। সেখান থেকে অন্য ট্রেন ধরে সিমলায়।

মেঘনাদ কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ফিজিক্যাল ফিজিওলজির সেই বইটা মুখে নিয়ে বসেছে—যার মলাটে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের ছবি আঁকা।

সেদিন রাত্রে আর মেঘনাদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হল না। টিফিনকেরিয়ারে লুচি, কষামাংস আর সন্দেশ ছিল। দুজনে খেয়ে দেয়ে আপার বার্থে লম্বা হলাম। ট্রেনের মিষ্টি দোলায় ঘুম আসতে দেরী হল না। রাত্রে যখন একবার ঘুমটা ভাঙলো, হাতঘড়িতে তখন রাত দুটো বেজে গেছে। ট্রেন বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে চলে এসেছে অনেক দূর। মেঘনাদ কিন্তু তখনও বইটা ছাড়ে নি। আশ্চর্য মনোযোগী পাঠক যা হোক।

পরদিন সকালে উঠে মুখ-টুক ধুয়ে বাথরুম সেরে কূপের ভেতর ঢুকে দেখি

মেঘনাদ আগের স্টেশন থেকে দু-ভাঁড় চা নিয়ে জমিয়ে বসে এক ভাঁড় চায়ে চুমুক দিচ্ছে। আমায় দেখে বলল—মুখে দিয়ে দেখ, দারুণ চাটা করেছে। স্টেশনগুলোতে সাধারণতঃ চায়ের নামে যা দেয়—আসলে বিশুদ্ধ গোমূত্র ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

লক্ষ্য করে দেখলাম তখনও মেঘনাদের পাশে সেই বইটা উপুড় করা রয়েছে।

বললাম, কি ব্যাপার বল তো, কদিন থেকে দেখছি ফিজিক্যাল ফিজিওলজির ওই বইটা একনাগাড়ে মুখে করে রয়েছিস?

—শুধু মুখে নয় বন্ধু, বলতে পারিস গিলছি। আসার আগে এটি আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে বাগিয়ে এনেছি। যতই পড়ছি ততই অবাক লাগছে।

—তা প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুরা আজ তো মানুষের কাছে বিস্ময় ভরা ইতিহাসই। বললাম আমি।

—সে কথাই সব নয় অর্ণব। পৃথিবীর ইতিহাসে ছ'কোটি ষাট লক্ষ বছর অতীত থেকে তেইশ কোটি বছরের ইতিহাস—যাকে বলে 'মেসোজায়িক' যুগ, তখন সারা পৃথিবীতে একচেটিয়া রাজত্ব করেছিল ওরাই—বিরাট বিরাট আকৃতির টাইরানোসরাস, স্টেগোসরাস, ব্রেকিওসরাস টেরোসরের দল।

—এরা তো প্রকৃতপক্ষে সবাই সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক বিদ্যের কিছুটা আমিও সুযোগ পেয়ে উগরে দিই।

কিন্তু মেঘনাদ আমার কথাকে মোটেই আমল না দিয়ে বলল, এদের চেহারাগুলোর কথা ভেবেছিস? কোন কোনটা আধুনিক কালের টিকটিকি গোসাপ প্রভৃতির হাজার গুণ বড় আর তেমনি হিংস্র। এদের মধ্যে ৫০ ফুট লম্বা আর ২০ ফুট উঁচু টাইরানোসরাস ডাইনোসররা ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তবে সবাই যে হিংস্র মাংসাশী ছিল তা নয়, বরং নিরামিষাশীই ছিল দলে ভারী। তেমন একটির নাম ডিপ্লোডকাস। এরা লম্বায় কত বড় ছিল জানিস অর্ণব? প্রায় ৯০ ফুট।

—ওরে বাব্বা! এ তো দৈত্য দানবদের জগৎ!

—ঠিকই বলেছ বন্ধু। দশ পনের কোটি বছর আগে যখন বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই, তখন ওরাই সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করতো। আর শুধু কি ডাঙায়? আকাশও ছিল ওদের দখলে।

—তুই উড্ডুক্কু ডাইনোসরদের কথা বলছিস?

—হ্যাঁ। উড়ন্ত টেরোসর সরীসৃপের ডানা দুটি ছড়ালে দাঁড়াতো সাতাশ ফুটেরও বেশী। শিরদাঁড়া সরীসৃপের মতো। পা দুটো বাজপাখির মতো। চামড়ার ডানার মাঝে ছোট ছোট দুটি হাতের মতো, যার সাহায্যে ওরা গাছের ডাল বেয়ে অনায়াসে চলা ফেরা করতো কিংবা ছোঁ মেরে তুলে নিত ডাঙা বা জলের কোন ছোট প্রাণী, মাছ।

আমি বললাম, তা মেঘনাদ, হঠাৎ তুই এদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লি কেন বলতো?

মেঘনাদ বললো, ফিজিক্যাল ফিজিওলজি বইটা হাতে আসার পর থেকে ডাইনোসরদের ইতিহাস নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। এরা তো পৃথিবীরই আদি বাসিন্দা....

—'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'—ফস্ করে কবিগুরুর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

মেঘনাদ দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল, ঠিকই বলেছিস অর্ণব, পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী হয় না। না হলে চিন্তা করতে পারিস, এত ভয়ানক আকৃতি এবং প্রকৃতির জীবেরাও পৃথিবী থেকে হঠাৎই লুপ্ত হয়ে গেল প্রায় ছ'কোটি তিরিশ লক্ষ বছর আগে।

আমি বললাম, কিন্তু আমাদের বর্তমান অভিযানের সঙ্গে ডাইনোসর প্রসঙ্গের কোন যোগ আছে কি? তুই মিছিমিছি সময় নষ্ট করছিস মেঘনাদ।

—কোন কিছুই বৃথা যায় না বন্ধু। ড্রাগনের উদ্ভব সম্পর্কে চিন্তা করতে করতেই বিষয়টা সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

—তার মানে?

—মানেটা বোঝা কি খুব শক্ত? তুই তো জানিস, ড্রাগন চীন এবং জাপানী উপকথার এক ভয়ঙ্কর জীব। সরীসৃপ জাতীয়। বিরাট হিংস্র তার আকার। চোখ আর মুখের আগুনে এক একটা জনপদ সে ধ্বংস করে দিতে পারে।

—তুই কি বলতে চাস?

—আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, ড্রাগনের আকার প্রকার এবং আচরণের সঙ্গে আমি যেন সেই কোটি কোটি বছর আগের সরীসৃপ জাতীয় ডাইনোসরদের একটা অদ্ভুত মিল পাচ্ছি।

আমি কিছুটা বোকার মতোই তাকিয়ে রইলাম মেঘনাদের দিকে। বুঝতে পারলাম যে ও যা বলতে চায় তা ভাবতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে আরও তালগোল পাকিয়ে যাবে।

তিন

[ক্যাপ্টেন সিং উবাচ]

সিমলায় এসে পৌঁছলাম আরও কদিন পর সন্ধ্যে নাগাদ। ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদের টেলিগ্রাম পেয়ে নিজেই স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। সেনাবাহিনীর একজন যোগ্য অফিসার।

মেঘনাদকে দেখেই ক্যাপ্টেন সিং ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় তিন বছর বাদে দেখা দুজনের।

স্টেশনের কাছেই আমাদের জন্যে হোটেলের রুম বুক করা ছিল। আমরা হোটেলে উঠলাম। সঙ্গে লটবহর খুব বেশি ছিল না। যতটুকু না নিলে নয়। এ ব্যাপারে মেঘনাদের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

সেদিন রাতটা তাড়াতাড়িই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপ্টেন সিং বলে গেলেন পরদিন সকালে এসে তিনি কথা বলবেন।

পরদিন সাত সকালেই ক্যাপ্টেন সিং এসে হাজির। আমরা তখন হোটেলের রুম-এ বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি—টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা আর চা।

ক্যাপ্টেন সিং এসে পড়াতে আমরা ওঁর জন্যেও ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলাম। লক্ষ্য করলাম, ক্যাপ্টেন সিং-এর হাতে একটা বড় ঠোঙায় বেশ কয়েকগুচ্ছ টাটকা আঙুর। সিমলার আঙুর ভারী মিষ্টি। মেঘনাদ তো ভারী খুশি।

চা খেতে খেতে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন সিং আপাতত উঠেছেন এখানকার এক মিলিটারী ক্যাম্পে।

চায়ে চুমুক দিয়ে উনি বললেন—মেঘনাদ ভাইয়া, হিমালয় পর্বতমালার নীচে এই পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় এখনও এমন অনেক রহস্য আছে যা ভাবনার বাইরে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ পর্যন্ত পড়ে নি। সে সব এলাকার যারা অধিবাসী তারা এখনও রয়ে গেছে সেই প্রাচীন জীবনযাত্রায়--যার অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়। সভ্য মানুষ যদি কখনও সেখানে প্রবেশ করে, সেই সব আদিবাসীর দল তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। নিজেদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, বিশ্বাসের কথা কিছুতেই তারা প্রকাশ করে না। শিনকি উপত্যকা এমনই এক দুর্ভেদ্য

রহস্যময় অঞ্চল।

মেঘনাদ বলল, জায়গা মোটামুটি কোথায় বলতে পারেন ক্যাপ্টেন?

—জায়গাটা হিমাচল প্রদেশের প্রান্তদেশে। কিছু দূরেই শুরু হয়েছে তিব্বতভূমি। ক্যাপ্টেন সিং বলতে লাগলেন। পাইন, ফার ইত্যাদি পাহাড়ী গাছগাছালির অরণ্যঘেরা একটা দুর্ভেদ্য পাহাড়ী অঞ্চল। যে পাহাড়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে আগেই চিঠিতে জানিয়েছি তারা ভারী অদ্ভুত জাতের। আশপাশের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের সঙ্গেও তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তাদের সঙ্গে ভাব জমানোও সহজ কথা নয়। তবু অনেক কষ্টে তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যার অনেক ব্যাখা আমি আজও খুঁজে পাই নি।

—আপনি তো ওই শিনকি উপত্যকা অঞ্চলেই এখন আছেন? মেঘানাদ প্রশ্ন করে।

—বলতে পারেন কাছাকাছি। উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ যেহেতু বিষয়টা নিয়ে আগ্রহী তাই ও ব্যাপারে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হয়ে ও জায়গা থেকে কিছু দূরে সীমান্ত এলাকায় ওই কাজের অনুসন্ধানের জন্যেই যে মিলিটারী 'বেস' করা হয়েছে সেখানেই থাকতে হয়।

পাহাড়ী ড্রাগন কি আপনি নিজে ওই অঞ্চলেই দেখেছেন ক্যাপ্টেন সিং? প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে ঘোরাফেরা করছিল, এবার দুম করে ছুঁড়ে দিই।

ড্রাগনের প্রসঙ্গ উঠতেই ক্যাপ্টেন নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, সত্যি বলতে কি ওটা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো আমিও বিশ্বাস করতাম না অর্ণববাবু। এমন কি সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও আমার কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

—ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলুন তো? মেঘনাদ সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালো।

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কয়েক সেকেন্ড মনে মনে বক্তব্যটা একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপর ক্যা'প্টেন শুরু করলেন তাঁর কাহিনী ঃ

শিনকি গিরি উপত্যকা এলাকায় যে আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে তাদের সম্পর্কে বেশ কিছু গুজব দীর্ঘদিন যাবৎই ওই অঞ্চলে ছড়ানো আছে। বলতে কি ওরা সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন বিচিত্র জীবনধারা অনুসারী। অন্য আদিবাসী ট্রাইবদের ধারণা, ওরা বিচিত্র ভয়াবহ দানবের উপাসক। যাকে ওরা বলে ড্রাগন দেবতা।

কয়েক বছর আগে এক টহলদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। তখন থেকেই এই জংলী গুজব সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড হই। আসলে ব্যাপারটা কি জানতে হবে, কী এমন গোপনীয়তা আছে ওই বিশেষ ট্রাইবটির জীবনধারায়।

ভাবনা যত সহজ, কাজটা কিন্তু তত সহজ মোটেই নয়। দিনের পর দিন নানাভাবে চেষ্টা করেছি ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে। নানা উপহারসামগ্রী রেখে

এসেছি ওদের কাছাকাছি। নানা উপকার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু তবু ওরা পারতপক্ষে পাত্তা দেয় নি। অবশেষে অনেক কষ্টে কিছুটা পরিচয় হল ওই গ্রামের এক আদিবাসী তরুণ পিংলার সঙ্গে। শক্ত-সমর্থ-সবল-তাজা দেহ। নানারকম সুখাদ্য আর উপহারে ওর মন ভেজালাম। আগুন-ছোড়া যন্ত্র অর্থাৎ বন্দুক চালাতে শিখিয়ে দিলাম পিংলাকে। ও আমার বশ মানল। ওর মুখ থেকেই জানলাম ওই আদিবাসীদের জীবনের কিছু গূঢ় তথ্য।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম ক্যাপ্টেন সিং-এর কাহিনী। মাঝপথে একবারও বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না।

যা জানলাম তা আমার অনুমানের থেকেও অদ্ভুত। এই বিংশ শতাব্দীতে তা রূপকথা মনে হয়। ক্যাপ্টেন সিং আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে ওরা ড্রাগন দেবতার ভোগে নিবেদন করে একজন করে শক্তসমর্থ যুবাপুরুষ। গ্রামের প্রান্তে একটা বেদীতে হাত পা বেঁধে সেই তরুণটিকে মন্ত্রপুত করে ফেলে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে ড্রাগন দেবতার বাহন নিজে এসে তার সেই পূজার ভোগ অর্থাৎ যুবাপুরুষটিকে মুখে করে নিয়ে যায়।

—এও কি সম্ভব। মেঘনাদ হাতের সিগারেটটা পর্যন্ত টানতে বিস্মৃত হয়েছে।

—হ্যাঁ মেঘনাদ ভাইয়া। আরও আশ্চর্য হল সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে একজন আদিবাসী ওঝা বা পুরোহিত এবং সে কিন্তু পুরুষ নয়—একজন নারী।

নারী ওঝা। মেঘনাদ বেশ অবাক হয়েই বলে—বুনো আদিবাসীদের মধ্যে এমন কোন রীতির কথা আমার জানা নেই। এইসব আদিবাসী সম্প্রদায় সাধারণতঃ মেয়েদের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য করে এবং তাদের কোন বিশেষ সম্মান দেয় না--একমাত্র সম্পূর্ণভাবে মাতৃতান্ত্রিক কিছু গোষ্ঠী ছাড়া। এরা কি তেমন কোন গোষ্ঠীর...

—না মেঘনাদ ভাইয়া। ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদের কথা শেষ করার আগেই বললেন—এই বিশেষ ক্ষেত্রটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ওরা পুরুষ-শাসিত। আমি যতদূর সম্ভব খোঁজ নিয়েছি।

—আশ্চর্য! কথাটা মেঘনাদ খুব অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলেও আমার কান এড়ায় না।

ক্যাপ্টেন সিং আবার শুরু করলেন, ওদের বিশ্বাস ড্রাগন দেবতা বাস করেন শিনকি উপত্যকা থেকে কিছু দূরে এক পার্বত্য এলাকায়। জায়গাটার ওরা নাম দিয়েছে 'ড্রাগন পাহাড়'। সেখানে নাকি কেউ গেলে আর ফিরে আসে না। ড্রাগন দেবতার অভিশাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই সে পাহাড়ের ধারে কাছেও কেউ যায় না তারা।

—এ বিশ্বাস কতদিন ওদের মধ্যে আছে কিছু জানতে পেরেছেন? মেঘনাদ প্রশ্ন করল। ও প্রথমে বলতে রাজী হয় নি। শেষ পর্যন্ত জানিয়েছে ড্রাগন দেবতার পুজো

ওদের মধ্যে বহুকাল যাবৎ চলে এলেও ড্রাগন দেবতাকে জ্যান্ত মানুষ ভোগ দেবার রীতিটি খুব বেশিদিনের নয়। সম্ভবতঃ এখনকার সর্দারের বাবার আমল থেকেই নাকি শুরু হয়েছে।

—আর ওই নারী ওঝা? ও কতদিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?

—এ সম্পর্কে পিংলার কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারি নি। তবে মনে হয়েছে গ্রামটিতে তার অসীম প্রতাপ। সবাই সম্বোধন করে, 'দেবীরানী'।

—'দেবীরানী।' মেঘনাদ কথাটা শুনে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে ক্যাপ্টেন সিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ওঝা 'দেবীরানী'কে আপনি নিজের চোখে কখনও দেখেছেন ক্যাপ্টেন সিং?

—সম্ভব হয় নি। আর পিংলাও যা বর্ণনা দিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে তার চেহারার গঠনের সঙ্গে নাকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কারুরই বিশেষ মিল নেই আর বয়স কত কেউ তা জানে না। কেউ বলে তিরিশ কেউ বলে পঞ্চাশ বা ষাট আবার কারুর মতে নাকি দু'তিনশোর বেশি। ক্যাপ্টেন সিং বললেন।

এরপর আর কেউ তেমন কথা বলল না। তারপর মেঘনাদই নীরবতা ভাঙল- আর সেই ড্রাগন, সেটাকে আপনি দেখলেন কোথায়?

ক্যাপ্টেন সিং আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, মেঘনাদের কথায় থমকে গিয়ে সিগারেটটা না ধরিয়েই বললেন—ড্রাগন পাহাড়ের দিকে আমি নিজেই একদিন গিয়েছিলাম।

চার

[ভয়ঙ্কর ড্রাগন]

—ড্রাগন পাহাড়! মানে পাহাড়ী আদিবাসীরা যেখানে সেই ড্রাগন দেবতা বাস করে বলে বিশ্বাস করে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ অর্ণববাবু। এ ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র মাস খানেক আগে। আসলে দীর্ঘদিন এ সম্পর্কে নানা ধরনের সংস্কার আর গুজব শুনতে শুনতে ইচ্ছেটা মনে জেগেছিল বহু আগেই। পিংলাকে ইচ্ছের কথাটা জানিয়ে অভিযানের সঙ্গী হতেও বলেছিলাম। কিন্তু প্রস্তবটা শুনে ও এত ভয় পেয়েছিল, মনে হয়েছে ওকে যেন 'মৃত্যু-কূপে' ঝাঁপ দিতে বলা হচ্ছে। নিজে তো রাজী হলই না, আমাকেও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। ওর বক্তব্য ওখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। ওদেরই দু' একজন অবাধ্য হঠকারী নাকি যাবার চেষ্টা করে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

বুঝলাম, পিংলা প্রাণ থাকতেও আমার সঙ্গী হবে না। কিন্তু আমার সংকল্পও টললো না। অগত্যা কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন দিনের বেলা একেবারে একা ড্রাগন পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

ক্যাপ্টেন সিং তাঁর সাহসী অভিযানের কাহিনী শুরু করলেন। আমাদের কৌতূহল তখন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন সিং-এর ভাষায়—পাহাড়ের কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছলাম প্রকৃতিতে সন্ধ্যের ঘোর নেমেছে। একটু আগেই সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার নেমে আসছে পাহাড় ডিঙিয়ে। জায়গাটা অদ্ভুত স্তব্ধ। কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। একটা সম্বর কিংবা কাঠবিড়ালীও চোখে পড়ল না কোথাও। মনে পড়ল পিংলার সাবধান বাণী- 'ড্রাগন পাহাড় সবার কাছেই নিষিদ্ধ এলাকা।'

হাতে টর্চ, কাঁধে বন্দুক নিয়ে পাহাড় ভেঙে এগিয়ে চললাম ড্রাগন পাহাড়ের আরও ভেতর দিকে। ফার আর পাইনের জঙ্গল দূরে মাথা নাড়াচ্ছে। মনে হল ওরাও যেন আমায় নিষেধ করতে চায়। ড্রাগন পাহাড় মানুষের জন্যে নয়, অন্য

দেবতার আশ্রয়স্থল।

কতক্ষণ হেঁটেছিলাম খেয়াল নেই। একটা পাহাড়ী উপত্যকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিলাম....।

হঠাৎ কানে এল এক অদ্ভুত গর্জন। সে আওয়াজের সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। অমন গর্জন কোনদিন শুনি নি আমি। সিংহের গর্জন তার কাছে তুচ্ছ, বরং কালবৈশাখীর রাতে যখন বজ্রপাত হয় সে ভয়ঙ্কর আওয়াজের সঙ্গে সেদিনের শোনা গর্জনের কিছুটা তুলনা মেলে। আমি চমকে তাকালাম। দূরে সমস্ত পাহাড়ী উপত্যকাটা জুড়ে ওটা কি? সামনে পাহাড়। পথ বন্ধ করে ওটা কি কোন পাহাড়-প্রাচীর? কিন্তু একটু আগেই পথ খোলা দেখেছি, তবে এক্ষুনি পথ বন্ধ হয়ে গেল কি করে? আবার সেই গর্জন...মনে হল সামনের ওই পাহাড় থেকেই গর্জনটা ভেসে আসছে...একটু বাদে ওটা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিসীমায় এল। অন্ধকারটা সরে যেতে বুঝলাম, সামনের ওটা কোন চলন্ত পর্বত নয়—পর্বতপ্রামাণ উঁচু এক অদ্ভুত প্রাণী। অনেকটা সরীসৃপের মতো চেহারা, তবে তুলনায় অনেকগুণ বড়। পেছনের দুটি পা ও ল্যাজে ভর দিয়ে হেঁটে আসছে। সামনের পা দুটি সেই অনুপাতে ছোট। মুখটা লম্বাটে। হাঁ করতেই লম্বা জিভটা বেরিয়ে আসছে ঘন ঘন। সমস্ত জন্তুটার আয়তন অন্ততঃ চল্লিশ ফুটের কম হবে না। গর্জনটা আবার শোনা গেল। সেটা বেরিয়ে আসছে ওই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার গলা থেকে।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ক্যাপ্টেন সিং-এর প্রতিটি কথা ও যেন গোগ্রাসে গিলে চলেছে। কিন্তু এ কোন্ অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন সিং।

ক্যাপ্টেন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টান মেরে আবার শুরু করলেন—

জানোয়ারটা সামনের দিক থেকে আমার কাছে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। এগোবার উপায় নেই। এক মাত্র পথ পশ্চাৎ অপসারণ। একটা বন্দুকের গুলি জানোয়ারটার কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে মনে হল না, তার আগেই ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মনে পড়ল শিনকি গিরি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসীদের বিশ্বাসের কথা। ওরা জীবন্ত ড্রাগন দেবতার পুজো করে। সেই দেবতা এবং তার বাহনের আস্তানা ড্রাগন পাহাড়ে। এই কি তবে সেই ড্রাগন?

জানোয়ারটা বোধহয় ততক্ষণে আমায় দেখতে পেয়েছে। ঘন ঘন ল্যাজ আছড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন। সারা পাহাড় কম্পিত করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার মনের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল—পালাও ক্যাপ্টেন সিং, না পালালে মরণ তোমার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের দূরত্ব কমে আসছে....আরো....আরো....!

শেষ পর্যন্ত আমাকে পালাতেই হল মেঘনাদ ভাইয়া, কারণ এক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ করতে যাওয়ার একটাই অর্থ—তা হল আত্মহত্যা।

ক্যাপ্টেন সিং থামলেন। খানিক নীরবতা। তার পর বললেন—ড্রাগন পাহাড় থেকে আমায় পালিয়ে আসতে হয়েছে কিন্তু সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করেছি এ রহস্য উদ্ঘাটন আমি করবোই আর তাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে আগে আমার তোমার কথাই মনে পড়েছে মেঘনাদ ভাইয়া।

আমি কিন্তু বিস্ময়ে সত্যিই মূক হয়ে গেছি। ক্যাপ্টেন সিং এতক্ষণ যা বললেন তা যদি মেনে নিতে হয় তবে পৃথিবীতে ড্রাগন অস্তিত্বকে সত্যি বলে স্বীকার করে নিতে হবে। চল্লিশ ফুট লম্বা, সরীসৃপ জাতীয় জীবের বর্ণনার সঙ্গে ড্রাগনের অনেকটাই মেলে কিন্তু তাই বলে রূপকথার জগৎ যদি বাস্তবে সত্য হয়ে ওঠে তবে তো মানুষের বাস্তব ধ্যান-ধারণাগুলো প্রচণ্ডভাবে আহত হবে। তবে কি মেঘনাদ সেদিন ট্রেনে যা বলেছিল তেমন কোন প্রাণীর সত্যিই আবির্ভাব ঘটেছে এই বিংশ শতাব্দীতে? সেই প্রাগৈতিহাসিক বিশালাকৃতি টাইরানোসরাস বা স্টেগোসরাসের মতো জানোয়ার? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? তারা তো পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে আজ থেকে অন্ততঃ ছ' কোটি বছর আগে।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ক্যাপ্টেন সিং বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার একটার পর একটা রিং ছেড়ে যাচ্ছে।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল এই ভাবে। আমার কাছে মুহূর্তগুলো অস্বস্তিকর।

হঠাৎ মেঘনাদ মাথা তুলল। ক্যাপ্টেন সিং-এর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে বলল— শিনকি উপত্যকা এখান থেকে কত ঘণ্টার রাস্তা ক্যাপ্টেন সিং?

- সেটা পথের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ধ্বস পড়ে পাহাড়ী পথ যদি বন্ধ হয়ে না যায় তাহলেও একটা দিন তো লাগবেই। মেঘনাদের আগ্রহ লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন সিং-এর চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—আপনি জীপের ব্যবস্থা করুন। সম্ভব হলে আজই আমি যাত্রা করতে চাই। মেঘনাদ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়াল।

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
No 6585
11 Th-Finance Commission-Fund.
Dt 15/5/03
AGARTALA.

পাঁচ
[যাত্রা হল শুরু]

সিমলা ছাড়লাম পর দিন সকালে। আগের দিনটা সবকিছু গোছগাছ করতেই সময় কেটে গেল। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যাবার উপযোগী কয়েকটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিল মেঘনাদ। তার মধ্যে অবশ্যই আছে আমাদের দুজনের জন্যে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র—রিভলবার। আদিবাসীদের জন্যে নানা রঙচঙে এবং স্প্রিং-এর খেলনা কিনলো মেঘনাদ আর সেই সঙ্গে ফিলিপ্স্ কোম্পানীর একটা অলওয়েভ রেডিও ট্রানজিস্টার। ওটা এ অভিযানে মিছিমিছি সঙ্গে নেওয়া হল বলে মেঘনাদকে তখন কথা শুনিয়েছিলাম বটে কিন্তু সত্যিকারেব কত উপকার যে সেটা কবলো তা বুঝলাম আরও কদিন পরে। সে কথা যথাসময়ে বলবো।

আমার কিন্তু এভাবে তাড়াহুড়ো করে সিমলা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না বরং ভেবেছিলাম দু'একদিন এখানে থেকে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী এই পার্বত্য নগরীর সৌন্দর্যের স্বাদ অন্তত্ঃ কিছুটা উপভোগ করি।

কিন্তু মেঘনাদ জোর তাগাদা লাগাল। অগত্যা মনের ইচ্ছে মনেতেই চেপে রাখতে হল।

ঠিক সকাল সাতটা নাগাদ ক্যাপ্টেন সিং-এর মিলিটারী জীপ আমাদের নিয়ে সিমলা থেকে যাত্রা শুরু করল।

আমাদের এবাবে লক্ষ্য কার্টবোড ধরে নারকান্দাব ওপর দিয়ে সুদূর শিনকি উপত্যকা।

জীপের স্টিয়ারিং হুইল ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন সিং নিজেই। কযেক মাইল রাস্তা যেতেই বুঝলাম ক্যাপ্টেন সিং একজন সুদক্ষ চালক।

দুর্গম পাহাড়ী চড়াই উৎরাইয়ের পথ ধরে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের জীপ। যাত্রাপথে কোথাও রুক্ষ পাহাড়। পাহাড়ভাঙা সরু রাস্তা। রাস্তার পাশেই গভীর খাদ। গাড়ি কোন রকমে বেসামাল হলেই পাহাড়ী খাদে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পথের ধারে কোথাও বা পাইনের জঙ্গল। দূর থেকে মনে হয় পাহাড়গুলোর ওপর যেন প্রকৃতি সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলাম প্রকৃতির অপূর্ব বন্য রূপ। শহর-জীবনের নানা সমস্যায় বিব্রত জীবন এই মুহূর্তে যেন দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মাত্র।

—ক্যাপ্টেন সিং ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য আপনাকে ঠিক কবে থেকে প্রথম

ভাবাতে শুরু করল বলতে পারেন? মেঘনাদের কথায় আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

—সে প্রায় বছর খানেক আগেকার কথা। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সামনে পথের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন সিং বলতে লাগলেন—আমাদের মিলিটারীর একজন টহলদার জওয়ান মহীন্দরলাল জনশূন্য পাহাড়ী এলাকায় এক আদিবাসী যুবকের সন্ধান পায়। যুবকটি উদ্‌ভ্রান্তের মতো একা নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছিল পাহাড়ে পাহাড়ে। মহীন্দরলালকে দেখে সে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু মহীন্দর তাকে চটপট গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসে। যুবকটিকে আমার অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

—কেন?

—প্রথমতঃ আদিবাসী এলাকার মানুষ হয়েও কি এক অজ্ঞাত কারণে সে তার নিজেদের গ্রামে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই পাহাড়ে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়। দ্বিতীয়তঃ যুবকটিকে যেন কি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। তাই কোন কিছু বলা তো দূরের কথা, কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে যেন শিউরে উঠছিল। সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গে তার অতীত স্মৃতির কোন চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে কিছু বার করতে পারিনি, তবে এটুকু বুঝেছিলাম ও আসছে ড্রাগন পাহাড়ের ওপার থেকে। হয়তো ওখানকার আদিবাসী প্রথায় ওকেও কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছিল। জীবন্ত ড্রাগন দেবতার বাহন তাকে হয়তো নিয়েও গিয়েছিল ড্রাগন পাহাড়ের ওপরে কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক সে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তবু আতঙ্ক তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে।

—যুবকটি আছে এখনও? মেঘনাদ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে।

—না হ্! ক্যাপ্টেন সিং বললেন। ক্রমাগত ভয় আর আতঙ্কে ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। ওকে আমি আমাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টে রেখে সারিয়ে তুলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হল না। কদিন পরে কোন এক ফাঁকে আমাদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর ওর দোমড়ানো থেঁতলানো দেহটা পাওয়া যায় পাহাড়ী খাদের ভেতর। বোধহয় বিভীষিকায় দিশেহারা হয়ে গিয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন সিং একটু থেমে বললেন, এই আশ্চর্য ঘটনাটাই ড্রাগন পাহাড় ঘিরে দীর্ঘদিনের গুজব সম্পর্কে প্রথম কৌতূহলী করেছিল। পরের ঘটনা সবই তো আগে আপনাদের বলেছি।

মেঘনাদ পকেট থেকে অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট বার করে বলল—সেই আদিবাসী ছেলেটা সত্যিই আচমকা খাদের মধ্যে পড়েই মারা গেছে বলে আপনার বিশ্বাস ক্যাপ্টেন সিং? মানে ব্যাপারটা নিছকই দুর্ঘটনা এবং এর মধ্যে অন্য কোন হাত নেই বলে মনে করেন?

সামনে বিপজ্জনক পাহাড়ী বাঁক। সেটা অতিক্রম করে ক্যাপ্টেন সিং একবার

মাথাটা ফেরালেন তারপর দৃষ্টিটা আবার সামনের পথে রেখে বললেন—সে সময় এর বেশি কিছু ভাবতে পারি নি, তবে প্রকৃত রহস্যের সন্ধান মিললে হয়তো অনেক অজানা তথ্যও জানা যেতে পারে।

মেঘনাদ আর কোন কথা বলল না। ও চুপচাপ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। কিন্তু আসলে কি বলতে চায় মেঘনাদ?

গত বছরে ড্রাগন পাহাড় থেকে পালিয়ে-আসা সেই পাহাড়ী ছেলেটার ওই মৃত্যুকে কি সে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারছে না? কিন্তু কেন? আমি জানি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করলেও মেঘনাদের কাছ থেকে সঠিক জবাব পাওয়ার আশা নেই।

অগত্যা চোখ দুটো রাখলাম জীপের বাইরে পাহাড়ী বন্য সৌন্দর্যের দিকে। কিন্তু মন? সেখানে একসঙ্গে অনেক কথা ভেসে উঠতে লাগল। কোন্ অজানা রহস্যের সন্ধানে চলেছি আমরা! সেখান থেকে কোন দিন ফিরতে পারবো তো?

ছয়

[আদিবাসী ঢাক]

দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল শিনকি উপত্যকার আদিবাসী গ্রাম থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে ক্যাপ্টেন সিং-এর সামরিক ছাউনি।

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যা নাগাদ। অনেকটা পাহাড়ী পথ জীপে আসতে হয়েছে। মাঝে বিশ্রামের কিছু ফুরসত অবশ্য দু'এক জায়গায় মিলেছে কিন্তু তবু শরীর বড় ক্লান্ত।

শিনকি উপত্যকার বনাঞ্চল যেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর এক আদিম স্মৃতি নিয়ে বিরাজ করছে। সভ্য মানুষের পদচিহ্ন এ অঞ্চলে খুব বেশি পড়ে নি। অজানা অদ্ভুত কত রকম গাছ-গাছালি লতাগুল্ম পরস্পর জড়াজড়ি করে যেন রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে কি এক আদিম সংকেত বুকে নিয়ে। পাহাড়ী জলাধারাগুলির স্রোত প্রচণ্ড।

আমরা সামরিক ছাউনিতে পৌঁছবার সময়ই শুনতে পেলাম দূরে একসঙ্গে অনেকগুলি জংলী ঢাকের আওয়াজ।

ক্যাপ্টেন সিং বললেন, জংলী ওঝা 'দৈবীরানী' ড্রাগন দেবতার পুজো করছেন।

সারাটা বৈশাখ মাস নাকি সন্ধ্যে থেকে এরকম পুজো অর্চনা চলে। প্রথামতো এই মাসেরই বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে জীবন্ত ড্রাগন দেবতাকে নিবেদন করা হয় একটি তাজা আদিবাসী তরুণকে।

সেদিন সারাটা রাত ভালভাবে ঘুমোতে পারি নি আমি। যদিও ক্যাপ্টেন সিং সামরিক ছাউনির ভেতর তাঁর তাঁবুর পাশেই আমাদের শোবার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

মেঘনাদ কিন্তু বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। যাকে বলে সশব্দে ঘুম। ওর নাকের ভেতর থেকে নানা ধরনের সংগীত ভেসে আসছিল।

আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। তন্দ্রার ঘোরে বেশ কয়েক বার দুঃস্বপ্ন দেখেছি। একবার দেখলাম—আদিবাসী ওঝা দেবীরানী হাতে একটা ভয়ঙ্কর বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে আমার দিকে। এলোমেলো চুলগুলো তার বাতাসে উড়ছে, চোখ দুটো ঘোলাটে লাল, মুখে বিষাক্ত হাসি। কাছে আসতেই আমি চিৎকার করতে গেলাম, কিন্তু দেখি সেটা আর ওঝা দেবীরানী নয়—একটা হিংস্র ড্রাগন। বুকে হেঁটে সে ক্রমেই এগিয়ে আসছে আমার আরো কাছে.... মুখ দিয়ে তার ঝলকে ঝলকে বেরুচ্ছে আগুন....। ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। তারপর যতবারই ঘুমোবার চেষ্টা করেছি ঘুম আর আসে নি। মনটা কি আমার এত সহজেই দুর্বল হয়ে পড়লো?

তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে আবছা অন্ধকার। শুক্ল-পক্ষের জ্যোৎস্নার হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে দূর পাহাড়ের বনাঞ্চলে। কিন্তু কি শীত রে বাবা। যদিও যথেষ্ট গরম জামাকাপড় পরে রয়েছি তবু ঠাণ্ডা যেন বশ মানছে না।

সেই সঙ্গে দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ—দুম....দুম...দুম...দুম...। সারাটা বৈশাখ মাস ধরে ওই আদিবাসী গোষ্ঠীর উৎসব চলে। এত দূর থেকেও দেখতে পেলাম সে অঞ্চলের আকাশটা লাল হয়ে রয়েছে। হয়তো রাশি রাশি মশাল জ্বলছে সেখানে।

কিছুক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফিরে এলাম তাঁবুর মধ্যে।

মেঘনাদ তখনও ঘুমে অচৈতন্য।

সাত

[আদিবাসী তরুণ পিংলা]

পরদিন সকালেই ক্যাপ্টেন সিং এক জংলী আদিবাসী তরুণকে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

ছেলেটির বছর কুড়ি বয়স। এ অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো হলদেটে গায়ের রঙ, চোখ দুটো ছোট-ছোট, ঠোঁট পাতলা, ছিপছিপে গড়ন। পরনে ভাল্লুকের চামড়ার পোশাক, গলায় হাড়ের মালা, হাতে একটা টাঙ্গি।

ক্যাপ্টেন সিং ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই এলাকায় এ আমার সব থেকে বড় বন্ধু। নাম পিংলা।

ছেলেটি দুপাটি দাঁত বার করে হেসে আমাদের অভিবাদন জানালো।

পিংলা নামটা শুনেই মনে পড়লো—ক্যাপ্টেন সিং যার কথা বলেছিলেন। যে তাঁকে শিনকি গিরি উপত্যকার ওই আশ্চর্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক গোপন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

মেঘনাদ পিংলাকে কয়েকটা উপহার দিল—স্প্রিং দেওয়া ভাল্লুক, মোটর গাড়ি, চামড়ার ডুগডুগি।

পিংলা অবাক হয়ে সেগুলো দেখছিল আর খুশিতে হেসে উঠছিল।

আদিম বন্য এই মানুষগুলো স্বভাবে ভারী সরল আর হাসিখুশি।

ক্যাপ্টেন সিং কাজ চালাবার মতো কিছু কিছু ইংরেজী শব্দও তাকে শিখিয়েছেন। অন্ততঃ ভাব বিনিময়ের অসুবিধে বিশেষ হয় না।

ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পিংলাকে আরো বশ করতে পারলে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারবো। অন্ততঃ দো-ভাষীর কাজটা তো আমরা এখনই অনায়াসে ওকে দিয়ে চালাতে পারি।

মেঘনাদ কোন উত্তর দিল না। পিংলাকে ও ভালভাবে লক্ষ্য করছিল।

আট

[মেঘনাদের মারাত্মক শর্ত]

বিকেলে ক্যাপ্টেন সিং-এর তাঁবুতে চা-চক্র চলছিল। হঠাৎ মেঘনাদ বলল—ক্যাপ্টেন সিং আপনি যদি সত্যিই ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের সমাধান চান তবে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।

—অবশ্যই। কি করতে হবে বলুন? ক্যাপ্টেন সিং উন্মুখ হয়ে বললেন।

—শিনকি উপত্যকার ওই পাহাড়ী উপজাতিদের গ্রামে আমার আর অর্ণবের কয়েকটা রাত থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—তার মানে! কি বলছেন আপনি? ক্যাপ্টেন সিং চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন।

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন সিং। এখানে অনেক কিছুই আমায় জানতে হবে। সবচেয়ে আগে আমার জানা দরকার ওই আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রকৃত জীবনধারা এবং তার মধ্যে রহস্যের সূত্রটা কোথায়। মেঘনাদ বলল।

—সেটা কত বড় অসম্ভব তা আপনি ভেবে দেখেছেন মেঘনাদ ভাইয়া? ক্যাপ্টেন সিং মাথা নাড়লেন।

—এই অসম্ভবকেই তো সম্ভব করতে হবে ক্যাপ্টেন। আমার বিশ্বাস খুব একটা বেগ পেতে হবে না, যদি পিংলা এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

—পিংলা?

—হ্যাঁ পিংলা।

—কিন্তু মেঘনাদ ভাইয়া...।

ক্যাপ্টেন সিং-এর ইতস্তত ভাব দেখে মেঘনাদ বলল—পিংলাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার দায়িত্বটা আমিই নিলাম। আপনি শুধু আমাকে আমার প্রয়োজন মতো সাহায্য করবেন।

ক্যাপ্টেন সিং অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এই দুঃসাহসী যুবকটির দিকে। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর কিন্তু অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী। ক্যাপ্টেন সিং-এর চোখে চোখ রেখে মেঘনাদ বলল—ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের যবনিকাপাত যদি সত্যিই চান, আমার শর্ত আপনাকে মেনে নিতে হবে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন সিং কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপর তাঁর ডান হাতটা মেঘনাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আমি রাজী।

দুটি বলিষ্ঠ হাত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো।

নয়

[অসম্ভবও সম্ভব হ'ল]

সত্যি বাহাদুরী আছে মেঘনাদের। যা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি সেই অসম্ভব ব্যাপারকেও কত সহজে সে সম্ভব করে ফেলতে জানে।

পিংলাকে বশ মানিয়ে ও প্রবেশ করেছিল শিনকি উপত্যকার সেই বিশেষ গ্রামটিতে। গ্রামের আদিবাসীদের সর্দার থিংডনের সঙ্গে দেখাও করেছে। অবশ্য যত সহজে বলা হল কাজটা মোটেই তত সহজে হয় নি। প্রথমটা থিংডন কিছুতেই মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী ছিল না। এজন্যে অনেক কায়দা অনেক ছল চাতুরী করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আবার মেঘনাদ কাজে লাগিয়েছে সর্দার থিংডনের একমাত্র তরুণ ছেলে তাজুকে। তাজু পিংলার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই শেষ পর্যন্ত থিংডনের সঙ্গে মেঘনাদের সাক্ষাৎকারটা ঘটিয়ে দেয়।

বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ চেহারা সর্দার থিংডনের। বয়েস যথেষ্ট হলেও শরীরের একটা পেশীও শিথিল হয়নি। পরনে ভাল্লুকের চামড়ার পোশাক, গলায় হাড়ের অলংকার, হাতে টাঙ্গি।

থিংডনকে শেষ পর্যন্ত বশ মানালো মেঘনাদের আনা ফিলিপস্ কোম্পানির সেই ট্রানজিস্টার রেডিও সেটটা। এমন ভূতুড়ে কলের গান সে তার এতখানি জীবনে কখনও শোনে নি। মেঘনাদ যখন ট্রানজিস্টারের সুইচ অন করল, ওর ভেতর থেকে আওয়াজ শুনে প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল উপজাতীয় সর্দার। তারপর মেঘনাদ যখন ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে দিল, তখন সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রেডিও সেটটার দিকে তারপর সাষ্টাঙ্গে শুয়ে অভিবাদন জানাল ওটাকে। সর্দারের দেখাদেখি সেখানে অন্য যারা ছিল তারাও সেই একই আচরণ করল। এরপর মেঘনাদ যখন থিংডনকে গোটা রেডিওটাই উপহার দিতে চাইল, থিংডন তখন আনন্দে উত্তেজনায় হৈ চৈ শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে ছুটে এল গ্রামের আর সব আদিবাসীরা। সে যেন এক উৎসবের ধূম। থিংডন নিজে রেডিওটা চালিয়ে দেয়-সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ট্রানজিস্টারটার দিকে। তাদের দুচোখে ভয় আর বিস্ময় জড়ানো। কিন্তু থিংডনের ভয় কেটে গেছে। তার দুচোখে আনন্দ, আর সেই সঙ্গে মেঘনাদের প্রতি এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা। এমন জিনিসটি উপজাতীয় দলপতির অহঙ্কার তার প্রজাদের কাছে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কত সরল এদের মানসিক গঠন। আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি।

দেখতে দেখতে মেঘনাদের সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেল সর্দার থিংডনের।

কিন্তু এত করেও গ্রামের ভেতরে থাকার অনুমতি মিললো না।

ওদের ওঝা দেবীরানীর অনুমতি ভিন্ন এ সুযোগ কিছুতেই তারা তাকে দিতে পারে না।

তাহলে নাকি ড্রাগন দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে তাদের ওপর।

কিন্তু মেঘনাদের অভিধানে আজ পর্যন্ত অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। অবশেষে নানা কায়দায় সর্দারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুযোগ যেটুকু পাওয়া গেল তা অবশ্য মন্দের ভাল।

আদিবাসী গ্রাম এলাকার বাইরেটায় আমরা থাকতে পারি আর প্রয়োজনে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তবেই ঢুকতে পারি গ্রামের ভেতর।

আপাততঃ এ সুযোগটাই বা কম কি?

শিনকি গিরি উপত্যকায় গ্রাম এলাকাটির বাইরে আমাদের তাঁবু খাটানো হল। তাঁবুর বাসিন্দা আমরা দুজন, আমি আর মেঘনাদ। ক্যাপ্টেন সিং থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেঘনাদ রাজী হয় নি, বলেছে কটা দিন আমাব ওপর বিশ্বাস রাখুন। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। যখন যেখানে দরকার আপনার সাহায্য ঠিকই নেব।

অগত্যা ঠিক হয়েছে তিনি মাঝে মাঝে এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যাবেন, আর আমাদের খাওয়া থাকার তদারক করবে আদিবাসী তরুণ পিংলা।

দশ

গভীর রাতে ভয়ঙ্কর গর্জন]

একটা রাত কেটে গেল ছোট্ট তাঁবুটায়। সারা রাত দুচোখে ঘুম নামে নি। জেগে থেকে শুনেছি জংলী ঢাকের আওয়াজ সেই সঙ্গে আদিবাসীদের সমবেত নৃত্য গীতের শব্দ। আকাশে জ্বলেছে দাউ দাউ মশালের আগুন। এইভাবেই কেটে গেছে রাতটা। ভোরের দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে মাত্র দুচোখের পাতা বুজোতে পেরেছিলাম।

পরের সারাটা দিন কেটে গেল শিনকি উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়ে।

পরনে ছিল ভারী গরম পোশাক, মাথায় শীতের টুপী, কাঁধে ঝোলানো ফ্লাস্ক আর কোমরে গুলিভরা রিভলবার। পিংলা খাবারের ব্যাগ হাতে সর্বক্ষণই আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে। গত কয়েকদিনের মধ্যেই মেঘনাদের ভারী ভক্ত হয়ে পড়েছে ও। কি করে মেঘনাদকে আরও খুশি করা যাবে কিছুতেই যেন ভেবে পাচ্ছে না। শিনকি

উপত্যকার প্রতিটি গাছ, পাথর আর লতাগুল্ম চিনিয়েও যেন ওর শান্তি নেই। ওর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আমরা ওদের গোষ্ঠীর আরও কিছু রহস্য জানতে পেরেছি। বিশেষতঃ ওদের ওঝা দেবীরানী সম্পর্কে। ওদের কাছে তিনি নাকি সত্যিই দেবী-তুল্যা। বাস করেন ওদের গ্রামের উত্তর প্রান্তে ড্রাগন দেবতার বেদীর কাছে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে। তাঁর ব্যক্তিগত চালচলনের খবর কেউ রাখে না। তবে মাঝে মাঝে বেশ কয়েকদিনের জন্য তিনি গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যান। তখন কোথায় যান কেউ তা বলতে পারে না। অনেকের ধারণা উনি নাকি গভীর রাত্রে ড্রাগন পাহাড়ে ড্রাগন দেবতার সঙ্গে কথা বলতে যান। তারপর যখন ফিরে আসেন আশ্চর্য সব জাদুর গুণ নিয়ে। কারুর অসুখ-বিসুখ কিংবা জটিল ব্যাধি তখন তিনি খুবই সহজে ভাল করে দেন।

পিংলার কাছে আমরা অবাক হয়ে শুনেছি ওদের দেবীরানীর কথা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের ড্রাগন দেবতার বেদীটা কি?

পিংলা বলেছে, গ্রামের উত্তর প্রান্তে খানিকটা খোলা জায়গায় একটা বড় বেদী আছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যেবেলা সেখানে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য ইত্যাদি রেখে আসি, রাত্রে আমরা কেউ সেদিকে যাই না কিন্তু পর দিন সকালে গিয়ে সেগুলো আর দেখতে পাই না।

ঐ বেদীতেই বোধহয় তোমরা ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে একজন করে তরুণকে নিবেদন করো?

পিংলা ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলেছে—হ্যাঁ।

—কতদিন যাবৎ চলছে এই প্রথা?

পিংলা মেঘনাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না। তার জানা নেই। ও শুধু এইটুকু জানে ড্রাগন দেবতা দেবীরানীকে পাঠিয়েছে তাদের ওঝা করে। আর দেবীরানী আসার পর থেকেই এই পাহাড়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের যা কিছু বাড়বাড়ন্ত। পিংলার ভাষায় সবই দেবীরানীর পয়মন্তরে।

শিনকি উপত্যকা থেকে কিছুটা পথ আরও উত্তরে শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়ে যাবার পথ। পথ ওই নামেই। প্রচণ্ড দুর্গম পাহাড়ী চড়াই উৎরাই।

মেঘনাদের ইচ্ছে ছিল দিনের বেলাতেই ড্রাগন পাহাড়ের কিছুটা ভেতর থেকে ঘুরে আসবে। কিন্তু পিংলা কিছুতেই যেতে দিল না। নিজেদের বিশ্বাস যাই হোক, হিতৈষী ওই আদিবাসী তরুণটির ভালবাসা আর আশঙ্কার বাঁধন ছিঁড়ে সেই মুহূর্তে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না।

সেই রাত্রেই শুনলাম সেই ভয়ঙ্কর গর্জন। ক্যাপ্টেন সিং যে গর্জনকে বজ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গর্জনটা ভেসে আসছে অনেকটা দূর থেকে। তবু মনে হল আমাদের তাঁবুটাও কেঁপে উঠছে সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে।

মেঘনাদের আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। গর্জনের শব্দে সে খাটিয়ার ওপর

উঠে বসেছে।

গর্জনটা বেশ কয়েকবার শোনা গেল। পরের পর।

—শিনকি উপত্যকার ড্রাগন দেবতার বাহন! মেঘনাদ ফিস ফিস করে বলল।

আমি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কোন জানোয়ারের গলায় এমন ডাক আমি জীবনে শুনি নি।

আদিবাসীদের নাচ, গান, ঢাকের শব্দও হঠাৎ কেমন থমকে গেছে। একটু বাদে গর্জনও থেমে গেল। শিনকি উপত্যকায় নেমে এল অশুভ নিঃশব্দতার এক কালো ছায়া।

সারাটা রাত কেটে গেল এই ভাবে। রাতের স্তব্ধতা ভেঙে একটা বুনো জন্তুর ডাকও আর শোনা গেল না।

এক সময় ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল শিনকি উপত্যকায়। ড্রাগন পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠল, যেন ড্রাগন দেবতার মুখের গনগনে আগুন ছড়িয়ে।

এগারো

[পিংলা খুন]

একটু বেলায় দৌড়ে তাঁবুতে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন সিং। ঘরে ঢুকেই যে সংবাদটা দিলেন সেটা বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল আমাদের কানে।

—মেঘনাদ ভাইয়া, পিংলা খুন হয়েছে।

মেঘনাদ ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সিং-এর অভাবিত সংবাদের ধাক্কায় মেঘনাদের হাতের কাপ হাত থেকে সশব্দে পড়ে গেল।

—কি বলছেন আপনি ক্যাপ্টেন? আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

—হ্যাঁ, অর্ণববাবু। আজই ভোরের দিকে একজন টহলদার জওয়ান এখান থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে খাদের মধ্যে ওর দেহটা খুঁজে পেয়েছে। ক্যাপ্টেন সিং উত্তেজিত ভাবে বললেন।

—কিন্তু এটাকে দুর্ঘটনা না বলে আপনি খুন বলছেন কেন ক্যাপ্টেন? মেঘনাদের প্রশ্ন।

—তার কারণ নিছক খাদের মধ্যে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে শুধুমাত্র তার মাথাটা গুঁড়িয়ে যেত না মেঘনাদ ভাইয়া।

—মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, তাকে সনাক্ত করতে পেরেছি একমাত্র তার গলার সোনালী রঙের

চেনটার সাহায্যে। কদিন আগে যা আপনি ওকে উপহার দিয়েছিলেন।

—আমি এক্ষুনি একবার মৃতদেহটা দেখতে চাই—মেঘনাদ উঠে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ, চলুন। লাশটা সেখানেই এখনও পড়ে আছে, আমি গিয়ে না পৌঁছলে কেউ তাতে হাত দেবে না।

আমরা তিনজন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

পিংলার মৃতদেহটা পড়ে আছে ড্রাগন পাহাড়ে যাবার পথের পাশে এক পাহাড়ী খাদের মধ্যে।

মৃতদেহের শরীরটা মোটামুটি অক্ষত থাকলেও মাথাটা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মনে হয় কে যেন গোটা মাথাটাই চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে। বীভৎস দৃশ্য।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ ধরে দেহটা পরীক্ষা করে বলল—ক্যাপ্টেন সিং, আপনি ঠিকই বলেছেন, পিংলাকে হত্যাই করা হয়েছে এবং তা অন্য কোন জায়গায়। এখানে শুধু মৃতদেহটা এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—আপনার এ ধারণার কারণ?

—আপনি নিজেই দেখুন এভাবে একটা মাথা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিতে হলে সেখানে কতটা রক্তপাত হওয়া উচিত। এখানে কিন্তু রক্ত খুব বেশি পড়ে নেই।

সত্যিই তাই। পিংলার দেহের আশেপাশে রক্তের ছাপ খুব বেশি নেই।

—কিন্তু পিংলাকে এভাবে কে হত্যা করতে পারে বলে আপনার ধারণা মেঘনাদ ভাইয়া? পিংলার মৃত্যুতে ক্যাপ্টেন সিং খুবই বিচলিত।

—হয়তো ওর কাজকর্ম যার বা যাদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করছিল। মেঘনাদের কথায় ওর দিকে তাকাই।

—আদিবাসীরা বলবে এটা ড্রাগন দেবতার অভিশাপ।

—জানি। সে অভিশাপের কবলে আমরাও পড়তে পারি, যদি এখন থেকে আমরা আরও সাবধান না হই।

পিংলার মৃতদেহটা পেছনে রেখে মেঘনাদ ফিরে চলল। সঙ্গে আমরাও।

বারো

[অনুসরণ]

গত কয়েকটা রাত নিদ্রাহীন কাটার পর সে রাতে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমটা ভেঙে গেল মেঘনাদের হাতের ঝাঁকুনীতে। মেঘনাদ ডাকছে—অর্ণব ওঠ। উঠে পড়। শুনতে পাচ্ছিস?

ঝাঁ ঝাঁ রাত্রির এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। পাহাড়ীদের উৎসবের বাজনাও থেমে গেছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই পরিচিত প্রচণ্ড গর্জন। যেন কোন পাহাড়ী ধ্বস নামার শব্দ। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর শব্দের সঙ্গে তারও কিছু পার্থক্য আছে। ধ্বস অমন থেমে থেমে নামে না।

রাত ক'টা এখন কে জানে। মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর পরনে গরমের ভারী কোট প্যান্ট, মাথায় টুপী, পায়ে বুট, তাঁবুর বাইরে বেরুবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত।

আমি উঠে বসতেই মেঘনাদ বলল, চটপট তৈরি হয়ে নে। বেরুতে হবে।

–এখন! এত রাতে? আমি ঘুম চোখে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই।

—হ্যাঁ। এই সময়টাই আমায় বেছে নিতে হয়েছে। একটা রহস্যের মীমাংসা চাই আমি।

কি বলতে চাইছে মেঘনাদ? কিন্তু আমি জানি এসব কথা এখন ওকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

অগত্যা সেই নিস্তব্ধ শীতল রাতে আমাকে মনের সব প্রশ্ন চেপে বেরুতে হল মেঘনাদের সঙ্গে।

মেঘনাদ এগিয়ে চলেছে আদিবাসী গ্রামের দিকে।

সমস্ত গ্রামটা কাঠের খুঁটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গ্রামে প্রবেশের মাত্র দুটি পথ। একটি শিনকি উপত্যকার দক্ষিণ দিকে, অপরটি উত্তরে। মেঘনাদের গন্তব্য উত্তর প্রবেশ পথের দিকে, যার কিছুটা দূর থেকেই শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়ের পথ।

ভয়ঙ্কর গর্জনটা এখনও মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে ড্রাগন পাহাড়ের দিক থেকে।

কিন্তু কোথায় চলেছে মেঘনাদ? কি উদ্দেশ্য ওর?

মেঘনাদকে প্রশ্ন করতে উদ্যত হতেই মেঘনাদ হঠাৎ আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে পাশের বড় পাথরটার আড়ালে ছিটকে টেনে নিয়ে গেল।

আমি মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে নীরবে আমায় দেখিয়ে দিল একটু দূরের পথটা।

একটা পায়ে চলা পথ বেরিয়ে এসেছে আদিবাসী গ্রামের উত্তর প্রবেশ দ্বার থেকে।

একটা ছায়ামূর্তি গ্রামটা থেকে বেরিয়ে এসে হেঁটে চলেছে ড্রাগন পাহাড়ের দিকে।

এই গভীর রাতে ওই নিষিদ্ধ পথে কে ও যাত্রী?

মেঘনাদ একটু দূর থেকে সেই মূর্তিকে অনুসরণ করতে শুরু করল। সঙ্গে আমি।

কিছুটা পথ পিছু নিয়েই বুঝতে পারলাম—সামনের ছায়ামূর্তি পুরুষ নয়—নারী।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা সম্ভাবনা মাথায় এল। কথাটা চুপি চুপি মেঘনাদের কানে কানে বললাম। মেঘনাদ মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আমার আগেই ও অনুমান করেছে। নারীমূর্তি পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের ওঝা 'দেবীরানী'।

নারীমূর্তিকে অনুসরণ করে ইতিমধ্যে ড্রাগন পাহাড়ের দিকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে গিয়েছি আমরা। দুর্গম চড়াই উৎরাই প্রতি পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করছে। হাতের টর্চ পর্যন্ত জ্বালাতে পারছি না, তাতে সামনের নারীর কাছে আমাদের উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অন্ধকারটা এতক্ষণে চোখে কিছুটা সয়ে এসেছে। নারীমূর্তির পরনে মনে হল ভল্লুকের চামড়ার ভারী পোশাক। মাথায় লোমের টুপী, হাতে গলায় পুঁতির এবং হাড়ের অলঙ্কার, হাতে টাঙ্গি জাতীয় অস্ত্র, আরও কি আছে দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

ড্রাগন পাহাড়ের ক্রমশঃ ভেতর দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা।

ভয়ঙ্কর গর্জনটা অবার শোনা গেল। এবার অনেক কাছ থেকে।

দেবীরানীর সঙ্গে দূরত্ব আমাদের ক্রমেই কমে আসছে।

হঠাৎ আমি আর মেঘনাদ একসঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেবীরানী তার আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে এক তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ।

ও কি কাউকে সংকেত পাঠালো?

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল সামনে একটা বিরাট পাহাড় নড়ে উঠল। তারপর দুলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগলো সামনের দিকে।

ওটা পাহাড় নয়—একটা বিরাট জানোয়ার।

অন্ততঃ চল্লিশ ফুট লম্বা, ঘাড় আর ল্যাজের অংশটা বিরাট, সামনের পা দুটো দেহের অনুপাতে ছোট। পেছনের পা দুটো আর ল্যাজে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে সরীসৃপ জাতীয় ভয়ঙ্কর জীবটা। মুখটা তার লম্বাটে বীভৎস। গলা থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছে বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড গর্জন।

এর কথাই সেদিন বলেছিলেন ক্যাপ্টেন সিং।

আদিবাসীদের ড্রাগন পাহাড়ের ড্রাগন দেবতার বাহন।

জীবটার আরও কাছে এগিয়ে যাচ্ছে 'দেবীরানী'। বিশাল জীবটার পাশে তাকে আকারে একটা ছোট পুতুলের মতো মনে হচ্ছে।

আমরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। রাতের গভীরে শিনকি উপত্যকায় এ কি রহস্যময় নাটক অভিনীত হচ্ছে!

ভয়ঙ্কর জীবটা আর একবার গর্জন করে উঠলো, তারপর এগিয়ে এল দেবীরানীর আরও কাছাকাছি।

দেবীরানী হাত তুলল। বলল--বোস ডায়না। আশ্চর্য! দেবীরানীর কণ্ঠে নির্ভুল বাংলা উচ্চারণ। আর সে আহ্বানে বিশাল জীবটা অত্যন্ত বাধ্য ভঙ্গিতে সামনের পা দুটো নামিয়ে হুড়মুড় করে বসে পড়ল। নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না--ড্রাগন পাহাড়ের ভয়ঙ্কর দানবটিকে আদর করছে দেবীরানী। গৃহপালিত জীবের মতো ওর মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ার একান্ত অনুগতের মতো পরম তৃপ্তিতে সেই আদরটুকু অনুভব করছে আর মাঝে মাঝে ওর গলা থেকে যে বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে আসছে তা আদর আর তৃপ্তির এক মিশ্র আবেশ।

এইভাবে কতক্ষণ সময় কাটলো মনে নেই। আমরা সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একটু বাদে দেবীরানী হঠাৎ জীবটার পিঠের ওপর উঠে বসলো তারপর ওর পিঠে একটা ছোট চাপড় মেরে বলল--চল রে ডায়না। ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা।

আমাদের চোখের সামনে পাহাড়ী আদিবাসী ওঝা দেবীরানী শিনকি উপত্যকার ড্রাগন দেবতার বাহনের পিঠে চড়ে ড্রাগন পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল গত কয়েকদিন আগে পিংলার সেই কথাগুলো- ওদের কারুর কারুর ধারণা দেবীরানী নাকি মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য রাতের গভীরে ড্রাগন পাহাড়ে যায় ড্রাগন দেবতার সঙ্গে দেখা করতে। কে জানে হয়তো এসব তথ্য জানানোর জন্যেই পিংলাকে প্রাণ দিতে হল। ওরা হয়তো বলবে ড্রাগন দেবতার অভিশাপ।

মেঘনাদ আরও এগুতে চেয়েছিল কিন্তু আমি বাধা দিয়েছি। এই অবস্থায় আর এগুনো মানেই মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় ডেকে আনা।

তবে সে রাতে আর একটা রহস্যের মুখোমুখি আমরা হলাম--তা হল এই পাহাড়ী উপজাতি গোষ্ঠীর ওঝা 'দেবীরানী' ওদের সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ নয়। সে এক বাঙালী নারী। তার গলার স্বর শুনে এটুকু বুঝতে আমাদের ভুল হতে পারে না।

চির রহস্যাবৃত হিমালয়ের দূর গহন উপত্যকায় পাহাড়ী আদিবাসীদের এলাকায় আরও কত কি বিস্ময় লুকিয়ে আছে কে জানে?

সে রাতের মতো আমরা আবার ফিরে চললাম নিজেদের তাঁবুর দিকে।

মেঘনাদের মুখে একটাও কথা নেই।

তেরো

[মারাত্মক পরিকল্পনা]

আরও দুটো দিন কেটে গেছে।

মেঘনাদ আজ সকালে কিছু না জানিয়ে কোথায় যে বেরিয়েছে এখনও তাঁবুতে ফেরে নি। অথচ দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। পেটে আমার ছুঁচোয় ডন বৈঠক দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঘনাদটার মাথায় কি যে ভূত চাপে!

আচ্ছা, এখন আমি কি করি! এমন জায়গায় একা বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ যদি ও বিপদে পড়ে খবর পাবার পর্যন্ত কোন উপায় নেই। ভাবতে ভাবতে ভেতরটা আমার ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। বিশেষতঃ দেবীরানীকে সে রাত্রে এমন অদ্ভুত পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে দেখার পর থেকে আমার মনের অস্থিরতা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে একটা গভীর চক্রান্ত আছে। প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগন, পাহাড়ীদের ওঝা বাঙালী নারী— কোনটাই স্বাভাবিক বা নেহাত জংলী ঘটনা বলে আর মানতে পারছি না। অথচ এসবের মূল সূত্রটা কোথায় তাও বোঝবার উপায় নেই।

মেঘনাদ গতকাল সেই কথাই বলছিল—বুঝলি অর্ণব, আমি স্থির নিশ্চিত ঐসব কিছুর পেছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। তবে যেটাকে ড্রাগন বলে ভাবা হচ্ছে আমি আজ নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সেটা আসলে এক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

বলতে বলতে মেঘনাদ তার ফিজিক্যাল ফিজিওলজি বই-এর একটি পৃষ্ঠা আমার সামনে মেলে একটা বিশেষ ছবির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, — দেখতো এই ছবিটা। এমন জীব ইতিমধ্যে তোর চোখে পড়েছে কিনা!

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। বীভৎস চেহারার এক সরীসৃপ, সামনের পা দুটো পেছনের পায়ের তুলনায় ছোট। পেছনের দুটি পা আর মোটা ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। মুখটা লম্বাটে, কুৎসিৎ। কিন্তু হ্যাঁ, এমন একটি জীবকেই তো দেখেছি দিন দুই আগে রাতের বেলা....

আমার ভাবনা শেষ হবার আগেই মেঘনাদ বললো, —এই ডাইনোসর প্রজাতিটির নাম ইগুয়ানোডন। প্রাগৈতিহাসিক মেসোজায়িক যুগের শেষ পর্ব ক্রেটেসিয়াস যুগে এরা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। এরা উচ্চতায় ছিল প্রায় ৪০ ফুট।

আমি বললাম, — তাহলে কি...?

—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হচ্ছে। ড্রাগন পাহাড়ের ড্রাগন দেবতার বাহনটি আসলে....

—কিন্তু একি করে সম্ভব! আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, — যে ডাইনোসর কুল পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় ছ' কোটি বছর আগে, সেই আদিম পৃথিবীর লুপ্ত প্রাণী কি করে আবির্ভূত হতে পারে এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে?

—সে রহস্য আমি এখনও ভেদ করতে পারি নি অর্ণব, তবে আমার ভাবনাটা বোধহয় মিথ্যে নয়।

—কিন্তু চিনতে তোর ভুলও হতে পারে।

—না। মেঘনাদ দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করল, ভুল আমি করিনি। গত কয়েক দিন যাবৎ ফিজিক্যাল ফিজিওলজির বইটা আমি তন্ন তন্ন করে পড়েছি। তারপর সে রাত্রে আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি জানোয়ারটাকে। ড্রাগন নামে পাহাড়ীরা যাকে পুজো করে সেটা একটা ডাইনোসর ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। একটি আদিম প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের জীবাশ্ম কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী উপত্যকা অঞ্চলে। কলকাতায় গেলে দেখতে পাবি সেই অতিকায় কঙ্কালটি আজও সাজান রয়েছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে।

আমি আশ্চর্য হয়ে শুনছিলাম মেঘনাদের অদ্ভুত কথাগুলো। যা কিছু এখানে ঘটছে তা প্রথম থেকেই আমার কাছে অবিশ্বাস্য। অথচ কোনটাই শেষ পর্যন্ত অস্বীকার কবতে পারছি না। তাহলে কি এটাও আমায় স্বীকার করে নিতে হবে যে আজ থেকে ছ' কোটি বছর অতীতের এক লুপ্ত প্রাণী আজও চরে বেড়াচ্ছে আজকের পৃথিবীতে, হিমালয়ের পাদদেশে শিনকি উপত্যকায়?

শুধু তাই নয়, দেবীরানী, যে পাহাড়ী আদিবাসীদের এক রহস্যময়ী নারী ওঝা, যে নাকি আবার বাঙ্গালী, রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর ডাইনোসরের পিঠে চড়ে?

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি!

এসব কথা মেঘনাদের সঙ্গে হয়েছিল গতকাল রাত্রে। তারপর সকালে উঠে সেই যে ও কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি।

অবশেষে আর থাকতে পারলাম না। বাইরে বেরুবার পোশাকটা পরে বন্দুকটা হাতে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করছি হঠাৎ তাঁবুর দরজাটা নড়ে উঠল।

ভেতরে প্রবেশ করল মেঘনাদ।

আমি বিরক্তি প্রকাশ করে একটা কিছু বলতে যাচ্ছি, তার আগেই মেঘনাদ বলল- আপাতত কদিন আমার বিচ্ছেদের জন্য তৈরি হও বন্ধু।

—তার মানে?

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ দুটো হাসছে। আম'ঃ আর একটু

কাছে এগিয়ে এসে বলল—অবশ্য এ তাঁবুটা তুলে ফেলতে হবে, আর তোকেও দিন কয়েকের জন্যে গিয়ে থাকতে হবে ক্যাপ্টেন সিং-এর সামরিক ছাউনীতে।

--আর তুই?

--আমি এখানেই থাকবো।

—এখানে মানে? জমাট শীতের রাতে পাহাড়ী উপত্যকার খোলা চত্বরে? মেঘনাদের কথাগুলো হেঁয়ালী মনে হচ্ছে আমার কাছে।

--ঠিক তার উল্টো। আদিবাসী সর্দারের ভাল্লুকের চামড়ার নরম বিছানায়। হাতের বন্দুকটা তাঁবুর একদিকে ঝুলিয়ে রেখে বেশ নির্বিকার ভাবেই মেঘনাদ বলল।

--দোহাই মেঘনাদ, ব্যাপারটা একটু খুলে বল। এভাবে ক্রমাগত কৌতূহল দমন করে রাখলে আমার ব্রেন-ক্যানসার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে বলে রাখছি। আমি একথা না বলে পারি না।

আমার কথায় খুব জোরে একচোট হেসে নিল মেঘনাদ। তারপর একটু গম্ভীরভাবে বলল, আসলে কি জানিস, প্রকৃত অভিযান আমাদের এই বারই শুরু হবে। মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোল।

--কি করতে চাস?

--অভিযানের একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।

—পথ?

--হ্যাঁ। আজ সকালে পাহাড়ী গ্রামে গিয়েছিলাম আদিবাসীদের সর্দার থিংডনের সঙ্গে দেখা করতে। আগামী পরশু বৈশাখী পুর্ণিমা। ড্রাগন দেবতার কাছে সে রাতের নিবেদন সর্দার থিংডনের এক মাত্র তরুণ ছেলে তাজু।

--কিন্তু তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক? মেঘনাদ কি বলতে চাইছে আমি বুঝতে পারছিলাম না।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ সকৌতুকে আমার রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলটি উপভোগ করে ধীরে ধীরে বলল, সর্দার থিংডনকে আমি রাজী করিয়েছি আগামী পূর্ণিমার রাতে ড্রাগন দেবতার বেদীতে শোয়ানো হবে খুব গোপনে থিংডনের ছেলের ছদ্মবেশে আমায়।

--না। আমি চিৎকার করে উঠি। এ কি বলছে মেঘনাদ।

—এ সংকল্প থেকে কেউই আমায় টলাতে পারবে না অর্ণব। এইভাবেই আমি রহস্যের আরও গভীরে পৌঁছতে চাই। সর্দার থিংডনকে আমি বলে দিয়েছি এ পরিকল্পনা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়। এমন কি ওঝা দেবীরানীও নয়। মেঘনাদের কণ্ঠে অটল দৃঢ়তা।

--কিন্তু সর্দার রাজী হয়েছে?

--প্রথমে রাজী হতে চায় নি। কিন্তু ধর্ম আর সংস্কার হার মেনেছে একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহের কাছে।

কিন্তু মেঘনাদ, এ তো তোর আত্মহত্যার পথে এগিয়ে যাওয়া। অশ্রুতে আমার গলা প্রায় ধরে এল।

মেঘনাদ আমার পিঠে হাত রাখলো। তারপব ধীরে ধীরে বলল--জীবনটাকে বাজি রেখেই এ পথে নেমেছি অর্ণব। এ ছাড়া ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য উদ্ধারের আর কোন উপায়ই যে আমি খুঁজে পাচ্ছি না বন্ধু। তবে তুই দেখিস এ মরণ খেলায় আমার জয় হবেই। তবে এ ব্যাপারে তোর আব ক্যাপ্টেন সিং এব ভূমিকাও কিন্তু কম থাকবে না।

কিছুক্ষণ সময় চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর একসময় নিজেকে শক্ত কবে নিয়ে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললাম--আমায় কি করতে হবে বল।

মেঘনাদের চোখ দুটো এবার উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপব চেয়ারটা আমার আরো কাছে সরিয়ে এনে বলল--যা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনে বুঝে নে।

চোদ্দ

[বৈশাখী পূর্ণিমার রাত]

দ্রিম....দ্রিম.....দ্রিম.....!!

পাহাড়ী আদিবাসীদের জয়ঢাকের শব্দ এত দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি। ওদিকের আকাশটা লালে লাল হয়ে গেছে—বোধহয় একসঙ্গে অনেক মশালের আগুনে। আজ বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। ড্রাগন দেবতার কাছে আজ ওদের জীবন্ত প্রাণ নিবেদন করার দিন।

কিন্তু আজকের এ অনুষ্ঠানটি এক হিসেবে আরও অনেক রোমাঞ্চকর। আজ প্রাণ উৎসর্গের পালা পড়েছিল সর্দার থিংডনের একমাত্র তাজা তরুণ পুত্র তাজুর। দেবীরানীই প্রতি বছর এই 'পালার' ব্যাপারটা স্থির করে দেয়। এবার নাকি ড্রাগন দেবতার মন্ত্রপাঠে তাজুর নাম উঠেছে।

মেঘনাদ অবশ্য অন্য কথা বলে। ওর মতে সর্দার থিংডনের ছেলে তাজু ইদানীং আমাদের সম্পর্কে বেশ কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাই পিংলার মতোই এবার কৌশলে ওকেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু বেছে বেছে তরুণ যুবকদেরই বা শুধু ড্রাগন দেবতার বেদীতে উৎসর্গ করা হয় কেন?

সব প্রশ্নের উত্তর খুব শিগগিরিই পাওয়া যাবে, কারণ সর্দার থিংডনের ছেলে তাজুর ছদ্মবেশে এবার ড্রাগন দেবতার বেদীতে যে নিবেদিত হবে, সে মেঘনাদ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে সত্যিই সে ফিরতে পারবে তো?

আপাততঃ আমি আর ক্যাপ্টেন সিং এই গভীর রাতে ড্রাগন পাহাড়ে প্রবেশ পথের ধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের ভারী গরম পোশাকে ঢাকা তবু মনে হচ্ছে কুচি কুচি ঠাণ্ডা ঢুকে আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। যদিও সময়টা বৈশাখ মাস এবং হিমালয়ের পাদদেশে শিনকি উপত্যকায় এখন গ্রীষ্মকাল।

মেঘনাদের জীবন এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে। ক্যাপ্টেন সিং আর আমার দুজনের পিঠে ঝুলছে রাইফেল, এ ছাড়া কোমরে একটা করে তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরিও আছে আমাদের, আর আছে পাঁচ ব্যাটারীর বড় দুটি টর্চ।

রাত বারটা বাজতেই কথামত আমরা এখানে এসে বসেছি। এখন শুধু প্রতীক্ষার পালা।

ভয়ঙ্কর প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটা কিছুক্ষণ আগেই এই পথ ধরে হেঁটে গেছে পাহাড়ী গ্রামের দিকে।

আমি যেন এখান থেকেই মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি আদিবাসী গ্রামে ড্রাগন দেবতার পূজা অনুষ্ঠান।

দাউ দাউ করে হাজার মশাল জ্বলছে গ্রামেব উত্তর প্রান্তে বিরাট পূজা প্রাঙ্গণে। বেদীর আশপাশ ঘিরে শয়ে শয়ে আদিবাসী উদ্দামভাবে নেচে চলেছে জংলী ঢাকের তালে তালে। সামনের বেদীর ওপর হাত পা বাঁধা অবস্থায় শোযান রয়েছে সর্দার থিংডনের ছেলের ছদ্মবেশে মেঘনাদকে। সর্দার থিংডন নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠছে নিজেরই অপরাধ বোধ থেকে, সেই সঙ্গে অন্য কোন পাপের আশঙ্কায়। তবু মেঘনাদের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে পারে নি বুড়ো সর্দার। তাজু যে তার একমাত্র ছেলে।

বেদীর সামনে দুর্বোধ্য ভাষায় একমনে মন্ত্রোচ্চাবণ কবে চলেছে ওঝা দেবীরানী।

হঠাৎ উত্তরের বন্ধ দরজার বাইরে থেকে এক প্রচণ্ড গর্জন ভেসে এল। শত শত জয়ঢাকের আওয়াজও সে গর্জনের কাছে তুচ্ছ।

মুহূর্তে সমস্ত ঢাকগুলো একসঙ্গে থেমে গেল। ড্রাগন দেবতার বাহন এসেছেন।

দেবীরানী চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন।

উত্তর দিকের বিবাট কাঠের দবজাটা খুলে দেওয়া হল।

আবার সেই গর্জন।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বিরাট আকৃতির সেই জন্তুটা। উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট। মেঘনাদেব মতে ছ'কোটি বছর পূর্বে লুপ্ত ডাইনোসরের প্রজাতি ইগুয়ানোডন নামধারী প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার।

খোলা দরজা পথে থপ্ থপ করতে করতে প্রবেশ করল জানোয়ারটা।

ততক্ষণে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে ড্রাগন দেবতার বাহনকে প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে।

সে আর একবার গর্জন করে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল আশপাশের কুঁড়ে ঘরগুলো। আর মেঘনাদ? তার ভেতরটাও কি এতক্ষণে আতঙ্কে শুকিয়ে যায় নি?

দেবীরানী হাত তুললো। ইঙ্গিত করল পোষা জানোয়ারটাকে।

পাহাড়ীদের ড্রাগন দেবতার বাহন এগিয়ে এল ড্রাগন বেদীটার কাছে। আর একবার গর্জন, তারপর মেঘনাদকে তুলে নিল মুখে করে, ঠিক যেন একটা বেড়াল ছানার মতো।

বিরাট ডাইনোসরের মুখে মেঘনাদকে নিশ্চয়ই একটা ছোট পুতুলের মতো মনে হবে।

দেবীরানী আবার হাত তুলে ইঙ্গিত করলো। ড্রাগন দেবতার বাহন পিছু ফিরে আবার ফিরে চললো খোলা দরজা পথে পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের বাইরে।

ততক্ষণে আবার শুরু হয়ে গেছে ঢাকগুলোর প্রচণ্ড আওয়াজ আর সেই সঙ্গে নাচ। এবার তা যেন আরও উদ্দাম।

কল্পনায় ছবি দেখতে দেখতে সময় কাটছিল, হঠাৎ ক্যাপ্টেন সিং আমায় একটা খোঁচা দিলেন--অর্ণববাবু, ওই দেখুন।

পনেরো

। ড্রাগন পাহাড়ের গুহায় ।

ক্যাপ্টেন সিং-এর কথায় চমকে তাকালাম। পাহাড়ী গ্রামটার কাছ থেকে এগিয়ে আসছে যেন এক চলমান পাহাড়। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম চারটে বেজে গেছে। তার মানে রাত শেষ হতে আর খুব বেশি দেরী নেই। পূর্ণিমা রাত। তবু জ্যোৎস্নার রঙ যেন বড় মলিন।

দূর থেকে যেটা এগিয়ে আসছে সেটা পাহাড় নয়--সেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারটা। এক পা এক পা করে এগুচ্ছে আর ভয়ঙ্কর ভাবে লেজ আছড়ে চলেছে।

হালকা আলোর ছটায় জানোয়ারটাকে আর একটু কাছাকাছি থেকে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম--মুখে করে কি একটা বয়ে নিয়ে চলেছে ও। নিশ্চয়ই মেঘনাদ!

কিন্তু ওই অবস্থায় মেঘনাদ বেঁচে আছে তো! যদিও চামড়ার পোশাকের ভেতর আত্মরক্ষার উপযুক্ত বিশেষ ধরনের প্যাড আছে ওর --কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে তা পারবে তো ডাইনোসরের কামড় থেকে মেঘনাদকে রক্ষা করতে?

--অর্ণববাবু, ক্যাপ্টেন সিং উত্তেজিত ভাবে ফিস ফিস করে বললেন, ইচ্ছে করছে এক্ষুণি ওটাকে পেছন থেকে অ্যাটাক করি।

--পাগল হয়েছেন। আমি বললাম--তাহলে আমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। আমরা কেউই বাঁচবো না। আপাততঃ আমাদের যা করণীয় তা হল পেছন থেকে ওকে সন্তর্পণে অনুসরণ করা। এই ভাবে আমাদের ড্রাগন পাহাড়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনার লোকজন সব তৈরি আছে তো?

--হ্যাঁ, তারা আশপাশে লুকিয়ে আছে, সংকেত দিলেই আক্রমণ করবে।

--ঠিক আছে, ওরা এখানেই থাক। চলুন, আমরা দুজনে ওর পিছু পিছু এগিয়ে যাই।

ডাইনোসরটা ততক্ষণে ড্রাগন পাহাড়ের ভেতর দিকে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেছে। আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে পূর্ব আকাশে পাইন বনের মাথায় সূর্য উঠেছে। রাঙা আলো ছড়িয়ে

পড়ছে সমস্ত শিনকি উপত্যকায়।

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকৃতির দৃশ্যাবলী।

এগিয়ে চলেছি পাহাড় ডিঙিয়ে চড়াই-এর পথ ধরে ধীরে ধীরে। সামনের প্রকৃতিতে গাছপালার সংখ্যা কমে আসছে। রুক্ষ পাহাড়ের ফাঁকে মাঝে মাঝে ছোট ঝোপ, কোথাও বা ফার্নের জঙ্গল।

পদে পদে আলগা পাথরের খণ্ডগুলো বাধা দিচ্ছে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে। পাহাড়ী ঝর্ণার প্রচণ্ড স্রোতে পা যেন ছিটকে দিতে চায়। যেন কোন নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছি আমরা। গাছ, পাথর, নদী এখানে সবাই যেন পথের প্রহরী। তাই সকলেই একযোগে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বলতে চায়--আর এগিও না। ড্রাগন পাহাড়ের ভেতরে ঢুকলে সে আর ফিরতে পারে না।

তবু যেতে আমাদের হবেই পথের সব বাধা অতিক্রম করে বিরাট ডাইনোসরের পিছু পিছু।

অনেকটা পথ হেঁটেছি। হাতঘড়ি সময় জানাচ্ছে দুপুর অতিক্রান্ত। শরীর ক্লান্ত, পা যেন আর চলতে চায় না। তবু থামবার উপায় নেই। সঙ্গে শুকনো খাবার আছে। চলতে চলতে তাই কিছু মুখে দিয়েছি।

জানোয়ারটা একই ভাবে এগিয়ে চলেছে। মুখের মধ্যে একই ভাবে ঝুলে রয়েছে মেঘনাদ। জানিনা ও এখনও জীবিত অথবা মারা গেছে।

মেঘনাদের কথা মনে হতেই আমাব ক্লান্তি বেশ কিছুটা দূর হয়ে গেল। নিজের জীবনকে বাজি রেখে সে এত বড় বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়েছে। কেবল সত্যকে উদ্‌ঘাটনের জন্যই। ওকে আমায় বাঁচাতেই হবে। দরকার হলে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও চেষ্টা করবো।

অজস্র পদক্ষেপে চড়াই উৎরাই ভেঙে চলেছি। এতদিনের চেনা জগৎকে ফেলে এসেছি অনেক আগে। জানিনা এ পথের শেষ কোথায়। এ যেন সত্যিই আদিম পৃথিবীর এক অবলুপ্ত অধ্যায়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি আমরা। হয়তো আর কোনদিনই ফিরতে পারবো না বিংশ শতাব্দীর চেনা জগতে।

আশ্চর্য। একটা জনপ্রাণী কোথাও চোখে পড়ছে না। ড্রাগন পাহাড়ের পথে চলতে এই ভরদুপুরেও গা ছমছম করে।

এবার একটা খরস্রোতা নদী পার হতে হবে। ডাইনোসরটার কাছে এ কোন সমস্যাই নয়। দিব্যি বিরাট বিরাট পায়ে হেঁটে গেল ওপারে। আমরা চিন্তায় পড়লাম। নদীর যা স্রোত একবার ভেসে গেলে আর সামলাতে পারবো না নিজেদের। অবশেষে ঝুঁকি নিতেই হল। নদীর মাঝে মাঝে পাথরের চাঙড়। সেগুলোর ওপর পা রেখে অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম ওপারের দিকে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি পায়ের তলার পাথর গেল সরে। প্রতিটি পাথরই প্রতিনিয়ত জলের স্পর্শে পিছল হয়ে আছে, যে কোন সময়ে পা পিছলে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু

ভাগ্য বোধহয় আমাদের সহায়। ক্যাপ্টেন সিং আর আমি দুজনেই এক সময় নিরাপদে পৌঁছে গেলাম নদীর ওপারে।

নদীর পর থেকেই শুরু হয়েছে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়। অনেকগুলো গুহাও চোখে পড়ল। কে জানে ওই সব গুহার কোনটার মধ্যে ওৎ পেতে আছে কি বিপদ।

রাইফেল দুটো বাগিয়ে ধরে এবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। আর একটা পাহাড় ডিঙ্গালো জন্তুটা।

পাহার থেকে নেমেই সামনে আর একটা নেড়া পাহাড়। তার কিছুটা নীচের দিকে এক বিরাট গুহা। গুহার ভেতরটা এখান থেকে চোখে পড়ে না। ওখানে জমাট অন্ধকার।

গুহার সামনে একটা বেশ বড় পাথরের চাঙড়।

ডাইনোসরটা মেঘনাদকে সেই পাথরের চাঙড়ের ওপর নামিয়ে একটা প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল।

পাথরের ওপর মেঘনাদের দেহটা পড়ে আছে। প্রাণ আছে কি না বোঝা গেল না।

—অর্ণববাবু, আমার মনে হচ্ছে জন্তুটাকে এবার আমাদের আক্রমণ করা উচিত। কে জানে মেঘনাদ ভাইয়া সত্যিই এখনও বেঁচে আছে কি না।

কথাটা আমার প্রথমে মনে ধরল কিন্তু তারপরই মনে পড়ল মেঘনাদের গতকালের সাবধানবাণী—কোন অবস্থাতেই ডাইনোসরটাকে নিজে থেকে আক্রমণ করতে যাস নি অর্ণব। তাহলে আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুই শুধু শেষ পর্যন্ত ওটাকে অনুসরণ করে যাবি। আর....

নাঃ, এর শেষ আমাকে দেখতেই হবে। বললাম—ক্যাপ্টেন সিং, ওকে আক্রমণ করে এখন কোন ফল হবে না, তার চেয়ে বরং....

আমার কথা শেষ হবার আগেই লক্ষ্য পড়ল অন্ধকার গুহাটা থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসেছে। ওদের চেহারা এখানকার পাহাড়ী আদিবাসীদের মতই মোঙ্গলিয়ান ধরনের। দুজনেই বেঁটেখাট, বলিষ্ঠ, তবে পরনে গরম কাপড়ের প্যান্ট-সার্ট আর ভাল্লুকের চামড়ার সোয়েটার।

এই জনমানবহীন পাহাড়ী অঞ্চলে এমন বিজাতীয় সভ্য পোশাক পরা আদিবাসী সত্যিই আশা করিনি।

ওরা এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরটার কাছে, তারপর ওদের মধ্যে একজন মেঘনাদের মাথার দিকটা অন্যজন পায়ের দিকটা ধরে নিয়ে গেল গুহার মধ্যে। একটু বাদে একই চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরা আর একজন বেরিয়ে এল গুহাটা থেকে। তার হাতে একটা ভারী লম্বা শেকল। একটা শক্ত বগ্‌লস সুদ্ধ সে সেটা পরিয়ে দিল ডাইনোসরটার গলায়। তারপর চেনের আর এক প্রান্ত ধরে হেঁটে চলল পাহাড়টার পেছনে, যেমন ভাবে কুকুরের গলায় চেন বেঁধে হাঁটিয়ে

নিয়ে যাওয়া হয়। এক সময় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়টার আড়ালে।

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দেখলাম চোখের সামনের এই অভাবিত দৃশ্যটা। তারপর আমিই প্রথম কথা বললাম--ক্যাপ্টেন সিং, ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের প্রকৃত অধ্যায় এবার বোধহয় শুরু হল। বোঝাই যাচ্ছে কোন উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ এখানে একটা ঘাঁটি বানিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর ডাইনোসর তাদের পোষা এবং ওঝা দেবীরানী এদেরই এজেন্ট। আপাততঃ মেঘনাদ ওদের খপ্পরে। আপনি ফিরে যান ক্যাপ্টেন সিং, যত শিগগির পারেন আপনার লোকজন নিয়ে এসে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে বলুন।

--আর আপনি? ক্যাপ্টেন সিং জিজ্ঞেস করলেন।

--আমি ওই গুহার মধ্যে ঢুকবো।

--কিন্তু অর্ণববাবু...!

--এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই ক্যাপ্টেন সিং। মেঘনাদকে বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টাটুকু আমায় করতেই হবে। আমার হাতে রাইফেল আছে, সহজে কাবু কেউ আমায় করতে পারবে না। আমি ওই গুহার গোপন রহস্য জানতে চাই। কণ্ঠে আমার দৃঢ়তা।

সে দৃঢ়তাকে অস্বীকার করার সাধ্য ক্যাপ্টেন সিং-এর ছিল না। বললেন—বেশ, আমায় কি করতে হবে বলুন?

--অন্ধকার নামতে আর বেশি দেরি নেই। আজ রাতের মধ্যেই আপনি আপনার সশস্ত্র লোকেদের এনে এই পাহাড় ঘিরে ফেলবেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা যদি গুহা থেকে বেরিয়ে না আসি আপনারা একযোগে গুহা আক্রমণ করবেন। বুঝতে পেরেছেন?

--তাই হবে। ক্যাপ্টেন সিং মাথা নেড়ে বললেন।--কিন্তু অর্ণববাবু, আমি আবার বলছি, যে পথে আপনি এগোতে চাইছেন মেঘনাদের মতোই তা এক ভয়ঙ্কর পথ। আমার স্থির ধারণা ওই গুহার মধ্যে আছে এক মরণ ফাঁদ।

ক্যাপ্টেন সিং-এর উপদেশ সেই মুহূর্তে আমার কাছে কোন অর্থই বহন করছিল না, কারণ মেঘনাদকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তাও আমি কখনও করতে পারি না।

ক্যাপ্টেন সিং আর কিছু বললেন না। ওঁর শরীরটা এক সময় মিলিয়ে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

এখন আমায় এগোতে হবে সামনের ওই রহস্যময় অন্ধকার গুহাটার মধ্য দিয়ে। ওটা বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা বিরাট অজগর হাঁ করে আছে।

এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে পাঁচ ব্যাটারী টর্চটা বাগিয়ে ধরে গুহার মধ্যে পা বাড়ালাম।

ষোল

| অন্ধকার গুহাপথে |

গুহার মধ্যে টর্চের আলো পড়ল। বেশ চওড়া, স্যাঁতসেঁতে গুহার মেঝে, দেয়াল, ছাদ। সামনে কতটা পথ গেছে কে জানে! গুহাটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লোকজন নিয়মিতই চলাচল করে মনে হয়। কিন্তু এখন কোথাও কোন শব্দ নেই। গুহার মধ্যে পা দিতেই একরাশ নৈঃশব্দ যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। গাটা ছমছম করে উঠল। একটু থমকে দাঁড়ালাম তারপর টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে চললাম আরো ভেতরে।

লম্বা গুহা-পথ। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি কিন্তু এখনও গুহার শেষ দেখতে পাই নি।

হঠাৎ পেছনে পদশব্দ। কে যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে।

পিছু ফিরতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই একটা ভারী ধাতব ডাণ্ডা এসে সজোরে আঘাত করল মাথার পেছনে। এটুকুই শুধু অনুভব করলাম।

চোখের সামনে রাশি রাশি সরষে ফুল। তলিয়ে যেতে লাগলাম চেতনার অন্ধকারে।

শুধু অজ্ঞান হবার পূর্ব মুহূর্তে মনে হল দুটি বলিষ্ঠ হাত আমায় যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

সতেরো

[বন্দী দশায় বাঙালী খানা]

যখন জ্ঞান ফিরলো সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম। এ কোথায় শুয়ে আছি আমি? প্রায় অন্ধকার একটা বদ্ধ গুহা। মেঝে, দেয়াল, সব কিছু পাথরের। সিলিং-এ অবশ্য একটা মিটমিটে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। কিন্তু ওটুকু আলো যেন অন্ধকারের অস্তিত্বকে আরও প্রকট করে দিয়েছে।

সময়টা দিন না রাত্তির কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ছাদের সিলিং-এর নীচে যে বাতাস চলাচলের জন্যে একটা ছোট্ট ফোকর আছে সে পথে এক চিলতে আলোও ঢুকছে না। আমার হাতঘড়িটাও নেই। ওটা হয় পড়ে গেছে অথবা ওদের কেউ খুলে নিয়েছে।

এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছি। একটু একটু করে গত সমস্ত ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো। এ কাদের পাল্লায় পড়েছি আমি?

একটা অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক শব্দ কানে এল। শব্দটা এই ঘর থেকেই শোনা গেছে। মাথাটা তুলে এদিক ওদিক তাকালাম। এটা আসলে ছোট্ট একটা গুহা। কিন্তু গুহামুখ পাথর দিয়ে বন্ধ। গুহার এক কোণে একজন শুয়ে আছে না? হ্যাঁ, তাইতো। আমারই মতো অন্য কোন হতভাগ্য নিশ্চয়ই।

মাথাটা একটু তুলে চাপা গলায় বললাম, কে ওখানে?

মানুষটা নড়ে উঠলো তারপর আমার চেয়েও চাপা কণ্ঠে বললো, চুপ, কথা বলিস নি। ওরা টের পাবে। গুহার বাইরেই পাহারা আছে।

মেঘনাদ!

আর একটু হলেই আমি সব কিছু ভুলে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম—মেঘনাদ তাহলে বেঁচে আছে!

কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলাম। জীবন এখনও আমাদের ঘোর সংশয়াচ্ছন্ন।

হাত পা বাঁধা ওই অবস্থাতেই গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গেলাম মেঘনাদের কাছে। মেঘনাদের কোমর আর পা জুড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। মোটা তুলোর প্যাডও ডাইনোসরের কামড়ের হাত থেকে ওর শরীরের চামড়া সম্পূর্ণ বাঁচাতে পারে নি।

মেঘনাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—এ কোথায় এসেছি আমরা বলতে পারিস? এরা কারা?

--সম্পূর্ণটা এখনও টের পাইনি। তবে সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত রহস্যময়। হয়তো সে রহস্য জানতে আমাদের আর দেরী নেই।

মেঘনাদ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও রহস্যভেদের চিন্তা ছাড়তে পারে নি। আশ্চর্য মানুষ যা হোক।

বললাম—এখন সময়টা কি বলতে পারিস? আমি তো কিছু ঠাওর পাচ্ছি না।

--গভীর রাত্রি। মেঘনাদ জানাল।

অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সিং নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাঁর লোকজন নিয়ে রওনা দিয়েছেন ড্রাগন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। অবশ্য যদি না পাহাড়ী পথের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেন অথবা অন্য কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

গুহা মুখে গুম্ গুম্ শব্দ!

সামনের ভারী পাথরটা সরে যাচ্ছে। ক্রমে প্রবেশ পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হল। সন্ধ্যেবেলা দেখা সেই আদিবাসী দুজন গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। একজনের হাতে ট্রেতে খাবার প্লেট, অন্যজনের দু-হাতে দুটি রিভলবার। আমাদের দিকেই তাক করা।

প্লেটের খাবারের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ভাত, মাছ, তরকারী, ডাল। পুরোপুরি বাঙালী রান্না।

আদিবাসীটার দিকে তাকিয়ে বললাম—এসব রান্না এখানে কে করলো?

সে আমার বক্তব্য কিছু বুঝলো মনে হল না। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো। তা আমারও বোঝার বাইরে।

আবার একটা কিছু বলতে যাচ্ছি হঠাৎ গুহা মুখ থেকে একটা ভারী কণ্ঠ শোনা

গেল ঃ শুধু ভাত তরকারী কেন, আপনাদের জন্যে মোচার ঘন্ট, করলা শুক্তো এসব আয়োজনও করতে পারি। হাজার হোক তোমরা আমার অতিথি অর্ণববাবু, তারপর বেশ কিছুদিন ঘর ছাড়া।

বুঝতে অসুবিধে নেই। পরিষ্কার বাংলা কথা।

তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করেছেন। বয়স ষাট থেকে আশির মধ্যে যে কোন সংখ্যা হতে পারে। একমাথা সাদা ধবধবে উস্কোখুস্কো চুল, দাড়ি, পরনে ঝলঝলে গরম কাপড়ের পোশাক। চেহারাটা শুকনো হাড্ডিসার। নাকের ওপর পাওয়ারওলা কাঁচের রিমলেশ ফ্রেমের চশমা।

বৃদ্ধ ঘরে ঢুকে প্রথমে আমাদের দুজনের দিকেই ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বিচিত্র হাসি হেসে বললেন—বয়সটা কম হলে কি হয় তোমাদের বুকের পাটা আছে স্বীকার করতেই হচ্ছে। এরপর যে আদিবাসীটা আমাদের জন্যে খাবার এনেছিল তাকে দুর্বোধ্য উচ্চারণে কি যেন বললেন।

সে আমার আর মেঘনাদের হাত পায়ের সমস্ত বাঁধন খুলে দিল।

বৃদ্ধ এবার একটা পাথরের স্তূপের ওপর বসে সেই বিচিত্র হাসিটা হেসে বললেন-তোমাদের এখানে এভাবে এতক্ষণ হাত পা বেঁধে ফেলে রাখার জন্য দুঃখিত অর্ণববাবু, মেঘনাদবাবু—কিন্তু এছাড়া আমার আর উপায় ছিল না...বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এই দেখ, তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোর না যেন, সব দিক থেকে আশা করি সে অধিকার আমার আছে—আর নামের শেষে 'বাবু'টাও বর্জন করি, কি বল—ওটাতে বড় কৃত্রিম মনে হয়।

আমরা কিন্তু একটা কথাও না বলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম মানুষটার দিকে। ড্রাগন পাহাড়ের আশ্চর্য গুহায় কে এই বৃদ্ধ? ইনি আমাদের নাম পর্যন্ত জানেন অথচ আমরা এঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

—পরস্পরকে চেনা জানা নিশ্চয়ই হবে। এত কষ্ট করে যখন তোমরা আমার এখানে এসে পড়েছ তোমাদের সাধ অপূর্ণ রাখবো না নিশ্চয়ই। উনি বোধহয় আমাদের মনের কথাটা টের পেয়েই বললেন। —কিন্তু তার আগে খাওয়াটা সেরে নাও। অতিথি অভুক্ত থাকুক এ আমি চাই না। আবার সেই বিচিত্র হাসিটা হাসলেন বৃদ্ধ। এটা বোধহয় ওঁর একটা মুদ্রা দোষ।

তবে পেটে যে আমাদের খিদের আগুন জ্বলছিল তা অস্বীকার করার নয়। আমার থেকেও বেশি মেঘনাদের। তাই দ্বিতীয়বার এ সম্পর্কে ভাবনার অবকাশ না রেখেই কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা খাবার প্লেট সাফ করে ফেললাম।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে সেই আদিবাসী লোকটা এঁটোকাঁটা তুলে নিয়ে চলে গেল। তবে আর একজন কিন্তু একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের দিকে সতর্ক চোখে রিভলবার তাক করে।

বৃদ্ধ বললেন, ও লোকটাকে দেখে অস্বস্তি বোধ কোর না তোমরা। আমি না

হুকুম করলে ও কিছুই করবে না তোমাদের। তবু ওকে রাখতে হয়েছে নিরাপত্তার জন্যে। বুঝতেই পারছ আমার এই জীর্ণ প্রাচীন শরীরটাকে কাবু করে ফেলা একটা ব্যাঙের পক্ষেও সম্ভব।

নিজের রসিকতাতেই নিজে হাসলেন বৃদ্ধ। আমরা নিঃশব্দে তাকিয়েছিলাম এই অদ্ভুত মানুষটার দিকে।

—মেঘনাদ, একটা কথা জানিয়ে দিই। তোমার পেট আর উরুর ক্ষতগুলো মারাত্মক কিছু নয়। আগে থেকেই তুমি অবশ্য বুদ্ধি করে পোশাকের নীচে মোটা তুলোর প্যাড পরেছিলে, তবু ডায়নার যে কটা দাঁত তোমায় ছুঁয়ে গেছে তাতেই কিঞ্চিৎ রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু আমি ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। আমার ওষুধ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ করে।

—কিন্তু আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি? কে আপনি? মেঘনাদ এতক্ষণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছে। চোয়াল দুটো ওর শক্ত হয়ে রয়েছে।

—কে আমি? আমার পরিচয় জানতে চাও? বৃদ্ধ এবার হেসে উঠলেন। কৌতুক ঝলমলে এক বিচিত্র হাসি।

—হ্যাঁ, সেটাই আমাদের সব থেকে আগে জানা প্রয়োজন। মেঘনাদের চোখ দুটো জ্বলছে। এতক্ষণে এটা জানতে পেরেছি আপনি একজন বাঙালী। এই পাহাড়ী গুহা, লোকজন, প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় ডাইনোসর, শিনকি উপত্যকার আদিবাসীদের ওঝা দেবীরানী এরা সবাই আপনার নির্দেশে চালিত। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে ড্রাগন পাহাড়ে এক বিভীষিকার অন্তরালে আপনি লুকিয়ে আছেন নিশ্চয়ই কোন অসামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে।

—না, একথা ভুল। এতক্ষণের প্রসন্ন মেজাজ হারিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। উত্তেজনায় তাঁর সারা শরীরটা কাঁপতে শুরু করেছে। সভ্য সমাজ বলতে তোমরা যা নির্দেশ করো সেটাই আসলে একটা বর্বর, ব্যভিচারী স্থান...

বৃদ্ধ অস্থির পদক্ষেপে বেশ কয়েকবার পায়চারী করলেন গুহার মধ্যে। তারপর এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার পরিচয় জানতে চাও, কিন্তু পরিচয় দিলেও তোমরা, আজকের ছেলেরা কি চিনতে পারবে আমায়? আমি তো আজ হারিয়ে গেছি তোমাদের জগৎ থেকে তোমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে। তবু পরিচয় জানাতে আমার বাধা নেই। তুমি যথার্থই অনুমান করেছ আমি বাঙালী। আমার আদি নিবাস কলকাতা। আমার নাম ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী।

আঠারো
[ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী]

স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত উল্টে যাই। কবে, কোথায় যেন শুনেছি এ নাম। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না।

মেঘনাদের কণ্ঠে চমক ভাঙলো। ও বলছে—ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী মানে কি সেই বিতর্কিত বিজ্ঞানী? একটা পুরনো জার্নালে দেখেছি আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রচণ্ড হৈ চৈ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল যাঁর গবেষণা?

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের চোখ দুটি। আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—ঠিকই বলেছ, আমিই সেই বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। তারপর আবার মেঘানাদই বলল, কিন্তু সভ্য জগতের বাইরে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে কি উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন আপনি? আদিবাসী ওঝা দেবীরানীর সঙ্গেই বা আপনার সম্পর্ক কি? যতদূর জেনেছি তিনি একজন শিক্ষিতা বাঙালী ঘরের মহিলা—তবে কেন তিনি জংলী আদিবাসীদের তন্ত্র মন্ত্র কুসংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বছরের পর বছর? আর আদিবাসীদের জীবন্ত দেবতা ওই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর ডাইনোসরটা, আজও ওটা পৃথিবীতে চরে বেড়াচ্ছে কিভাবে? শুধু তাই নয়, সে একটা পোষা কুকুরের মতো আপনাদের বশ মেনেছে আর প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে একটি করে আদিবাসী যুবককে মুখে করে নিয়ে আসছে ড্রাগন পাহাড়ে আপনার আস্তানায়—এরই বা মূল রহস্য কোথায়?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন নামতার মতো আওড়ে গেছে মেঘনাদ। প্রশ্নগুলো আমার বুকেও পাথরের মতো ভারী হয়ে বসেছিল। এতক্ষণে শুধু এটুকু আমরা জেনেছি ড্রাগন পাহাড়ের সকল রহস্যের মূল চাবিকাঠি এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর হাতেই। কিন্তু এ কোন খেলায় মেতে আছেন তিনি?

মেঘনাদের উজাড় করা প্রশ্নের ঢেউ কিছুক্ষণের জন্য যেন আচ্ছন্ন করে দিল ডক্টর রায়চৌধুরীকে। একটু সময় ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন তিনি বোধকরি কখনও হন নি।

একটু বাদে মাথা তুললেন, তারপর মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার

সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব তবে আজ নয়। আজকে রাতটা বিশ্রাম কর তোমরা। আগামীকাল তোমাদের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়ে দেব কথা দিলাম।

আর দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে ডক্টর রায়চৌধুরী গুহাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সেই রিভলবারধারী পাহারাদারটা।

গুম্ গুম্ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গুহার দরজা।

গুহার মধ্যে আমরা দুজন মুখোমুখি—মেঘনাদ আর আমি।

মেঘনাদকে বললাম, কিছু বুঝতে পারলি?

—কিছুটা। বাকিটুকুর জন্যে আমাদের আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

বললাম, তোর আয়ুর জোর আছে। যে অবস্থায় এসেছিলি, এত চটপট আঘাত সামলে উঠে বসা সম্ভব ছিল না।

—রাখে হরি মারে কে। মেঘনাদ হাসল ঃ তাছাড়া চিন্তা করে দেখলাম এত দূর এত কষ্ট করে আসার পর রহস্যের সম্পূর্ণ মীমাংসা না করে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। মৃত্যু তো প্রতি মানুষের জীবনেই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মৃত্যুর বিনিময়ে কতটুকু অর্জন করতে পারি আমরা?

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম মনটা কি ওর সত্যিই শিনকি উপত্যকার শক্ত পাথরের মত তৈরি।

প্রসঙ্গ পালটে বললাম, ডাইনোসরের মুখ থেকে ছাড়া পাবার পর কি দেখলি বল?

—তখন আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য। কিছুই টের পাই নি। জ্ঞান যখন ফিরল দেখি এই গুহায় বন্দী। শরীরে বেশ কয়েকটা ক্ষত, ব্যাণ্ডেজ জড়ান, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হচ্ছে। কিন্তু তোর কি অভিজ্ঞতা হল শুনি?

মেঘনাদকে সব কিছুই খুলে বললাম। ড্রাগন পাহাড়ের মুখে ক্যাপ্টেন সিংকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রতীক্ষা করার সময় থেকে ডাইনোসরকে অনুসরণ করে ড্রাগন পাহাড়ের গুহামুখ পর্যন্ত হেঁটে আসার সব কিছু অভিজ্ঞতার কথা। ক্যাপ্টেন সিং যে তাঁর লোকজন নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবেন এবং পাহাড়ী শিলাখণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আগামীকাল সন্ধ্যের মধ্যে আমরা এই গুহা থেকে না বেরুলে এক সঙ্গে সবাই মিলে গুহা আক্রমণ করবেন তা জানাতেও ভুললাম না।

মেঘনাদ আগাগোড়া আমার সব কথা চুপ করে মন দিয়ে শুনল তারপর বললো-শুধু শেষের ব্যাপারটাতেই আমার কিছু চিন্তা রইলো। ক্যাপ্টেন সিং যে ধরনের রগচটা মানুষ...বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললো, এখন ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর কর্ম রহস্যটাই সর্বাগ্রে সমাধান হওয়া দরকার।

—কিন্তু এখন কি করার আছে আমাদের?

—কিছু না। আপাততঃ নিরালম্ব, নিশ্চিন্ত একটা টানা ঘুম। শরীরটা আমার সত্যিই ভীষণ অবসন্ন।

আস্তে আস্তে শরীরটা চিতিয়ে মেঘনাদ শুয়ে পড়লো। মুহূর্ত পরে নাসিকা গর্জনও শুরু হয়ে গেল। সে গর্জন ড্রাগন পাহাড়ের ডাইনোসরের ডাকের থেকেও কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর নয়।

অগত্যা মেঝেতে আমিও লম্বা হলাম।

উনিশ

[গুহার মধ্যে ল্যাবরেটারী]

পরদিন ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। গুহার ওপর দিকে যে ফোকরটা আছে সেখান দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘরে লুটিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি মেঘনাদও ইতিমধ্যে উঠে বসেছে। কি যেন ভাবছে আপন মনে।

আমায় উঠে বসতে দেখে মেঘনাদ বললো, ঘুম ভাঙলো শেষ পর্যন্ত! আয়, আগে ব্রেকফাস্টের সদ্‌গতি করে নি।

পাথরের টিবিটার ওপর দুজনের জন্যে ব্রেকফাস্ট সাজানো রয়েছে। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, চা সেই সঙ্গে এক গুচ্ছ আঙ্গুর। কখন এসে ওরা এখানে রেখে গেছে কে জানে। কিন্তু পটে চা বেশ গরম রয়েছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

গুম্ গুম্ শব্দে গুহার দরজাটা আবার খুলে গেল।

প্রবেশ করলো গতকালের সেই গুণ্ডা আকৃতির আদিবাসী লোকটা। দরজার কাছেও একজন দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। যথারীতি তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

প্রথম লোকটির হাতে দুটি তোয়ালে। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো সে। মনে হল সে আমাদের বাইরে যেতে বলছে।

সেই লোকটিই আমাদের প্রাতঃকৃত্যের সব ব্যবস্থা করে দিল। বুঝলাম সব কিছুই ডক্টর রায়চৌধুরীর নির্দেশেই হয়ে চলেছে এবং তাঁর আতিথ্যের কোন ত্রুটি নেই।

কিন্তু সারা সকালের মধ্যেও আমরা একবার ডক্টর রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎ পেলাম না। অবশ্য এজন্য সময় মতো কোন কিছু পেতে আমাদের অসুবিধে হয় নি। এমন কি দুপুরের ভোজনপর্বটিও বেশ সুষ্ঠু ভাবেই সমাধা হচ্ছে আমাদের-- একেবারে বাঙালী মতে রান্না। আমার তো মনে হচ্ছিল বেশ তোফা আছি।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে একটু তন্দ্রামত এসেছিল হঠাৎ সেই পরিচিত গুম্ গুম্ শব্দে উঠে বসলাম।

গুহার দরজা খুলে সেদিনের সেই প্রথম লোকটি প্রবেশ করছে।

আমাদের কি যেন ইঙ্গিত করলো ও। ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি। কিন্তু মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অর্ণব, চল আমাদের যেতে হবে—ডক্টর রায়চৌধুরী আমাদের তলব পাঠিয়েছেন।

মেঘনাদ এখন প্রায় সুস্থ, বেশ ভাল ভাবেই হাঁটা চলা করতে পারছে। ডক্টর রায়চৌধুরীর ওষুধ ম্যাজিকের মতই কাজ করেছে।

লোকটির পিছু পিছু আমরা দুজনে হেঁটে চললাম। পেছনে আর একজন রিভলবারধারী ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতেই বুঝতে পারছিলাম গুহাটা বিশাল। মূল গুহা পথ থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন অংশে। মাঝে মাঝে আশে পাশে কয়েকটি গুহা ঘর। মনে হল এক প্রাচীন প্রাকৃতিক গুহাকে বেশ নিপুণভাবেই প্রয়োজনীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু খোদাই-এর কাজও রয়েছে।

গুহার একেবারে ভেতরে সূর্যের আলো ঢোকে না কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট বালবের তীব্র আলো সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। পাওয়ার স্টেশনের এক নাগাড়ে

ঘড়-ঘড় শব্দ। কাছেই কোথাও জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

হঠাৎ একটা গোঙানীর আওয়াজ। কে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। শব্দটা খুব কাছেই কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছে। ও কার আর্তনাদ? কিসের যন্ত্রণা ওর? কান পেতে আরও কিছু শোনার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ পিঠে ধাতব নলের স্পর্শ। রিভলবারধারী প্রহরী আমাদের এগিয়ে চলার নির্দেশ দিচ্ছে।

সে নির্দেশ আপাততঃ অমান্য করার উপায় নেই।

টানা গুহাপথ ধরে আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

আরও কিছুটা হাঁটার পর বাঁদিকে ঘুরলাম। সামনেই একটা বড় গুহাঘর।

একটা বিরাট ল্যাবরেটারী।

নানা রকম আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে সাজানো। দেওয়ালের তাকগুলিতে নানা রঙের কেমিক্যালস-এর বোতল। লম্বা টেবিলের ওপর কাঠের হোল্ডিংস-এ বসানো বিভিন্ন আকারের টেস্টটিউব, বুনসেন বার্ণার। ল্যাবরেটারীর অপরদিকে আরও নানা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রপাতি—যা আমার মত আনাড়ি লোকের পক্ষে বুঝে ওঠা শক্ত।

সব মিলিয়ে শিনকি উপত্যকার গহন পাহাড়ী অঞ্চলের গুহার মধ্যে এ কি অদ্ভুত বিস্ময়!

দেখলাম আমার মত মেঘনাদের বিস্মিত দৃষ্টিও সারা ল্যাবরেটারী গুহার মধ্যে ঘুরে ফিরছে।

—স্বাগতম মেঘনাদ আর অর্ণব। আশা করি, আজকের দিনটা তোমাদের বেশ আরামেই কেটেছে।

তাকিয়ে দেখি বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী ল্যাবরেটারী ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে সেই বিচিত্র হাসিটা হাসছেন।

এ হাসি মানুষটার চরিত্রের সঙ্গে কেমন যেন বেমানান বেখাপ্পা মনে হয়। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করে।

—আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কারণটা আশা করি বুঝতে পারছ। গতকাল রাতে আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাদের সব কৌতূহল আমি মেটাব।

এরপর ডক্টর রায়চৌধুরী আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রিভলবারধারী প্রহরীটিকে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললেন। সে চলে গেল।

ওকে এখান থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়াতে বলেছি। তোমাদের অস্বস্তির কথা অনুমান করেই। সেই বিচিত্র হাসিটা হেসে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী বললেন-

-তোমাদের অবস্থায় পড়লে আমারও একই দশা হত স্বীকার করছি।

সামনেই একটা লম্বা সোফা ছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—বোস।

বসলাম, সঙ্গে তিনিও বসলেন।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। তারপর ডক্টর রায়চৌধুরী বললেন ঃ আমি আজ আমার জীবনের সমস্ত কথা তোমাদের বলতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে একটা শর্ত থাকবে।

—কি শর্ত? আমি বললাম।

—আমায় কথা দিতে হবে সব বলার শেষে যা অনুরোধ করবো তাতে রাজী হবে তোমরা।

—অনুরোধ কি না জেনে কথা দেওয়া কি সম্ভব ডক্টর রায়চৌধুরী?

মেঘনাদের কথার উত্তরে শান্ত চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর, তারপর মুহূর্ত পরেই ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—বেশ তো, আমার জীবন কাহিনীটাই তাহলে আগে শোন তোমরা।

কুড়ি

[ডাক্তারের আশ্চর্য গবেষণা]

সোফা ছেড়ে উঠে ল্যাবরেটারী গুহা-ঘরে বেশ কয়েকবার পায়চারী করলেন ডক্টর রায়চৌধুরী। অতীতের প্রসঙ্গে স্মৃতির ঝড় উঠেছে তাঁর মনে।

এইভাবে কিছুটা সময় কেটে গেল। আমরাও নীরবে প্রতীক্ষা করছিলাম।

হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ডক্টর রায়চৌধুরী। তাঁর দু চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন—শোন মেঘনাদ আর অর্ণব। আমি ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী। সভ্য দুনিয়ার আমি একজন সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানী, কিন্তু তোমাদের সভ্য সমাজ আমায় শুধু অবহেলাই করে নি, করেছে চরম অপমান আর বঞ্চনা। তা যদি না করতো তাহলে আমার জীবনব্যাপী গবেষণার স্বার্থে উত্তরের এই দুর্গম পাহাড়ী গুহায় এমন চোরের মতো লুকিয়ে থেকে গবেষণা চালাতে হত না।

—কি ধরনের অপমান আপনাকে সইতে হয়েছে শুনতে পারি? আর কারণটাই বা কি?

আমার এ প্রশ্নে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ডঃ রায়চৌধুরীর মুখের চেহারা গেল বদলে। বুকের মধ্যে চাপা বারুদে অগ্নি সংযোগ হল বুঝি।

উনি চিৎকার করে উঠলেন—যে অপমান আর অকৃতজ্ঞতার বোঝা একদিন ওরা এক মানবসেবী বিজ্ঞানীর মাথায় চাপাতে চেয়েছে তার নজির ইতিহাসে দুর্লভ। ওরা আমায় হেনস্থা করেছে, আমার নামে খুনের অভিযোগ এনে আমার বডি ওয়ারেন্ট বার করেছে...।

—ডঃ রায়চৌধুরী।

—ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী থমকে গেলেন। উত্তেজনার আধিক্যে উনি যেন কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবার প্রকৃতিস্থ হতে চাইলেন। একটু থেমে বললেন—আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি বাস করতাম কলকাতা মহানগরীতে। আমার রিসার্চ ল্যাবরেটারী ছিল ভবানীপুরের রূপচাঁদ মুখার্জী লেনে। পেশায় ছিলাম আমি ডাক্তার।

—আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু কি ছিল? মেঘনাদ প্রশ্ন করলো।

—হিউম্যান বডি। মানুষের জরা এবং বার্ধক্য রোধ করে মানুষকে ইচ্ছা মত দীর্ঘায়ু করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আমি আমার গবেষণা শুরু করেছিলাম।

—কিন্তু তা কি সম্ভব! আজ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টায় কেউ সফলকাম হন নি। তাছাড়া....

মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগেই ড্ঃ রায়চৌধুরী বলে উঠলেন ঃ তাছাড়া তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝেছি মেঘনাদ। অতি দীর্ঘ আয়ু সাধারণ মানুষের জীবনকে শুধু বিড়ম্বিতই করে না, আনে অবসাদ, ক্লান্তি। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে এ জিনিস মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সঙ্গে বার্ধক্যও মনুষ্য দেহের স্বাভাবিক পরিণতি ....বলতে বলতে ড্ঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ল্যাবরেটারী গুহার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফিরে এসে বললেন—কিন্তু মনুষ্য সভ্যতা এবং সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনে কোন কোন বিশেষ মানুষকে এই পৃথিবীর বাতাসে আরও কিছু বেশি বছর সতেজ যৌবনদেহী করে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে এই পৃথিবীই অর্জন করতে পারে আরও কিছু সুফল। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ড্ঃ রায়চৌধুরী। ভাবতে পার ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁর প্রধান প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য জগদীশ বসু কিংবা রবীন্দ্রনাথকে যদি আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রাখা যেত কিংবা এই পৃথিবীতে আমরা যদি আইজাক নিউটন, আইনস্টাইন-এর মত বিজ্ঞানী, মার্কস, লেনিন, হো-চি-মিনের মতো তাত্ত্বিক রাষ্ট্র-নেতাকে আরও বেশ কিছু বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম—তবে কি পৃথিবী তাঁদের কাছ থেকে আরও কিছু অর্জন করতে পারতো না? হয়তো বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস যেত বদলে। মনুষ্য জাতির দুর্ভাগ্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয় কিন্তু এ ধরনের প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন মাত্র অল্প কয়েকজন। আরও দুর্ভাগ্য, তাদের মধ্যেও অনেককেই জীবন থেকে বিদায় নিতে হয় তাঁদের আরাধ্য কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই। এই ভাবেই ধরিত্রী যুগে যুগে বঞ্চিত হয় তার সম্পূর্ণ পাওনা থেকে।

আমরা নিঃশব্দে শুনছিলাম ড্ঃ রায়চৌধুরীর কথাগুলি। তাঁর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য প্রত্যয়। একটু থেমে আবার উনি বলতে শুরু করলেন ঃ তাই মানুষের দীর্ঘায়ু লাভের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আমার গবেষণা শুরু করি। আমি আমার গবেষণার খুঁটিনাটি তথ্যগুলো তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে রাজী নই তবে এ ব্যাপারে প্রধান যে বিষয়টা আমি বেছে নিয়েছি তা হল মানুষকে দীর্ঘায়ু করার জন্য সর্বাগ্রে দরকার মানুষের শরীরের ক্ষয় অথবা বার্ধক্যকে জয় করা। একজন যৌবন চঞ্চল সতেজ সবল মানুষ অনেক বেশি আয়ুর অধিকারী হতে পারে।

—কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় মানুষের বার্ধক্য জয় করা কি সম্ভব। মেঘনাদ

আবার তার সংশয় প্রকাশ করে।

—অবশ্যই সম্ভব। উত্তেজনার আধিক্যে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডঃ রায়চৌধুরীর। তিনি বলে চলেন ঃ মানুষের বার্ধক্যের মূল কারণটা জানলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে পারি। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে নানা তত্ত্বের অবতারণা করলেও আমি মূলতঃ গবেষণার মাধ্যমে যা জেনেছি তা হল লক্ষ লক্ষ জিন দিয়ে তৈরি এক একটি ক্রোমোসোম—সে ক্রোমোসোম দিয়ে দেহকোষ গঠিত, আসলে এই জিনগুলিই হল সমস্ত শারীরবৃত্তীয় ঘটনার নিয়ন্ত্রক। জন্মের পর থেকেই এরা পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবনকে চালিত করে সমাপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। এই পর্যন্ত বলে বোধহয় একটু দম নিলেন ডঃ রায়চৌধুরী, তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে শেষটুকু যোগ করলেন—আমার গবেষণা মানুষের দেহকোষের ক্রোমোসোম-এর প্রাণ 'জিন'-এর রহস্য ভেদ করে তাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী সতেজ করে মানুষের আয়ুকেও কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি করা। এতে শুধু যে মানুষ আয়ু এবং যৌবনই ফিরে পেতে পারে তাই নয়—আমার গবেষণার সাফল্যে রোধ হতে পারে মানুষের শরীরের অধিকাংশ রোগ এবং ব্যাধি। এই স্বপ্ন নিয়েই আমি আমার গবেষণা শুরু করেছিলাম আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

—তারপর? যেন অজান্তেই শব্দটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

—গবেষণা শুরু করেছিলাম প্রথমে উদ্ভিদের ওপর। কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সুফল পেলাম। এরপর পরীক্ষা চালালাম টিকটিকি, গিনিপিগ, খরগোস ইত্যাদি ছোটখাট জীবের ওপর। তারপর একদিন মনে হল এবার কোন মানুষের শরীরে আমার এ এক্সপেরিমেন্টটা চালান দরকার।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন ডঃ রায়চৌধুরী, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন ঃ

—ছোটখাট জীবের ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে তা অত সহজ নয়। মানুষের শরীর আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল কলকব্জায় ভরা।...

তবু দুঃসাহসে বুক বেঁধে মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা নিলাম।

কিন্তু এ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন যে সুস্থ সবল মানুষ—তা কোথায় পাব?

উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, নিজের জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে কজন এগিয়ে আসে এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করতে?

কিন্তু তবু এগিয়ে এল একজন—আমারই রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট শুভাশিস রায়। আমার কোন আপত্তিতেই সে কান দিল না। স্ত্রী তার আগেই মারা গেছে, সংসারে আছে তার একটি মাত্র মেয়ে, বছর পাঁচেক তার বয়স আর আছে কিছু সম্পত্তি। আমায় দেবতার মত ভক্তি করতো শুভাশিস। তার দৃঢ় ধারণা ছিল আমার

এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হতে পারে না। তবু তার ওপর এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার আগে জোর করে তার সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিল—সেই সঙ্গে তার মেয়ে মিতালীর দায়-দায়িত্ব।

—পরীক্ষা কি আপনার সফল হয়েছিল? আমি প্রশ্ন করি।

—না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডঃ রায়চৌধুরী, তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন--ল্যাবরেটারীতে শুভাশিসের 'জিন'-এ কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল ওর। যে ছিল পৃথিবীতে আমার সব থেকে আপনজন—দীর্ঘ দশ বছর গবেষণায় যে ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী—যে তার যথাসর্বস্ব এবং নিজের জীবনটাকেও দান করে গেল আমার গবেষণার কাজে...বলতে বলতে অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল ডঃ রায়চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভবতঃ নিজেকে সামলাবার চেষ্টাই করতে লাগলেন।

—তারপর? আমি নীরবতা ভাঙলাম।

—এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু আমি বন্ধ করলাম না। সেই মুহূর্তে এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করার অর্থ শুভাশিসের আত্মবলিদান ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। তাছাড়া কেনই বা বন্ধ করবো আমার গবেষণা—আমি জানতাম আমার থিয়োরী নির্ভুল। গলদ যেটুকু তা প্রয়োগ পদ্ধতিতে। সফল একদিন আমি হবোই।

সুতরাং এ পরীক্ষা আমায় চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কার ওপর প্রয়োগ করবো আমার কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট? মানুষ কোথায়? শুভাশিসের মত আর কে এগিয়ে আসবে নিজের জীবনের বিনিময়ে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির স্বার্থে?

কেউ রাজী হল না।

আশাভঙ্গের অস্থিরতায় আমি ক্রমশঃ উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগলাম। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সুস্থ জীবন্ত মানুষ আমার চাই-ই। যে কোন পথে, যে কোন উপায়ে।

অবশেষে অন্ধকার বাঁকা পথে নামলাম।

তখন সবেমাত্র দেশ বিভাগ হয়েছে। হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাঙলায় পালিয়ে আসছে। সুষ্ঠু পুনর্বাসন অনেকেই পাচ্ছে না, তারা রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে শিয়ালদহ স্টেশন, ফুটপাথ কিংবা বাড়ির খোলা গাড়ি বারান্দায়।

আমি রাতের অন্ধকারে মানুষ চুরি শুরু করলাম।

—মানুষ চুরি? মেঘনাদের কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। উত্তেজনায় গলা কাঁপতে লাগলো ডঃ রায়চৌধুরীর। বললেন ঃ কি দাম ওই মানুষগুলোর। জীবনের অবহেলায় আর বুভুক্ষায় ওদের তো অনেকেরই মৃত্যু

হত কিছুদিনের মধ্যে। তার মধ্যে কয়েকজন যদি জীবন উৎসর্গ করে—আগামী কালের বিজ্ঞান শুরু করবে নতুন ইতিহাস। সভ্যতা এগিয়ে যাবে নতুন আলোর পথে।

—কিন্তু এ কাজ করতেন কি ভাবে? জিজ্ঞেস না করে পারি না।

—নির্জন রাতে একা একা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম শহর কলকাতার আনাচে কানাচে। তারপর সুবিধে মতো জায়গায় সুযোগ পেলেই ক্লোরোফরমে অজ্ঞান করে তুলে আনতাম কোন ভবঘুরেকে।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় সত্ত্বেও আমি সফলতার মুখ দেখতে পেলাম না। একটা মানুষও বাঁচলো না। জিনের ওপর কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের ধাক্কা একটা শরীরও সইতে পারলো না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই আমার পরীক্ষিত মানুষটি ঢলে পড়তো মৃত্যু ঘুমে।

এইভাবে একটার পর একটা মানুষ মরতে লাগলো আমার হাতে। বুঝলাম, আমার গবেষণা এবং তত্ত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে। সেটি আবিষ্কার না করতে পারা পর্যন্ত চালাতে হবে আরও পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা কার্য। এজন্য প্রয়োজন আরও মনুষ্য দেহ।

এক্সপেরিমেন্ট আমার বন্ধ হল না। কিন্তু বাধা এল অন্য জায়গা থেকে। মারাত্মক বাধা। রাতের আঁধারে কলকাতার ফুটপাত থেকে একটার পর একটা মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাবার ঘটনায় পুলিশের টনক নড়েছিল আগেই, এরপর গোয়েন্দা লাগলো আমার পেছনে। প্রায় ধরা পড়ে যাবার অবস্থায় পৌঁছলাম। আমি বুঝেছিলাম ধরা যদি পড়ি—আইন আমাকে রেহাই দেবে না। উদ্দেশ্য আমার যত মহৎই হোক, সভ্য মানুষের বিচারশালা আমায় অভিযুক্ত করবে বহু হত্যাকাণ্ডের অপরাধে। শাস্তি অবধারিত মৃত্যুদণ্ড।

বলতে বলতে শ্বাপদের মত জ্বলে উঠলো ডঃ রায়চৌধুরীর চক্ষু দুটি। তীব্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন—এই হল মানুষের সভ্যতার বিচারদণ্ড। অথচ ওপর তলার কিছু মানুষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ভণ্ডামী আর মিথ্যা আদর্শের যূপকাষ্ঠে প্রতিনিয়ত বলি দেওয়া হয় হাজার হাজার নিরীহ সরল দেশবাসীকে। তার কোন বিচার হয় না। এদের শাস্তি দেবার জন্য কোন বিচারালয়ও বোধ করি এখনও তৈরি হয়নি কিন্তু। সেই অনুপাতে কি এমন অপরাধ করেছিলাম আমি? বিজ্ঞান গবেষণার স্বার্থে কয়েকটি প্রাণ শুধুমাত্র উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। যাদের জীবনের দাম আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল শূন্যে। তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না সেই সব হতভাগ্যদের সামনে।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ডঃ রায়চৌধুরী। মেঘনাদ আসল প্রসঙ্গের খেই

ধরিয়ে দিতে চাইলো—তারপর কি করলেন আপনি?

—কলকাতা ছেড়ে পালালাম। গোপনে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে শুধু মাত্র ল্যাবরেটারীর কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং শুভাশিসের মেয়ে মিতালীকে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম গিয়ে উঠলাম এলাহাবাদে। আমার এক পুরনো সতীর্থ ওখানকার কলেজে অধ্যাপনা করতো। মিতালীকে ওর কাছে রেখে এবার আমি বেরিয়ে পড়লাম সম্পূর্ণ একা।

—নিশ্চয়ই সাধু সন্ন্যাসী হবার কোন পরিকল্পনা সেই মুহূর্তে আপনার মাথায় আসে নি? মেঘনাদের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ চাঁপা রইলো না।

সেটুকু গায়ে মাখলেন না ডঃ রায়চৌধুরী। উনি বলে চললেন —সাময়িক এক হতাশা যে মনকে আচ্ছন্ন করেনি তা বলতে পারি না কিন্তু সেটুকু কাটাতে দেরি হল না। দেশের অনেক জায়গায় ঘুরলাম। দেখলাম কত মানুষ আর প্রকৃতি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি। বাইরের পোশাক, ভাষা আর আচরণে যত ভেদই থাকুকমানুষের অন্তঃপ্রকৃতি কিন্তু সর্বদাই এক। ছয় রিপুর প্রাবল্য কিংবা স্নেহ প্রীতির নিগড়ে বাঁধা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম, পাহাড় কিংবা সমতল সর্বত্রই একই ধারা বয়ে চলেছে। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলাম হিমাচল প্রদেশে। এর উত্তরেই আছে গিরিরাজ হিমালয়। দেবতাত্মা হিমালয় ছেলেবেলা থেকেই আমায় আকর্ষণ করতো। এর শান্ত গম্ভীর রূপ আমার প্রাণে ছুঁইয়ে দিত এক আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরশ। কিন্তু মন চাইলেও কখনও এই ভাবরাজ্যে পদক্ষেপের অবসর মেলেনি। এতদিনে সে সুযোগ মিললো।

হিমালয়ের পাহাড়ী উপত্যকায়, গুহায় কন্দরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দিনের পর দিন। এক অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসলো আমায়। এখানকার আদিম অধিবাসীদের বিচিত্র জীবন, ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করতো। নানা উপজাতি ট্রাইব ছড়িয়ে আছে এই পাহাড়ী অঞ্চলে। এদের আচার আচরণে আদিম সরলতা, বিশ্বাস আর চিন্তা জগতে পুরনো ধ্যান ধারণা। বর্তমান সভ্যতার কলুষ থেকেও এরা মুক্ত, তাই আজকের অহংকার এবং ভণ্ডামী এদের স্পর্শ করতে পারেনি।

এই সময়ই আমি আবিষ্কার করলাম এক অত্যাশ্চর্য জিনিস।

তুষারধবল হিমালয় পর্বতের অনেকটা উঁচুতে উঠেছিলাম হিমালয়ের আশ্চর্যরূপ উপলব্ধির জন্য। কিছুদিন ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মনের হতাশা আর ক্লান্তি তখন অনেকটাই বিদূরিত। ইচ্ছে ছিল ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের তুষার কিরীটী দর্শন করে আবার ফিরে যাবো আমার নিজের জগতে। গবেষণা আমার তখনও অসম্পূর্ণ।

সেই সময়ই ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা, যা আমার জীবনের ধারাকেই দিল বদলে।

— কি ঘটনা ডক্টর।

— হ্যাঁ, সবই বলবো আজ তোমাদের। হিমালয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এক সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম ভারত এমনকি তিব্বত সীমা পার হয়ে। সেখানে হাজার হাজার বছরের বরফের রাজ্য, হঠাৎ একদিন এক ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়লাম। ওই অবস্থায় প্রাণ ফিরে পাব ভাবিনি, কিন্তু তবু যখন প্রাণ পেলাম কোথায় যে ছিটকে গিয়ে পড়েছি বুঝতে পারলাম না। দিক্ নির্দেশ করতে না পেরে চলে গিয়েছিলাম আরও উত্তরে। সভ্য মানুষের পদক্ষেপ সেখানে কোনদিন পড়েনি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ আর বরফ। জমাট, কঠিন বরফের স্তূপ। এরই মধ্যে চোখে পড়লো নিরেট বরফের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট এক সাম্প্রতিক ফাটল। ফাটলের মধ্যে কি একটা রয়েছে দেখা যাচ্ছে না? কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করলাম। অদ্ভুত আকৃতির একটি ডিম।

আমি আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। হিমালয়ের এই বরফ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে কোন জীব বা উদ্ভিদহীন। তাহলে এই ডিম এল কোথা থেকে? ডিমের গঠন কিংবা আকারও আমার চেনা জানা অথবা জ্ঞানের আওতার কোন পাখি কিংবা সরীসৃপের বলে মনে হল না। পাঁশুটে রঙের ডিমটা আকারে একটা বড় হাঁসের ডিমের চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ বড়।

ডিম নিয়ে নেমে এলাম শিনকি উপত্যকায়। এখানে একটি পাহাড়ী গুহায় গড়ে তুললাম অত্যাধুনিক ল্যাবরেটারী। এখানে সেই অজানা প্রাচীন ডিমটি পরীক্ষা করে দেখলাম এর মধ্যে প্রাণবীজটুকু এখনও একেবারে শেষ হয় নি। ল্যাবরেটারীতে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সেই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দিলাম।

ডিম থেকে জন্ম নিল বিচিত্র চেহারার টিকটিকি জাতীয় এক আশ্চর্য সরীসৃপ শিশু।

জীবটি ভাল করে পরীক্ষা করেই চমকে উঠলাম আমি।

এ যে অবিশ্বাস্য।

ডিম ফুটে যে সরীসৃপের জন্ম হয়েছে তার বাস ছিল লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে। দশ কোটি বছর আগের ডাইনোসর গোষ্ঠীর এটিইগুয়ানোডন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

—কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হল ডঃ রায়চৌধুরী? আমি প্রশ্ন না তুলে পারলাম না-দশ কোটি বছর পূর্বের কোন সরীসৃপ প্রাণীর ডিম এত কোটি বছর যাবৎ সজীব থেকে যেতে পারে?

—ব্যাপারটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই কিন্তু এক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। আমার ধারণা হিমালয় অঞ্চলের কোটি কোটি বছর যাবৎ প্রচণ্ড শৈত্য এবং বরফের নীচে ডিমটি

হিমায়িত হয়ে থাকার ফলেই এই ভাবে ডিমের প্রাণ যুগ যুগ ধরে ডিমের ভেতর অব্যক্ত অবস্থায় থাকতে পেরেছে—ঠিক যেমন ভাবে উদ্ভিদের বীজ ঘুমিয়ে থাকতে পারে বছরের পর বছর কোন সংরক্ষিত স্থানে। তারপর অনুকূল পরিবেশে মাটি আর জলের স্পর্শ পেয়ে জেগে ওঠে তার প্রাণ, বেরিয়ে আসে অঙ্কুর। এইভাবে জীবিত দেহকে হিমায়িত করে রাখার পদ্ধতি আজকের বিজ্ঞানের মোটেই অজানা নয়। জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী কিছুদিন আগে একটি বাঁদরকে একাদিক্রমে দশ বছর হিমায়িত করে রাখতে পেরেছিলেন বলে শোনা গেছে। আগামী দিনে এর প্রয়োজন বিজ্ঞানীরা আরও বেশি করে অনুভব করবেন—বিশেষতঃ দূর মহাকাশ যাত্রার দিনগুলিতে।

—তারপর ডঃ রায়চৌধুরী? কথার আবেগে প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। মেঘনাদ তাই আসল কথার খেই ধরিয়ে দিতে চাইলো।

—তারপর? হ্যাঁ, তারপরই শুরু হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়। রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য মনে হলেও তা রোমাঞ্চকর কঠিন বাস্তব।

বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী আবার তাঁর সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তারপর সেই দীর্ঘ ল্যাবরেটারী গুহার অপর প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন আমাদের মুখোমুখি। কিছুক্ষণ জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বললেন—সভ্য পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষদের মধ্যে একমাত্র তোমরাই জানবে সেই রোমাঞ্চকর আশ্চর্য সত্য। যা আজও পর্যন্ত কেউ কল্পনা করতে পারে নি।

প্রতি মুহূর্তের উত্তেজনায় ডঃ রায়চৌধুরীর চোখ দুটো হয়ে উঠছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর।

একুশ

[রহস্যের জট খুললো]

এক অস্বস্তিকর নীরবতা আমাদের চেতনায় অস্থির তরঙ্গ ছড়াচ্ছিল।

এ অস্থিরতার আর এক নাম দুরন্ত কৌতূহল।

—এই সময়েই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এসেছিল।

ডঃ রায়চৌধুরীর এই আচমকা শুরু করাটা আমার কাছে মোটেই সহজবোধ্য হল না। বললাম—কিসের পরিকল্পনার কথা বলছেন আপনি?

আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে ডঃ রায়চৌধুরী বলতে লাগলেন ঃ সর্বপ্রথম আমার কাজ হল শিনকি গিরি উপত্যকার উত্তরে দুর্ভেদ্য পাহাড়ী অঞ্চলে এই দুর্গম পাহাড়ের বিশাল গুহাটার মধ্যে আমার গবেষণাগার তৈরি করা। অত্যাধুনিক এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সাজ-সরঞ্জামে স্বয়ংসম্পূর্ণ হল আমার ল্যাবরেটারী। এই সঙ্গে গুহাপথটিকেও ভেতরে আরও সম্প্রসারিত এবং কাজের উপযোগী করে তুললাম। শিশু ডাইনোসরটা তখন সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। আমার বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে ওর বৃদ্ধি হতে শুরু করলো দ্রুততর। বছর খানেকের মধ্যেই ডাইনোসর তার পূর্ণ অবয়ব লাভ করলো তারপর মিতালীকে নিয়ে এলাম এলাহাবাদ থেকে। ওর তখন বয়স মাত্র পনের। ডাইনোসরটাকে মিতালী পোষ মানিয়ে ফেললো। মেয়েটি ভারী বুদ্ধিমতী আর সাহসী। এদের সাহায্যে আমি আবার শুরু করলাম আমার অসম্পূর্ণ গবেষণা। ডঃ রায়চৌধুরী একটু থামলেন।

দুর্বোধ্যতার কুয়াশা তখন একটু একটু করে আমার মন থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর পরিকল্পনার রূপরেখা এখন আমার কাছে স্পষ্টতর, তবু কাহিনীর সবটাই ডঃ রায়চৌধুরীর মুখ থেকে শুনতে চাই। তাই বললাম—কি ভাবে তা সম্ভব হল?

—শিনকি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসীরা আমায় দীর্ঘ তিরিশ বছর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ যুগিয়েছে।

অজান্তেই শিউরে উঠলাম। ডঃ রায়চৌধুরী অক্লেশে যেভাবে কথাটা বলতে পারলেন তার অর্থ বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা উনি হারিয়েছেন।

মানুষ কি কখনও যথেচ্ছভাবে ল্যাবরেটারীর গিনিপিগ হতে পারে?

নিজের বাহাদুরীর কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর সারা মুখটা তখন উত্তেজনায় চকচক করছে। উনি বলে চললেন—কার্যসিদ্ধির পথ কিন্তু মোটেই সহজ না। এর জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

তোমরা তো জান, হিমালয় পর্বতের পাদদেশে যারা বাস করে সেই পাহাড়ী আদিবাসীদের নানা শাখা আজও পর্যন্ত নানা অদ্ভুত ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস আর কুসংস্কার নিয়ে মেতে আছে। ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব এসবের প্রভাব এদের মধ্যে অনেকেরই ধর্মবিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার মধ্যে বহু যুগ যাবৎ জড়িত।

ওদের এই অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারকে আমি আমার পরিকল্পনার কাজে লাগালাম।

এক দুর্যোগের রাতে প্রকৃতি যখন মাতাল—আমার পোষা ডাইনোসরটার পিঠে চড়ে মিতালী আবির্ভূত হল শিনকি উপত্যকার ওই আদিবাসী ট্রাইবদের গ্রামে।

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের ওই প্রকাণ্ড আকার, গর্জন আর মিতালীর অভিনয়ে ওরা হতবুদ্ধি হল, তারপর ওরা ওদের সরল যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে দেরি করলো না যে ড্রাগন দেবতার বাহনের পিঠে চড়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন এক দেবী। তিনি স্বর্গের দেবতাদের প্রতিনিধি। এই দেবী কল্যাণময়ী। ইনি তুষ্ট থাকলে পাহাড়ী আদিবাসীরা মুক্তি পায় কঠিন রোগ ব্যাধি থেকে, নানা দৈনন্দিন সমস্যা থেকে--অবশ্য এ সবই সম্ভব হত মিতালীর মাধ্যমে আমার অদৃশ্য হস্তক্ষেপে। কিন্তু মিতালী ওদের জয় করে ফেললো। মিতালীকে ওরা মেনে নিল ওদের গ্রামের সম্মানিত ওঝা হিসাবে। মিতালী হল ওদের 'দেবীরানী'।

আমার পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ হল। আমার আসল উদ্দেশ্য পূরণ হতে চললো এইবার।

দেবীরানীর মাধ্যমে আমি প্রচার করলাম ওদের গ্রামের উত্তর দিকে যে দুর্গম পাহাড় শুরু হয়েছে—ওটি ড্রাগন দেবতার বাসভূমি। ওখানে জীবন্ত মানুষ গেলে আর ফেরে না। ওই প্রচাবের কারণ ওই পাহাড়ের গুহায় আমার ল্যাবরেটারীর অবস্থা যাতে অন্যের কাছে ধরা পড়ে না যায়। তাহলেই আমার সমস্ত পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে আরও একটা প্রথা চালু করলাম আমি, গ্রামের কল্যাণের স্বার্থে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে একটি করে আদিবাসী যুবক কিংবা যুবতীকে ওদের উৎসর্গ করতে হবে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে।

এ প্রথা আজও চালু রয়েছে।

প্রতি বছব ওই নির্দিষ্ট রাতটিতে আদিবাসীদের উৎসর্গ করা একটি প্রাণ আমার পোষা ডাইনোসরটি সুকৌশলে তুলে আনে ওই গ্রামের ড্রাগন দেবতার বেদী থেকে

ড্রাগন পাহাড়ের ভেতর আমার এই ল্যাবরেটারী গুহায়।

এইভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরাপদে চালিয়ে যাচ্ছি আমার দুরূহ গবেষণার কাজ। এই গবেষণার সার্থকতাই আমার জীবনের চরম এবং একমাত্র লক্ষ্য।

শুনতে শুনতে মাথাটা আমার ঝিম ঝিম করছিল। কোন সুস্থ মানুষ এমন ভয়ঙ্কর পরিকল্পনায় লিপ্ত হতে পারে আমার কোনকালে ধারণা ছিল না। গবেষণার নামে আজ পর্যন্ত কত যে তাজা প্রাণ বলি দেওয়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই বিজ্ঞানী কি আসলে একজন উন্মাদ?

হঠাৎ চমক ভাঙলো। ডঃ রায়চৌধুরী আমার আর মেঘনাদের অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর দু চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। চোখে চোখ পড়তে চাপা ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বললেন—তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করে আমার সমস্ত গুপ্ত কথা তোমাদের শুনিয়ে দিলাম, এইবার আমার একমাত্র অনুরোধটাও আশা করি রাখবে তোমরা?

এই উন্মাদ বিজ্ঞানী কি অনুরোধ করতে চান আমাদের? কি?

বাইশ

[অনুরোধের অর্থ]

আমি আর মেঘনাদ প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—না, আপনার এ অনুরোধে আমরা কিছুতেই সম্মত হতে পারি না। এ অমানুষিক, এ উন্মত্ততা।

ড: রায়চৌধুরীর চোখ দুটো এখন হায়নার চোখের মতো হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করছে। খসে পড়েছে এতক্ষণের ভদ্রতা আর সৌজন্যের মুখোসটুকু। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কিন্তু রাজী যে তোমাদের হতেই হবে আগন্তুক বন্ধুরা। পৃথিবীর একান্ত নিরালা কোণে তৈরি করেছিলাম আমার নিজস্ব গবেষণার জগৎ—এ যাবৎ কেউ মাথা গলাতে পারে নি...কিন্তু আজ আমার ফেলে আসা পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য স্বার্থপর মূর্খ মানুষ আবার হানা দিয়েছে আমার এই সাধনক্ষেত্রে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না...।

ড: রায়চৌধুরীকে আর মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। হাত দুটো কেবলই মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে। দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন নীচের ঠোঁটটা।

-কিন্তু আমাদের আপনি বৃথাই সন্দেহ করছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ড্রাগন পাহাড়ের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল ও ভেতরে ভেতরে বেশ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

- মূর্খ! বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন—তোমাদের দুঃসাহসের পরিণাম তোমাদেরই বহন করতে হবে। স্বেচ্ছায় জীবন্ত সিংহের গুহায় কেউ প্রবেশ করলে সিংহ কখনও তাকে ছেড়ে দেয় না। তোমাদের সম্পর্কে প্রতিদিনের খবর আমার জানা। নিজেদের খুবই চালাক এবং হিসেবী ভেবেছিলে, তাই না?

মনে মনে আবার শিউরে উঠলাম। সত্যিই কি আমাদের সবটুকু কর্মধারা জেনেছেন উনি? ক্যাপ্টেন সিং, তাঁর অনুসরণের কথাটাও কি জেনেছেন? যদি জেনে থাকেন তবে তো এতক্ষণে তাঁকেও কোথাও গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। ভাবতেই চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠলো।

বিজ্ঞানী ড: রায়চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এক ক্রূর ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে। বললেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞানের এক মহান গবেষণার স্বার্থে তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছ।

—না। আমি চিৎকার করে উঠলাম—এ কাজ আপনি করতে পারেন না ড: রায়চৌধুরী।

—ড্রাগন পাহাড় আমার রাজ্য। এখানে আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আমি আমার জীবন আর গবেষণার কাহিনী শুরু করার আগে আমার শর্তের কথা বলেছিলাম। এটাই আমার শর্ত। তাছাড়া সব কিছু জানার পর আমার অনুরোধে রাজী হওয়া ছাড়া তোমাদের উপায়ই বা কি?

কিন্তু আমরা আপনার শর্ত বা অনুরোধে রাজী হয়েছি একথা তো বলিনি, মেঘনাদ বললো।

—তোমাদের মতামতের দাম আমার কাছে আর কিছুই নেই। তোমাদের আমার পক্ষে আর এ গবেষণাগার থেকে যেতে দেওয়াও সম্ভব নয়।

—কারণ?

—কারণ তোমরা স্বেচ্ছায় এই ভয়ঙ্করের গুহায় পা দিয়েছ। এখানে ঢোকার পথ খোলা, কিন্তু বেরুবার পথ বন্ধ। তা ছাড়া আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে নতুন মানুষ দরকার। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমা রাতটির অপেক্ষায় আমি বেশ কয়েকটি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করি। কিন্তু আমার পোষা ডাইনোসর এবার যাকে আদিবাসী গ্রামের ড্রাগন বেদী থেকে তুলে এনেছে সে শিনকি উপত্যকার কোন পাহাড়ী আদিবাসী তরুণ নয়—কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী দুঃসাহসী যুবক মেঘনাদ ভরদ্বাজ। বলতে বলতে ডঃ রায়চৌধুরী হা হা-করে হেসে উঠলেন—ক্ষতি আমার তাতে কিছু হয় নি, বরং সঙ্গে আছে আর একটি তাজা তরুণ শরীর। আমার গবেষণার নতুন ফরমুলা আমি আজ রাতেই তোমাদের ওপর প্রয়োগ করবো।

আতঙ্কে হিম হয়ে গেলাম।

বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী আগের মতোই কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন—তবে আমার আশা হয়তো এবার আর ব্যর্থ হব না। ইতিমধ্যেই এই দীর্ঘ তিরিশ বছরে মানুষের শরীরের 'জিন'-এর ওপর আমার বিশেষ কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট অনেকটা সফল হয়েছে। মানুষকে এভাবে ছ'মাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। আমি এবার আশা করি সবটুকুই সফল হব। তাহলে এ পৃথিবীতে তোমরাই হবে জরা, ব্যাধিজয়ী সর্বপ্রথম দীর্ঘজীবী মানুষ। মানুষ থেকে অতিমানুষ সৃষ্টির স্বপ্ন হবে আমার সার্থক।

—কিন্তু অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের ধরে এনে বছরের পর বছর এই অনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? গবেষণার নামে এ নির্মম হত্যাকাণ্ড! মেঘনাদ তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো।

—হ্যাঁ, আমি নির্মম। রাগে বীভৎস আকার ধারণ করেছে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মুখমণ্ডল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমাদের সভ্য মানুষের ন্যায় নীতি, মূল্যবোধ নিয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। মানুষের সভ্যতার সত্যিকারের অগ্রগতির পথে রক্ত চাই, আরও রক্ত। এ সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আজ

রাতে না হয় আরও দুটি প্রাণের বলিদান হবে মানুষের আগামী কল্যাণের বেদীমূলে।

প্রচণ্ড ক্রোধ আর উত্তেজনায় নিজের শারীরিক আঘাত আর অবসন্নতার কথা বিস্মৃত হয়ে মেঘনাদ ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর ওপর।

কিন্তু তার আগেই গুলির আওয়াজ। পর পর একসঙ্গে অনেকগুলো। না, গুহার মধ্যে নয়—আওয়াজ আসছে দূর থেকে।

প্রায় ঝড়ের মতো বেগে যে রমণীটি গুহা ল্যাবরেটারীতে এসে ঢুকলো তাকে আমরা চিনি—সে শিনকি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের দেবীরানী।

—জ্যাঠামনি, সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের গুহা আক্রান্ত।

তেইশ

[ডাইনোসরের গর্জন]

অকস্মাৎ বজ্রপাতের পর হঠাৎ যেন এক নৈঃশব্দ নেমে এল। কয়েকটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত। তারপরই বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন—কে আক্রমণকারী? কার এতদূর স্পর্ধা?

—ক্যাপ্টেন সিং তার লোকজন নিয়ে এসে গুহা ঘিরে ফেলে আক্রমণ শুরু করেছে। দেবীরানী ওরফে মিতালী দেবী জানালো।

—ক্যাপটেন সিং! মানে সেনাবাহিনীর সেই ছুঁচোটা? নিজের সমস্ত কাজ ছেড়ে গত কয়েক মাস যাবৎ এই শিনকি উপত্যকায় বাতাসের ঘ্রাণ শুঁকে বেড়াচ্ছিল যে লোকটি? ডঃ রায়চৌধুরী অস্থির ক্রোধে সারা ল্যাবরেটারী গুহাটার মধ্যে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

বাইরে গুলির আওয়াজ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। ডঃ রায়চৌধুরী আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রোধ আর ঘৃণায় মুখটা ওঁর বিকৃত দেখাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন--বিশ্বাসঘাতক, তোমাদের আমি রেহাই দেব না। এখন বুঝতে পারছি এ সবই তোমাদের পূর্বপরিকল্পিত ছিল। এতদূরে পালিয়ে এসেও তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি।

একটা ছোট্ট শিশি থেকে ইনজেকসানের সিরিঞ্জে কি এক তরল ভরে নিলেন ডাক্তার, তারপর মুখে ভয়াল হিংসা ফুটিয়ে বললেন, এক্ষুনি এই সিরিঞ্জের তরল তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেব আমি। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে তোমাদের সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আর কোনদিন কারুর সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না।

ইনজেকসানের সিরিঞ্জটা নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন উন্মাদ বিজ্ঞানী।

আতঙ্কে সারা শরীরটা আমার পাথরের মতো জমে গেছে। কণ্ঠ থেকে এক টুকরো শব্দ পর্যন্ত বেরুচ্ছে না।

মনে মনে ভগবানকে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু দুঃসহ ভয়ে কোন ভগবানের নাম মনে পড়লো না।

আর বাঁচার কোন পথ নেই। মাথার মধ্যে লক্ষ ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ডঃ রায়চৌধুরী আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরে সিরিঞ্জ তুলে ধরছেন...আমি চোখ বন্ধ করলাম...

সেই মুহূর্তে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাইরে থেকে এক বিকট গর্জন শোনা গেল। এ গর্জন আমার চেনা! সেই বিশাল ডাইনোসরটার ডাক। ডাকটা যেন এখন আরও ভয়ঙ্কর।

ঝড়ের বেগে কে যেন ঘরে প্রবেশ করলো। কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি ল্যাবরেটারী গুহার একজন প্রহরী। শরীর দিয়ে তার রক্ত ঝরছে।

উত্তেজিত দুর্বোধ্য কণ্ঠে কি যেন সে বলে চললো। শুনতে শুনতে আর্তনাদ করে উঠলো দেবীরানী, তারপর প্রহরীর পিছু ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বুঝলাম আরও একটা কিছু সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটেছে। তাকিয়ে দেখি বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী পাষাণের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওর চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না।

মেঘনাদ ইঙ্গিত করলো—অর্ণব এই সুযোগ।

আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম গুহাঘর থেকে।

সামনে টানা গুহাপথ। ফাঁকা। কেউ এল না আমাদের বাধা দিতে। আমরা এগিয়ে চললাম। বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ। সেই সঙ্গে ডাসনোসরের গর্জনটা আরও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে।

আমরা গুহা-পথের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

চব্বিশ

[অমানুষিক যুদ্ধের পরিণাম]

এই পাহাড়ের অংশটির ঠিক নীচে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

সেখানে এক লড়াই চলেছে। কিন্তু এ ধরনের লড়াই আজ পর্যন্ত কোন মানুষ কোনদিন দেখে নি। আশ্চর্য, অমানুষিক যুদ্ধ।

ক্যাপ্টেন সিং তাঁর সশস্ত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে ঘিরে ফেলেছেন গুহার সামনেটা। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর প্রহরীর দল গুহার এদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে তাদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা মাত্র কয়েকজন।

কিন্তু এই সঙ্গে তেড়ে গেছে সেই বিশাল আকৃতির ডাইনোসরটা।

মাটির ওপর ল্যাজ আছড়ানোর প্রচণ্ড শব্দ সেই সঙ্গে বিকট গর্জনে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরটা যেন প্রতি মুহূর্তে ভূমিকম্প ও বজ্রপাত ঘটিয়ে চলেছে।

প্রবল বিক্রমে সে একাই বাধা দিয়ে চলেছে ক্যাপটেন সিং-এর দলবলকে। ক্যাপটেন সিং-এর গুহা প্রবেশের ইচ্ছাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে চলেছে।

কিন্তু সে জানোয়ার! হোক না বিশাল অসুর শক্তির অধিকারী —তবু মানুষ তার চেয়ে অনেক কৌশলী, হিংস্র।

প্রতি মুহূর্তে সে আরও বেশি আহত হয়ে চলেছে। ক্যাপটেন সিং-এর দল বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে তার পর্বতপ্রমাণ শরীরটা।

তার গর্জন এখন ক্রমেই আর্তনাদের রূপ নিচ্ছে, কিন্তু তবু সে পিছু হটতে রাজী নয়।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই আশ্চর্য লড়াই। দশ কোটি বছর আগের এক প্রাগৈতিহাসিক জীব তার জীবনদাতার জীবনের রক্ষাকবচ হয়ে তার অন্নের ঋণ শোধ করে চলেছে। যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ একজন আক্রমণকারিকে ও ল্যাবরেটোরী গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে না।

হু হু করে রক্ত ঝরছে ডাইনোসরের শরীর দিয়ে। দুর্বলতায় টলে টলে পড়ছে।

তবু পালাতে সে জানে না। দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীতে এই কি ছিল

লড়াই-এর রীতি? আমৃত্যু সংগ্রাম।

ক্যাপটেন সিং-এর দলের একজন বোধহয় একটু বেশি সাহসী হয়ে দল ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসেছিল। ডাইনোসরটা মুহূর্তে তাকে মুখে তুলে নিল। তারপর তার প্রাণহীন ছিবড়ানো দেহটা আছড়ে পড়লো পাহাড়ের গায়ে।

ড্রাগন পাহাড়ের ড্রাগন দেবতার বাহন এবার প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ক্যাপটেন সিং-এব দলকে। দেখতে দেখতে আবও একটা দেহ মুখে করে তুলে নিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিল পাহাড়ের গায়ে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তারপর বিকট গর্জনে মুখ থুবড়ে পড়লো পাহাড়ী ড্রাগন—ডঃ রায়চৌধুরীর পোষা ডাইনোসর।

আর উপায় না দেখে ক্যাপটেন সিং হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। ডাইনোসরটার প্রায় শরীরের ওপর এসে ফেটেছে সেই মারাত্মক বিস্ফোবক। প্রকাণ্ড শরীবটা আছড়ে পড়েছে পাথুরে জমিতে।

—ডায়না! ডায়না!

বিদ্যুৎ বেগে গুহার আড়াল থেকে ছুটে এল এক রমণী। পরনে পাহাড়ী আদিবাসীদের মত জংলী পোশাক, হাতে রাইফেল। এতক্ষণ সে গুহার আড়াল থেকে ক্যাপটেন সিং-এর দলের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছিল। সে দেবীরানী—ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর পালিতা কন্যা মিতালী।

দেবীরানী ছুটে গেল ডাইনোসরটার কাছে। ওই বিশাল প্রাগৈতিহাসিক দেহটা একটা পাহাড়েব মত পড়ে আছে ল্যাবরেটারী গুহার সামনের পাথুরে প্রান্তরটায়।

ওব শবীরেব ওপব প্রায ঝাঁপিয়ে পড়লো দেবীরানী।

ওর লম্বাটে মাথার দিকটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে দেবীরানী বললো—ডায়না, ডায়না, দেখ আমি এসেছি। ওরা কাপুরুষের মত রাইফেল আর গ্রেনেড দিয়ে তোকে হত্যা করলো। ওরা বর্বর, ওরা খুনী। ডায়না, ডায়না, আমার দিকে তাকা—জীবনে তো তুই কখনও আমাকে অমান্য করিস নি--তবে কেন চোখ খুলছিস না...?

মানুষের ভাষা দশ কোটি বছর আগের ওই জানোয়ার বুঝলো কিনা জানি না-কিন্তু দেবীরানীর কান্নায় মুমূর্ষু ডাইনোসরটা অতি কষ্টে একবার চোখ খুলে তাকালো, কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলো দেবীরানীর দিকে, তারপর শেষবারের মত একবার ডেকে উঠলো- কিন্তু এ তো গর্জন নয়, যেন বুক ভাঙা কান্নার সুর, একান্ত প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে যাবার হাহাকার...এরপরই ওর মাথাটা ঢলে পড়লো দেবীরানীর

কোলের ওপর।

দেবীরানী শিশুর মত কেঁদে উঠলো ওই প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মাথা কোলে নিয়ে।

ততক্ষণে ক্যাপটেন সিং দেবীরানীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে তাঁর উদ্যত নিষ্ঠুর রিভলবার।

—ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

পঁচিশ

[সদলবলে]

ক্যাপটেন সিং সদলবলে ল্যাবরেটারী গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আমি আর মেঘনাদ।

ওপক্ষের লোকজন যে কজন ছিল একটু আগে লড়াই-এ তারা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আহত—তাই ধরা পড়তে দেরি হল না।

ল্যাবরেটারী গুহার একেবারে প্রান্তে, গুহাটা যেখানে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে শেষ হয়ে এসেছে সেখানে লোহার গরাদ দেওয়া বন্দীশালা। তার মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় পাহাড়ী আদিবাসী। কেউ অর্ধমৃত, কেউ বা মৃতপ্রায়। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর বিজ্ঞান গবেষণার মানুষ-গিনিপিগ এরা।

তাদেরও গুহার বাইরে নিয়ে আসা হল।

কিন্তু সকল রহস্যের যে মূল নায়ক—সেই বিজ্ঞানী ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী কোথায়?

সমস্ত ল্যাবরেটারী গুহা এবং আশপাশের অঞ্চলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে পাওয়া গেল না।

সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্তর্ধান করেছেন।

ছাব্বিশ

[অভিযানের শেষ]

জীপ ছুটে চলেছিল কাটার রোডের পথ ধরে। শিমকি গিরি উপত্যকা এখন অনেক পেছনে।

জীপের মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী।

স্টিয়ারিং হুইল ক্যাপটেন সিং-এর হাতে।

ক্যাপটেন সিং গল গল করে অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রাণে আনন্দের তুফান উঠেছে। শিনকি উপত্যকার বিভীষিকার অবসান ঘটাতে পেরেছেন তিনি। মেঘনাদ কিংবা আমাকে ঠিক সময়ে ডেকে এনে কাজে লাগাতে পারার কৃতিত্ব তাঁর কম নয়, সুতরাং একটা ভালরকম সরকারী পুরস্কারের ভাগ্য থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

--তবু একটা বিরাট দুঃখ থেকে গেল মেঘনাদ ভাইয়া, —ক্যাপটেন সিং বললেন, দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীর অতিকায় ডাইনোসরটা যদি জ্যান্ত ধরতে পারতাম, আজকের পৃথিবীতে এক জীবন্ত বিস্ময় হয়ে থেকে যেতে পারতো। কি রকম হৈ চৈটা হত ভেবে দেখুন।

ডাইনোসরটার কথা তখন আমিও ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তার মৃত্যু দৃশ্যটার কথা। বিশেষতঃ দেবীরানীর কোলে মাথা রেখে তার ওই অন্তিম চাউনি--তা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না আমি। সে দৃষ্টির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি প্রিয়জনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার বেদনা। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব? দশ কোটি বছর পূর্বের জানোয়ার—তারাও কি ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতির কথা জানতো। তবে কি জীবের হৃদয়বৃত্তির জন্ম প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই? একসঙ্গে অনেক কথা ভিড় করছে আমার মনে।

ডাইনোসরটার মৃতদেহ পাঠানো হবে নৃতত্ত্বের গবেষণাগারে। কেটে, ছিঁড়ে দেখা হবে ওর শরীর রহস্য। প্রাচীন মেসোজায়িক যুগের আরও অনেক অনুদ্ঘাটিত রহস্যই হয়তো জানা যাবে দেবীরানীর প্রিয় 'ডায়না'র অস্থি মজ্জা বিশ্লেষণ করে।

—সমস্ত ব্যাপারটাই পাগলামীর চূড়ান্ত। ক্যাপটেন সিং নিজের মনেই হা হা করে

হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে আবার বললেনঃ বিশেষতঃ আদি আদিবাসীদের মধ্যে ওঝা সেজে থাকা ওই রমণী 'দেবীরানী না কি নাম যেন ওর কথাটাই ভাবুন' কথাবার্তা শুনে তো পেটে বেশ বিদ্যে আছে বলেই মনে হল। অথচ জীবনের সবকিছু ছেড়ে এই দুর্গম জংলী উপত্যকায় খামাখা যত ভূতুড়ে কাণ্ড কারখানা ফেঁদে বসেছিল—একেই বলে মশাই সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

--আপনি ভুল করছেন ক্যাপ্টেন সিং--

মেঘনাদ এতক্ষণ বাদে মুখ খুললো, --আপনাকে তো সব ব্যাপারটা আগেই বলেছি, তবু বুঝছেন না কেন 'দেবীরানী' যার আসল নাম মিতালী দত্ত, এ জীবনটাই ছিল তার একটা 'মিশন'- সমস্ত জীবনটা সে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিল তার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরীর গবেষণাকে সফল করার সাধনায়।

--স্ট্রেঞ্জ! ক্যাপটেন সিং প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর গবেষণার নামে এই সব অসামাজিক দানবীয় কাণ্ডকারখানা আপনি সমর্থন করেন মেঘনাদ ভাইয়া?

--কে জানে আপনার এ কথার সঠিক উত্তর আমি হয়তো এক্ষুনি দিতে পারবো না ক্যাপটেন সিং, তবে এটুকু আমি বিশ্বাস করি ডঃ রায়চৌধুরীর সাধনা যদি সত্যিই সফল হত মনুষ্য জাতির ইতিহাস যেত বদলে এবং এর পুরো কৃতিত্বটুকু বহন করেই তিনি আগামী কালের মানুষের কাছে হয়ে উঠতেন দেবতা—তাঁর সমস্ত অতীত অসামাজিক দানবীয় কাণ্ডকারখানা এ গবেষণার মূলে থাকা সত্ত্বেও। এটাই ইতিহাসের সত্য।

--কি বলছেন আপনি মেঘনাদ ভাইয়া! মেঘনাদের দিকে কয়েক সেকেণ্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ক্যাপটেন সিং কোনক্রমে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

--এ আমার উপলব্ধি ক্যাপটেন। আপনি যথাসময়ে এসে আমাদের উদ্ধার না করলে বৃদ্ধ উন্মাদ বিজ্ঞানী হয়তো আমাদের তাঁর গবেষণার গিনিপিগ বানিয়ে হত্যা করতেন। কিন্তু তবু যা উপলব্ধ সত্য তা অস্বীকার করি কি করে?

অবাক হয়ে শুনছিলাম মেঘনাদের কথাগুলো। মন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

ল্যবরেটারী গুহার আশপাশে অনেক খুঁজেও ডঃ রায়চৌধুরীর কোন সন্ধান পাইনি। মানুষটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

আমার মন বলছিল বিজ্ঞানী ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী একদিন আবার ফিরে আসবেন, কিংবা অন্য কোথাও শুরু করবেন তাঁর অসম্পূর্ণ গবেষণা—এবার হয়তো এক সুস্থ কল্যাণময় পথে।

আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই।

ক্যাপটেন সিং-এর দৃষ্টি সামনের পাহাড় ভাঙা চড়াই উৎরাই রাস্তায়। আমি আর মেঘনাদ তাকিয়েছিলাম দূরে--পাইন, আখরোট জঙ্গলে ঘেরা সেই শিনকি উপত্যকার দুর্গম পথে, যার একটু দূরেই শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়। কিন্তু আর কোনো বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে সেখান থেকে নেমে আসবে না ড্রাগন দেবতার বাহন--আদিবাসীদের কাছ থেকে জীবন্ত মানুষ অর্ঘ্য নিতে।

আদিবাসীদের ওঝা দেবীরানী আজ সভ্য মানুষের কারাগারে।

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য আজ উদ্ঘাটিত।

জীপ ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে।

সিমলা আসতে আর দেরি নেই।

।। শেষ ।।

‘‘পরম কল্যাণীয়
সঙ্গীতা, সৈকত, সায়নী
ও সৃজিতা—
তোমাদের সবাইকে’’

আমাদের প্রকাশিত

'মেঘনাদ সিরিজ'এর অন্য বই ঃ

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

নিবেদন

রহস্য-গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার গল্প পড়তে কে না ভালবাসে? ইদানীংকালে বাংলা কিশোর সাহিত্যে এই জাতীয় লেখায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রহস্যভেদী মেঘনাদ' তাঁরই একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বেশ কয়েকবছর যাবৎ মেঘনাদ-অর্ণব জুটি তাদের নিত্য নতুন বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চারগুলির সাহায্যে বাংলার কিশোর তরুণ পাঠকদের আকৃষ্ট করে রেখেছে। রহস্যভেদী মেঘনাদের বহু কাহিনীর নাট্যরূপও বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে সাড়া জাগিয়েছে।

আমাদের প্রকাশনী থেকে এই সিরিজের প্রথম বই 'ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য' ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ে এরই মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। এই সিরিজের দ্বিতীয় বই 'স্পাইরা পাশেই আছে'। এই বই-এর দুই মলাটের মধ্যে সাজিয়ে দু-দুটি দুর্দান্ত গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

কিছুদিন আগে আনন্দমেলা এবং কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত এবং বর্তমান সময়েব পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই রহস্যঘন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীও আশাকরি আগের মতোই পাঠকের মন জয় করতে পারবে।

এই বইতে

স্পাইরা পাশেই আছে/...
ভীম ভেটকার ঘটৎকচ/...

।। এক ।।
('সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে')

সি বিচ ধরে হাঁটছিলাম। আমি আর মেঘনাদ। জায়গাটা মোটামুটি নির্জন। এই পড়ন্ত বেলায় সমুদ্রের ধারে জনাকয়েক নুলিয়া আর আমাদের মতো দু-চারজন ভ্রমণপিয়াসী ছাড়া লোকজনের ভীড় নেই।

পুরীব জমজমাট স্বর্গদ্বার থেকে বেশ কিছুটা দূরে জায়গাটা। স্বর্গদ্বারের হরেক মজা ছেড়ে অল্প লোকই এদিকটায় আসে।

কিন্তু আমরা এসেছি শহরের দমবন্ধ হাওয়া থেকে দূরে কদিন ছুটি কাটাতে। তাই বিকেল হতেই সি বিচ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি এখানে।

মেঘনাদেব তো বরাবরই 'উঠলো বাই তো কটক যাই'। এটা অবশ্য কটক না হযে পুরী। গত পরশু সকালে মেঘনাদ হঠাৎ ফোন করে বললো,—অর্ণব, পুরী যাবি?

—হঠাৎ পুবী। জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—কারণ বলতে গেলে কলকাতায অবিরাম কাজের চাপে আর এয়ার পলিউসনেব ধকলে হাঁপিয়ে উঠেছি। যাকে বলে দমবন্ধ হবার অবস্থা। এ সময়ে হঠাৎ মনে পড়লো পুরীতে আমাদের পরিচিত হোটেলের ম্যানেজার নীলমণি মাহাতোর কথা। ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, ঘর রেডি, চলে আসুন।

—তাহলে তো আর কথাই নেই। তবে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরের কৌতুকটা চেপে বাখতে পারলাম না।

—কি?

—তুই আমার নামে ট্রেনের টিকিটের রিজার্ভেসন বুক করে তারপর আমায় ফোনটা করছিস?

মেঘনাদ এবার আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বললো,—এই জন্যে বলে সাপেব হাঁচি বেদেয় চেনে। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ বন্ধু। হাওড়া থেকে আগামীকাল জগন্নাথ এক্সপ্রেস ছাড়ছে রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ।

সেই মতো আজই সকালে পুরী এসে পৌঁছেছি।

উঠেছি আমাদের পুরনো চেনা হোটেলে ম্যানেজার নীলমণি মাহাতোর তত্ত্বাবধানে।

তবে পুরী সত্যিই বাঙালীর স্বর্গপুরী। এখানে পা দিলেই কেমন যেন শরীর মন ভাল হয়ে যায়। একদিকে মন্দির অন্যদিকে সমুদ্র। একদিকে পরমার্থ—আর একদিকে স্বাস্থ্য। এর বেশি বাঙালীর আর কি চাই?

দুপুরে দম ভরে আমি আর মেঘনাদ সমুদ্রস্নান করেছি। তারপর বিকেল হতেই বেরিয়েছি সি বিচে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সেবনে।

—আঙ্কেল। আপনারা কি নিউ কামার? একটা কচি গলা শুনে ফিরে তাকালাম।

তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলে আমাদের পাশেই বালির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, দু' পা ফাঁক করে, দু'হাত কোমরে রেখে। প্রথম দর্শনেই ওর পোশাক আর ভাবভঙ্গি দেখে বেশ মজা লাগল। পরনে জ্যাকেট, জিন্‌সের প্যান্ট। চোখে গগল্‌স। গলায় ঝুলছে একটা বাইনোকুলার। আর কোমরে চামড়ার খাপে ওটা কি খেলনা রিভলবার?

মেঘনাদ দেখলাম ওর দিকে হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে।

—হ্যালো ইয়ংম্যান, কী নাম তোমার? দু'পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—পুরো নাম ডাম্বেল দত্ত। তবে আমায় ডি.ডি নামেই ডাকতে পারেন। আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।

ডাম্বেলের কথার ভঙ্গিতে এবার শুধু আমি নই, মেঘনাদও হেসে উঠল।

আমাদের হাসি বোধ হয় ডাম্বেলের পছন্দ হল না। গম্ভীরভাবে বলল—আপনারা সাধারণ পাবলিক সবকিছু উড়িয়ে দেন। কিন্তু একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে হালকাভাবে নিলে চলে না। শার্লক হোম্‌স থেকে ব্যোমকেশ, ফেলুদা কিংবা আমার ফেভারিট রহস্যভেদী মেঘনাদ সবাই এই কথা বলেছেন।

—কী বলেছেন? মেঘনাদ আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চোখ টিপল।

—গোয়েন্দাগিরির প্রথম পাঠ হল একজন গোয়েন্দার বুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণ হবে ধারালো।

—তাই বুঝি তোমার হাতের ওই বাইনোকুলারটা দিয়ে আশপাশের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছ? মেঘনাদ ডাম্বেলের কাছে আর এক-পা এগিয়ে গেল।

—রাইট। ডাম্বেল চোখের গগল্‌স নামিয়ে বাইনোকুলারটা চোখের সামনে তুলে ধরল। তারপর আশপাশে তাকাতে লাগল।

সত্যিই ভারী মজা লাগছিল ছেলেটিকে দেখে। ও এখন আছে নিজস্ব কল্পনার রাজ্যে। জিজ্ঞেস করলাম,—মাস্টার ডি. ডি তুমি এখানে এসেছ কার সঙ্গে?

—বাবা, মা, রিমাদিদি। ডাম্বেল একই ভাবে বাইনোকুলারে চোখ রেখে বলল।

—কবে এসেছ? উঠেছ কোথায়?

—এসেছি দিন-দুই হল। আর উঠেছি কোথায়? ওই যে! পশ্চিমে কিছুদূরে

একটা পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখিয়ে বলল,—ওই পোড়ো বাড়িটা দেখছেন, ওর পেছনে বাবাব অফিসের হলিডে হোম।

—আচ্ছা গোয়েন্দামশাই, সমুদ্রের ওইদিকে একটা ট্রলার দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? হঠাৎ মেঘনাদের কথায় আমরা দু'জনেই সেদিকে ফিরলাম, —বলতে পারো ট্রলারের ডেকে ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে?

ডাম্বেল মহা উৎসাহে বাইনোকুলারে চোখ রেখে সেদিকে তাকাল, তারপর বলল,—একজনকেই তো দেখছি। লম্বা, মাথায় টাক। কপালের ওপর শিঙের মতো উঁচু হয়ে আছে।

—মাস্টাব ডি.ডি, তোমার বাইনোকুলারটা একবার দেখি, বলে মেঘনাদ সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে চোখের সামনে রেখে দূরে সমুদ্রে দাঁড়ানো সেই ট্রলারটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ওটা যখন ডাম্বেলের হাতে ফেরত দিল, দেখলাম মেঘনাদের ভ্রু দুটো কুঁচকে আছে। মেঘনাদের এ লক্ষণ আমি চিনি। কিন্তু ওই মাছধরা জাহাজে এমন কী দেখল মেঘনাদ?

—ট্রলারটা ওই একই জায়গায় গতকাল থেকে দাঁড়িযে আছে। ব্যাপারটা আমাব কাছেও সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। বলতে-বলতে ডাম্বেল বাইনোকুলারটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বলল,—আঙ্কেল, আপনিও কিন্তু সন্দেহের বাইরে নন। আপনারই বা এত কিছু থাকতে হঠাৎ সমুদ্রের ওই ট্রলারটার দিকে নজর পড়ল কেন? আপনি যদি পুলিশ হতেন, তবে প্রশ্নটা আমার মনে আসত না।

মেঘনাদ হাসি চেপে বলল,—তা হলে শুনি, আমি লোকটা কেমন হতে পারি তোমার ধাবণা?

প্রশ্ন শুনে ডাম্বেলের চোখ দুটো কুঁচকে গেল। দুটো হাত পকেটে ঢুকিয়ে কয়েক সেকেন্ড মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বইল, তারপর বলল,—এ পরিস্থিতিতে শার্লক হোম্‌স, ফেলুদা কিংবা রহস্যভেদী মেঘনাদ যা বলত, আমি সেইটুকুই বলতে পারি।

—বেশ! তাই বলো।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে আরও একটু ভাবল ডাম্বেল, তারপব বলল,—আঙ্কেল, আপনাকে কিন্তু খুব সাধারণ পাবলিক মনে হচ্ছে না। চেহারার গঠন আর স্মার্টনেস দেখে মনে হয় আপনি একজন প্লেয়ার কিংবা পুলিশ অফিসার হতে পারেন।

—গোয়েন্দা হতে পাবে না? ওর কথার মধ্যে প্রশ্নটা আমি করলাম।

—গোয়েন্দা! কথাটা বোধ হয় প্রথমে ভাবেনি ডাম্বেল। আমার কথায় মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করে বলল—হুঁ, আঙ্কেলের চোখের দৃষ্টি খুব ধারালো, সে-ক্ষেত্রে...

ডাম্বেলের কথা শেষ হল না। একটু দূরে ডাক শোনা গেল, ডাম্বেল... ডাম্বেল...

তাকিয়ে দেখি সি বিচের বালি ভেঙে এগিয়ে আসছেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে সম্ভবত তাঁর স্ত্রী এবং একটি কিশোরী মেয়ে।

ডাম্বেল সেদিকে তাকিয়ে বলল,—আমার বাপি, মা আর রিমাদিদি। অনেকক্ষণ আমায় না দেখে খুঁজতে বেরিয়েছে। আচ্ছা আপনিই বলুন আঙ্কেল, একজন গোয়েন্দার কি সবসময় এভাবে নজরবন্দি হয়ে থাকতে ভাল লাগে?

ইতিমধ্যে ওঁরা অনেক কাছে এসে পড়েছেন। ভদ্রলোকের বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। বেশ হাসিখুশি চেহারা। ভদ্রমহিলা এবং কন্যাটিও বেশ সুন্দরী। রিমা মনে হয় ডাম্বেলের চেয়ে বছর তিন-চার বড়। ওকেও ভাইয়ের মতোই ছটফটে মনে হচ্ছে।

—ডাম্বেল! তুমি এখানে? কখন থেকে তোমায় খুঁজছি। ভদ্রলোক ডাম্বেলের দিকে তাকিয়ে বললেন। তারপর মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,— আপনাদের খুব বিরক্ত করছিল তো? আর বলেন কেন, দিনরাত রাজ্যের ডিটেকটিভ গল্প পড়তে-পড়তে ও নিজেকেও আজকাল ডিটেকটিভ ভাবতে শুরু করেছে।

—শুধু ডিটেকটিভ? শার্লক হোম্‌স, ফেলুদা, অন্তত পক্ষে মেঘনাদ, রিমাও হাসতে-হাসতে বলল।

ডাম্বেল কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ডাম্বেলের বাবা হঠাৎ মেঘনাদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন,—কিছু মনে করবেন না, আপনি কি মিঃ ভরদ্বাজ?

মেঘনাদ হাত তুলে নমস্কার করে বলল,—ঠিকই চিনতে পেরেছেন। এই অধমের নাম মেঘনাদ ভরদ্বাজ। পেশায় নিজেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ না বলে নিজেকে বলি রহস্যভেদী।

—রহস্যভেদী মেঘনাদ? আপনি! রিমা চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে বলল।

ডাম্বেলের দিকে তাকালাম। ও কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এত বড় চমক বোধ হয় ওর এই ছোট্ট গোয়েন্দা-জীবনে কখনও আসেনি।

মেঘনাদ ডাম্বেলের বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি তো মিঃ সুব্রত দত্ত? তাজা খবর পত্রিকার মালিক হরিসাধনবাবুর খুড়তুতো ভাই। মনে হচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগে একবার আপনার সঙ্গে একটা উপলক্ষে দেখা হয়েছিল।

মেঘনাদ এক সময়ে কিছুদিনের জন্য তাজা খবর পত্রিকার সাংবাদিক ছিল। সে-সময়েই নিশ্চয়ই সুব্রতবাবুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়।

এর পর সুব্রতবাবু ওঁর স্ত্রী তপতী দত্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমরা সবাই ফেরার পথ ধরলাম।

।।দুই।।
(মেঘনাদের ভবিষ্যতবাণী)

সেদিন সুব্রতবাবুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার পর থেকে মেঘনাদ কথাটা বারবার বলছিল,—সমুদ্রে অপেক্ষমাণ ট্রলারের ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লোকটি, যার মাথার সামনের দিকে শিঙের মতো 'আব', ওকে কোথায় যেন

দেখেছি অর্ণব, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

হোটেলে ফিরে মেঘনাদ সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলো। বুঝলাম কোন কারণে ওর মাথার পোকা নড়েছে। কিন্তু পুরীর সমুদ্রে একটা ট্রলার আর তার মধ্যে একজন লোককে দেখে ওর এই ভাবান্তরের কি কারণ বুঝলাম না।

এমনকি ওর এই ভাবান্তরটুকু ম্যানেজার নীলমণি মাহাতোরও দৃষ্টি এড়াল না। ভদ্রলোক আমাদের বহু বছরের বন্ধু। মেঘনাদকে ভাল মতোই চেনেন। অতএব জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, —কি মশাই, দিব্যি ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেলেন আর ফিরলেন মুখে একরাশ চিন্তা নিয়ে। কিছু গোলমাল দেখলেন নাকি?

—তেমন কিছু নয়, মেঘনাদ একটু আনমনা ভাবেই বললো, আচ্ছা নীলমণিবাবু, আপনি কি সর্বক্ষণ হোটেলেই থাকেন নাকি মাঝে মধ্যে সমুদ্রের ধারেও যান?

—রক্ষে করুন মশাই, তিরিশ বছর এখানে হোটেল চালিয়ে রোজ রোজ সমুদ্রের ধারে যাওয়ার সাধ আমার নেই, তবে মাঝেমধ্যে যে যেতে হয় না তা বলি কি করে?

—গত দু'একদিনের মধ্যে কি গিয়েছিলেন?

—না মশাই। শেষবার গিয়েছিলাম, হপ্তা খানেক আগে। হোটেলের এক বৃদ্ধ বোর্ডারের সমুদ্রস্নানের ষোল আনা ইচ্ছে, অথচ ঢেউকে বড় ভয়—শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভরসা দিতেই, বুঝলেন কিনা—হেঁ... হেঁ... হেঁ।

মেঘনাদ নীলমণিবাবুর রসিকতায় গুরুত্ব না দিয়ে বললো,—সে সময়ে সমুদ্রের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন?

—তার মানে? মনে হলো নীলমণিবাবু মেঘনাদের কথার অর্থটা ভালভাবে বুঝলেন না, বললেন,—আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না মেঘনাদবাবু।

—মানে আমি বলতে চাইছি সমুদ্রের ঠিক উত্তর দিকটা ঘেঁসে একটা ট্রলার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন?

—ট্রলার। আরও অবাক হলেন নীলমণি মাহাতো।

—তা মশাই এখানে তো মাঝে মাঝেই মাছ ধরা ট্রলার এসে দাঁড়ায়, যেখানে প্রতিদিন প্রচুর জেলে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে যায়· মাছ ধরতে...

—মানে আমি এমন একটা লোক সম্পর্কে জানতে চাইছি যার গড়ন লম্বা, মাথায় টাক আর কপালের সামনের দিকে একটা বড় আর শিং-এর মতো উঁচু হয়ে আছে। লোকটা এখন যে ট্রলারটা দাঁড়িয়ে আছে তার আরোহী।

—লোকটা কি ভয়ঙ্কর কিছু? অবার নীলমণি মাহাতোর কণ্ঠেও একটা আশঙ্কার ভাব ফোটে।

মেঘনাদ ভ্রু কুঁচকে বলে,—ঠিক মনে পড়ছে না। তবে লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি এবং লোকটা যে মোটেই কোন মহাপুরুষ নয়, সেটাও আমার মন বলছে। এর বেশী কোন তথ্য আমার ব্রেন এই মুহূর্তে আমায় যোগাতে পারছে না।

ব্রেন সে তথ্য জোগাল রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোতে যাওয়ার সময়।

বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েই মেঘনাদ হঠাৎ উঠে বললো,—অর্ণব, এতক্ষণে মনে পড়েছে।

—কী?

—ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকটির পরিচয়।

—কে ও?

—ওর নাম শশী শ্রীবাস্তব।

নামটা কোথায় যেন শুনেছি। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম।

—বছর দুই আগে লোকটিকে নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। জামশেদপুরে একটা বোমা বিস্ফোরণ কেসের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে পুলিশ লোকটিকে খুঁজছে। ওকে ধরতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করে কাগজে ছবিও ছাপা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবত তারপর থেকে লোকটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মেঘনাদের কথা শুনে আমারও মনে পড়ে। ঠিকই বলেছে মেঘনাদ। শশী শ্রীবাস্তব নামটা সে-সময়ই শুনেছিলাম। লোকটিব সঙ্গে এক কুখ্যাত দেশবিরোধী চক্রের যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু ওকে বোধ হয় এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে-লোকটা পুরীর সমুদ্রতীরে ওই ট্রলাবে দাঁড়িয়ে কী করছিল?

মেঘনাদ বলল,—অর্ণব, এখানে নিরুপদ্রবে ছুটি কাটানো বোধ হয় আর হল না রে!

মেঘনাদের ভবিষ্যদ্বাণী যে এভাবে ফলে যাবে, তখন ভাবতে পারিনি।

।। তিন ।।
(রহস্যময় পোড়োবাড়ি)

পরদিন সকাল।

আমরা সবেমাত্র চা-চক্র শেষ করেছি—হৈ হৈ করতে করতে সপরিবারে এসে হাজির হলেন সুব্রত দত্ত।

সুব্রতবাবু হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললেন—মিঃ ভরদ্বাজ, দিলাম তো আপনার মর্নিং ওয়াক-এর বারোটা বাজিয়ে? আসলে আমার স্ত্রী গতকাল রাত থেকেই বলছিলেন—আপনার সঙ্গে দেখা হলো অথচ ভাল করে আলাপ পরিচয়ই হলো না। আমার ছেলেব মতো উনিও আপনাব একজন ফ্যান।

সুব্রতবাবুর স্ত্রী তপতী দেবী মিষ্টি হেসে বললেন,—আপনার রহস্যভেদের অনেক কাহিনী এক সময়ে তাজা খববে পড়েছি মেঘনাদবাবু। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে একদিন আলাপ করবো।

সত্যি মেঘনাদের ভাগ্য দেখে হিংসে হয়। আমি অর্ণব সেন চিবকাল মেঘনাদের

সাকরেদি করে গেলাম অথচ এমন সুখ্যাতি আমার কখনও জোটে না।

হোটেলে বসে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে আমরা একসঙ্গেই বেরুলাম প্রাতঃ-ভ্রমণে।

সমুদ্রের ধারে এসে আমাদের সবচেয়ে আগে নজর পড়লো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রলারটার দিকে। যেন একটা ঘুমন্ত জলচর জীবের মতো ওটা একই রকম ভাবে সমুদ্রের ওপর ভেসে রয়েছে।

সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে ডাম্বেল হঠাৎ বললো,—গোয়েন্দা আঙ্কেল, গতকাল রাতে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি।

—কোথায়? মেঘনাদ মুখ না ফিরিয়ে প্রশ্ন করলো।

—আমাদের হলিডে হোমের পেছনে যে ভাঙা বাড়িটা আছে সেখানে।

—কি দেখেছ?

—কাল অনেক রাতে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। আমাদের বিছানার পাশের জানলাটা দিয়ে ওই ভাঙা বাড়িটা দেখা যায়। দেখলাম ওই বাড়ির দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

—সেটা তো হতেই পারে, মেঘনাদ বললো, হয়তো ওই ঘরে কোন মানুষ বাস করে।

—না গোয়েন্দা আঙ্কেল। আমি ক'দিন যাবৎ বাড়িটা ওয়াচ করছি। ও বাড়িতে কোন লোকই থাকে না। এমন কি বাড়ির সদর দরজায় পর্যন্ত তালা দেয়া: সে তালায় হাত দিলেই তুমি বুঝতে পারবে অনেকদিন সে তালা খোলা হয় নি।

রিমা পাশ থেকে বললো,—ডাম্বেলের ধারণা পোড়োবাড়ি মানেই রহস্যময়, ভৌতিক।

—ভূত আমি মানি না। ডাম্বেল গম্ভীরভাবে বললো, —যেসব বাড়িকে ভৌতিক অপবাদ দেয়া হয় তার পেছনে কোন বদলোকের মতলব থাকে। শার্লক হোমস থেকে শরদিন্দু কিংবা ইদানিং কালের স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত এ নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন।

ডাম্বেলের কথার ধরনে মেঘনাদ হেসে উঠলো। বললো,—বেশ সেসব নিয়ে না হয় ভাবা যাবে। কিন্তু এখানে এসে আর কি রহস্যময় জিনিস তোমার চোখে পড়েছে মাস্টার ডি. ডি.?

ডাম্বেল গম্ভীরভাবে গলায় ঝুলনো বাইনোকুলারটা চোখের সামনে তুলে বললো, —তেমন নতুন ক্লু পেলে তোমায় নিশ্চয়ই জানাব গোয়েন্দা আঙ্কেল।

এরপর সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে দত্ত দম্পতি বিদায় নিলেন। যাবার আগে ডাম্বেলের মা তপতী দেবী মেঘনাদ আর আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেলেন সেদিনের দুপুরের খাওয়াটা আমরা যেন ওদের সঙ্গে খাই।

।। চার।।
(থুরথুরে নুয়ে পড়া বুড়ো)

সেদিন দত্ত দম্পতির সঙ্গে ওঁদের হলিডে হোমের সামনে হোটেলে লাঞ্চ সেরে যখন বেরুলাম, তখন দুপুর দুটো বেজে গেছে।

মেঘনাদ কিন্তু ফেরার পথ ধরলো না। ও এগিয়ে চললো হলিডে হোমের পেছনে কিছু দূরে সেই ভাঙা বাড়িটার দিকে।

জিজ্ঞেস করলাম, —হ্যাঁরে মেঘনাদ, তুই কি ডাম্বেলের কথাটা সত্যি বলে মেনে নিলি? তোরও ধারণা ওই ভাঙা বাড়িতে কোন রহস্য আছে?

—রহস্য না থাক বাড়িটার গঠন শৈলী দেখার মতো, মেঘনাদ হঠাৎ যেন হেঁয়ালি শুরু করলো,—আজ এটা জীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকলেও দেখলেই বোঝা যায় এককালে রীতিমত কোন বনেদী লোকের বাড়ি ছিল।

বুঝলাম মেঘনাদ আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে কোন কারণে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে।

সুব্রতবাবুর হলিডে হোম ছাড়িয়ে যে রাস্তাটা সোজা ভেতর দিকে ঢুকে গেছে সেটা ধরে কয়েক মিনিট হাঁটলেই জায়গাটা কেমন নির্জন হয়ে আসে। আশে- পাশে পাকা বাড়ি খুব একটা নেই। তারই মধ্যে ভাঙা দোতলা বাড়িটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সত্যিই দেখলে মনে হয় এককালে বাড়িটা কোন বর্ধিষ্ণু বাঙালীর বিশ্রাম আবাস ছিল। এখন হয়তো আর কেউ দেখবার নেই। সংস্কারের অভাবে বাড়ির পলেস্তরা খসে পড়েছে। দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে গাছের চারা। ডাম্বেল বলছিল এ বাড়িতে কেউ থাকে না। সত্যিই কি তাই? কোন কেয়ারটেকারও কি নেই? তা থাকলে অবশ্য বাড়ির এতটা দুরবস্থা হতো না।

আমরা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

মেঘনাদ কয়েক সেকেণ্ড বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,—চল অর্ণব, একবার ভেতরে একটা পাক মেরে যাই।

বলতে বলতে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ভাঙা গেট পার হয়ে বাড়ির সামনের জংলা বাগানটায় পা দিল। অগত্যা আমাকেও অনুসরণ করতে হলো।

আজ অবশ্য বাগানটা জঙ্গল হয়ে থাকলেও এককালে যে স্থানটা মনোরম ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা শুকনো ফোয়ারা। যেন কোন প্রস্তর নির্মিত জলকন্যা নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ আর তার জল ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা নেই।

জংলা বাগানটা পার হয়ে আমরা বাড়ির সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাম্বেল ঠিকই বলেছিল—দরজায় একটা মরচে পড়া তালা ঝুলছে এবং তালার ওপর ধূলোর স্তর দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না এ তালায় বহুদিন হাত পড়ে নি।

মেঘনাদ বললো,—আয় অর্ণব, বাড়ির পেছন দিকটা দেখি।

আমরা বাড়ির পেছন দিকে গেলাম। সেখানে একটা খিড়কির দরজা। এইসব পুরনো বাড়িতে এইরকম একটা পেছনের দরজা থাকে। কিন্তু সে দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ।

আমি বললাম, —বাড়ির সামনের এবং পেছনের দুটো দরজাই বন্ধ। তাহলে ভেতরে লোক ঢুকলো কি করে?

মেঘনাদ কোন উত্তর দিল না। ও নীচ থেকে দাঁড়িয়ে বাড়ির ওপর দিকটা দেখছিল। কযেকটা জানলা দেখা যাচ্ছে। কোনটা বন্ধ, কোনটা বা ভাঙা। অমন একটা ভাঙা জানলার ভেতরেই কি ডাম্বেল গত রাতে আলো জ্বলতে দেখেছে? কিন্তু সে লোক ওবাড়িতে ঢুকলো কি ভাবে? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা চকিতে মাথার মধ্যে খেলে গেল—তবে কি সেই লোক এখনও বাড়িতে আছে? তাই কি খিড়কির দবজা ভেতর থেকে বন্ধ?

ভাবনাটা আরও গড়াবার আগে মেঘনাদ বলল, —না রে অর্ণব তুই বোধ হয় ঠিকই বলেছিস। ডাম্বেল যেমন কল্পনাপ্রবণ ছেলে, হয় ও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে, না হয় ঘরের মধ্যে জোনাকি উড়তে দেখে...।

বলতে বলতে মেঘনাদ থমকে গেল।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম—জংলা বাগানের লোহার গেটটা খুলে এক ব্যক্তি প্রবেশ করছে।

শুধু ব্যক্তি না বলে থুর থুরে বুড়ো মানুষ বলাই ভাল। বয়স আশিব বেশী তো বটেই। মাথায় সাদা সনের মতো চুল। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। বয়সের ভারে বেঁকে একেবারে সামনে নুয়ে পড়েছে। হাতে একটা লাঠি। খালি গা। পরনে শুধু একটা আটহাতি ধুতি।

মেঘনাদ কয়েক মুহূর্ত আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ওঁর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তারপর দুহাত জোড় করে বললো,—নমস্কার।

বুড়ো মানুষটি চোখেও কম দেখেন। তাই মেঘনাদের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে মাথাটা তুলে ডান হাতটা চোখের ওপর রেখে যেন ঠাওর করে বললেন. কে বটে আপনি?

—একটা কথা জানতে চাই। এই বাড়িটা কি বিক্রি হবে? মেঘনাদ দুম করে প্রশ্নটা করলো।

বুড়ো মানুষটি এবার সোজা হয়ে দাঁড়াবাব চেষ্টা করে বললেন, —অ! তোমারও তাহলে নজর পড়েছে?

—তার মানে? নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করে মেঘনাদ, আরও কেউ কিনতে চেয়েছে বুঝি?

—সেটাই তো স্বাভাবিক। ভাগাড়ে গরু মরে পড়ে থাকলে শেয়াল, শকুন সবাই খাবলে নেবার চেষ্টা করে। পুরীর মতো জায়গায় যেখানে দিনে দিনে হোটেল, হলিডে হোম বাড়ছে সেখানে কি এমন একটা বাড়ি এমনি পড়ে থাকতে পারে?

—আপনি বুঝি এ বাড়ির কেয়ার টেকার? এবার মেঘনাদের পাশ থেকে আমি

জিজ্ঞেস করলাম।

—কি বললে বাবা 'কেয়ার টেকার'? হুঁঃ! যে বাড়ির সম্পর্কে মালিকের কোন কেয়ারই নেই তারা আবার রাখবে কেয়ার টেকার। বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলেন সেই বৃদ্ধ। গলার স্বর পরিবর্তন হলো,—হ্যাঁ, এককালে এ বাড়ির রমরমা ছিল বটে। যখন আসল কত্তা গগনেন্দ্র রায়চৌধুরী বেঁচেছিলেন।

—গগনেন্দ্র রায়চৌধুরী! মানে বরানগরের...?

মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগে বৃদ্ধ উৎসাহে দপদপে চোখে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা। রীতিমত বনেদীবাবু ছিলেন তিনি। বছরে একবার এখানে এসে উঠতেন। কটা দিন জাঁকজমক ভরপুর হয়ে থাকতো এ বাড়ি...।

—তখন বুঝি আপনি এ বাড়ির কেয়ার টেকার ছিলেন?

—ঠিক, ঠিক বলেছ বাবা। বৃদ্ধ মেঘনাদের দিকে ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে বললেন,—সেসব দিন কবে পার হয়ে গেছে। এখন বাবুর পাঁচ ছেলের কুড়িজন নাতি নাতনী এ-বাড়ির মালিক।

—তাদের বুঝি আর এ বাড়ি সম্পর্কে উৎসাহ নেই।

—তাদের সময় কোথায়? তারা শুধু মালিকানা নিয়ে শরিকি লড়াই-এ মত্ত। ওরা সবাই মালিক অথচ কারুর এ-বাড়িতে আলাদা অধিকার নেই। আমার আর কেয়ার টেকার করে রাখারই বা ক্ষমতা এখন তাদের কোথায়? এখন এ-বাড়ির কেয়ার টেকার দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ।

অসহায় বুড়ো মানুষটার কথা শুনতে শুনতে মনে হলো এ বাড়িটার ওপর ওঁর এখনও ভীষণ মায়া। বললাম, আপনি এখন থাকেন কোথায়?

—এখন আমায় এ বাড়ির একজন পরগাছা বলতে পার, বলতে বলতে ফোকলা মুখে হেসে বুড়ো জংলা বাগানের এক কোণে আঙুল তুলে দেখালেন।

দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, ওখানে একটা ভাঙা ঘর। প্রথমে ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হয়েছিল। জানলা দরজা বলতে কিছু নেই।

—চিরটা কাল ওই ঘরেতেই কাটিয়ে এলাম। তখন অবশ্য ঘরের ওই অবস্থা ছিল না। কত্তামশায়দের আমলে বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার-টেকার-এর ঘরটা স্যারানো হতো। এখন বাড়িরই কোন কেয়ার নেই, তো...!

বুড়ো কথা শেষ হলো না—হঠাৎ দড়াম করে একটা আওয়াজ হলো।

চমকে তাকিয়ে দেখি বাড়ির ছাদের কার্নিসের একটা অংশ ভেঙে আছড়ে পড়েছে জংলার বাগানের ওপর আর একটু বেকায়দায় পড়লে হয়তো আমরা আহত হতাম।

আমি ছাদের কার্নিসটার দিকে তাকালাম। স্থানটায় ফাটল ধরেছে, ভাঙা চোরা—কিন্তু হঠাৎ এভাবে কিছুটা অংশ ধ্বসে পড়ে গেল। এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই তো?

ভাবতে ভাবতে থুরথুরে বুড়ো মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। মুখটা ওঁর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ উনি অমন ভয় পেলেন কেন কে জানে!

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ওর ভ্রু দুটো কুঁচকে গেছে। অর্থাৎ ওর মনে কিছু বেসুরো বেজেছে।

—এইভাবেই একদিন সারা বাড়িটা ধ্বসে যাবে। মেঘনাদ আপন মনেই কথাটা বলে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বুড়ো যেন তটস্থ হয়ে উঠলো,—আমি তো বললাম, এবাড়ি এখন বিক্রি হবে না। তোমরা এখন যাও দেখি। বলতে বলতে উনি হঠাৎ হাঁটতে শুরু করলেন।

—আর একটা প্রশ্ন ছিল। পেছন থেকেই কথাটা ছুঁড়ে দিল মেঘনাদ।

বুড়ো থমকে দাঁড়ালেন কিন্তু ফিরে তাকালেন না।

—আপনি কি বলতে পারেন রাতের বেলা এ বাড়িতে কারুর আনাগোনা হয় কিনা। আপনি তো এই বাগানেই থাকেন।

পেছন থেকেই বুঝতে পারলাম অশীতিপর বৃদ্ধর শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। পিছু না ফিরে বললেন, —আমি বুড়ো মানুষ, দিনের বেলাই চোখে দেখি না তো রাতে! তোমরা কি মতলবে এসেছ জানি না, তবে যে মতলবেই আস আমার কাছে কোন সুবিধে হবে না বাপু —বলতে বলতে থুর থুরে নুয়ে পড়া বুড়ো মানুষটা হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে জংলা বাগানের কোণে সেই ভেঙে পড়া ঘরটার দিকে চলে গেলেন।

মেঘনাদ ওঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বললো,—বুড়ো মানুষটাকে দেখে সত্যিই দুঃখ হয়রে অর্ণব। এ বাড়ি নিয়ে যাদের ক্ষমতা থাকার কথা ছিল তাদের আর হুঁশ নেই। শুধু এই থুরথুরে বুড়ো একদা কেয়ার টেকার আজও এখানে পড়ে আছে সেই বিবর্ণ অতীত স্মৃতি নিয়ে।

বললাম—কিন্তু বাড়িতে কেউ আসে কি না জিজ্ঞেস করতেই উনি কেমন ভয় পেয়ে গেলেন।

—আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি অর্ণব।

—আর এই দিন দুপুরে হঠাৎ বাড়ির ছাদের কার্নিসের এক অংশ ভেঙে পড়াটা?

—ওটা নিয়ে আপাততঃ আমাদের না ভাবলেও চলবে।

বলতে বলতে মেঘনাদ জংলা বাগানের বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু পরে মনে হয়েছে ব্যাপারটা বোধ হয় এখন থেকে ভাবলেই ভাল হতো।

॥ পাঁচ ॥

(ভাবনার নতুন মোড়)

সেদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ লোকাল থানার ইনচার্জ ইনস্পেক্টর রমেশ মোহান্তি এসে হাজির হলেন।

ইনসপেক্টর মোহান্তির সঙ্গে মেঘনাদের অনেক দিনের পরিচয়। বছর কয়েক

আগে এই পুরীতেই একটা রহস্য কাণ্ডে মেঘনাদ ইনসপেক্টর মোহান্তিকে সাহায্য করেছিল এবং মেঘনাদের বুদ্ধির কৌশলেই ইনসপেক্টর মোহান্তি সে রহস্যের সমাধান করেছিলেন। সেই থেকে মেঘনাদ পুরী এলেই ওঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়। এবার মেঘনাদ এ পর্যন্ত দেখা করার সময় পায়নি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইনসপেক্টর মোহান্তির কাছে মেঘনাদের আসার খবর ঠিক পৌঁছে গেছে।

মেঘনাদ প্রথমেই একথাটা তুলতে ইনসপেক্টর মোহান্তি এক মুখ পান নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললেন,—মিঃ ভরদ্বাজ, আমরা হলাম জাতে পুলিশ। চুতুর্দিকে আমাদের সোর্স ছড়ান আছে। এই পুরীতে কে কবে আসছে আর যাচ্ছে সব খবর আমাদের রাখতে হয়।

মেঘনাদ হাসি চেপে বললো,--শুনে খুশি হলাম। কিন্তু আপনার সোর্সরা কি আমার আসার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর আপনাকে দিয়েছে?

ইনসপেক্টর মোহান্তি পান চিবুনো বন্ধ করে বললেন,—আপনার আসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ খবর! কি বলতে চাইছেন মিঃ ভরদ্বাজ?

মেঘনাদ তখন ইনসপেক্টরকে পুরীর সমুদ্রে একটা ট্রলার দাঁড়িয়ে থাকা থেকে শুরু করে তার মধ্যে শশী শ্রীবাস্তবের উপস্থিতিব কথা সবিস্তারে বলল।

শুনে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ইনসপেক্টব মোহান্তি। চোখ বড় বড় করে বললেন,—শশী শ্রীবাস্তব এখন এই খোদ পুরী শহরে? বলছেন কি আপনি মিঃ ভরদ্বাজ?

আমি বললাম—শশী শ্রীবাস্তবের কথা তাহলে আপনি জানেন?

—আলবাৎ! বলতে বলতে উত্তেজনায় সামনের টেবিলটা চাপড়ালেন ইনসপেক্টর। তারপর বললেন,—শশী শ্রীবাস্তব এখন দেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক ক্রিমিনাল। সে আমাদের এক প্রতিবেশী দেশের এজেণ্ট। যারা ভেতর থেকে এ দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়। ওরা এই শশী শ্রীবাস্তবের মতো স্পাইদের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধ্বংসাত্মক কাজ চালাবার চেষ্টা করছে। দিন পনের আগে ওরা কটকেও একটা বিস্ফোরণ ঘটিযে ছিল। কিছু নিরীহ লোক মারা গেছে।

—এসব লোকের একদিনেব জন্যেও জেলের বাইরে থাকা উচিত নয়। আমি যোগ করি।

—তবে আর বলছি কি মিঃ ভরদ্বাজ, এতদিনে তার যখন একটা সূত্র পাওয়া গেছে, চলুন, আজই পুলিশ ফোর্স নিয়ে ট্রলারে তল্লাশী চালাই।

—তাতে কোন লাভ হবে না, মেঘনাদ মাথা নাড়ে, মনে রাখবেন ইনসপেক্টব মোহান্তি, এই শশী শ্রীবাস্তবরা যত বড় ক্রিমিনাল হোক, এদেব যারা পেছন থেকে চালাচ্ছে তারা অনেক বেশী ধূর্ত। তাই এদের জালে ফেলতে আব একটু আট ঘাট বেঁধে নেয়া দরকার।

—কিন্তু!

ইনসপেক্টর মোহান্তির কথা শেষ হলো না, তার আগেই হৈ হৈ করে আমাদেব হোটেলের ঘরে ঢুকে পড়লো দুই ভাই বোন—ডাম্বেল আব রিমা। ডাম্বেলের

পরনে আগের মতোই জিনস জ্যাকেট, প্যান্ট, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ আর গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার।

—গুড ইভনিং গোয়েন্দা আঙ্কেল।

—গুড ইভনিং লিটল ডিটেকটিভ, মেঘনাদ হেসে বললো, হঠাৎ এ সময়ে কি মনে করে?

ডাম্বেল কিছু বলার আগেই বললো, রিমা,—বাবাই পাঠিয়েছে আপনার কাছে।

—দাঁড়াও, তার আগে তোমাদের সঙ্গে ইনসপেক্টার মোহান্তির আলাপ করিয়ে দিই।

মেঘনাদ ডাম্বেল আর রিমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে ডাম্বেলের বিশেষ প্রশংসা করে বললো, —পুরীতে এই লিটল ডিটেকটিভের পা দেয়ার খবরও আশা করি কোন সোর্স আপনাকে এ পর্যন্ত দেয়নি।

ইনসপেক্টর মোহান্তি হেসে ডাম্বেলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। কিন্তু ডাম্বেলের অটল গাম্ভীর্যে তাতে কোন ফাটল ধরলো না। বরং ইনসপেক্টর মোহান্তি তার হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলে ডাম্বেল বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, —একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একজন গোয়েন্দাকে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। সেদিক থেকে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উপকারই হলো।

—ঠিক কথা, মেঘনাদ বললো, এবার শুনি সুব্রতবাবু কেন এখন তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

—আমরা আগামীকাল সকালে এখানকার সাইডসীন দেখতে বেরুচ্ছি। সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসবো। বাবা আপনাকে আর অর্ণবকাকুকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছে।

রিমার কথা শেষ হলো না, ইনসপেক্টর মোহান্তি বলবার চেষ্টা করলেন,—কিন্তু এ সময়ে...

বলতে বলতে ইনসপেক্টর মোহান্তি মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিললেন। মেঘনাদ চোখ দুটো বুজিয়ে কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ চোখ খুলে বললো, —হ্যাঁ আমি যাব। রিমা, তোমার বাবাকে বলে দিও। বলতে বলতে ইনসপেক্টর মোহান্তির দিকে তাকিয়ে বললো,—আপনি বরং কালকের দিনটা সমুদ্রের ওই ট্রলারটার প্রতি নজর রাখার ব্যবস্থা করুন।

কিন্তু তখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এ ঘটনার গতি অন্যদিকে মোড় নেবে?

॥ছয়॥
(পেছনে আততায়ী)

সুব্রতবাবু প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সকাল সাতটার মধ্যেই আমরা সদলবলে সাইডসীন দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

পুরীর আশপাশে প্রচলিত সাইডসীন বলতে চন্দ্রভাগা নদী, কোনারকের

বিখ্যাত সূর্যমন্দির, খণ্ডগিরি উদয়গিরি, প্রাচীন জৈন গুহাগুলি, ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির। এছাড়া নন্দনকাননের চিড়িয়াখানা এবং ফেরার পথে সাক্ষীগোপাল।

বহু বছর আগে যখন আমরা প্রথম পুরী ভ্রমণে এসেছিলাম তখন এখানকার বিখ্যাত মুখার্জী কোম্পানীর বাসে এই সব সাইডসীন দেখে এসেছিলাম। এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে। সুব্রতবাবু আর তপতী দেবী খুবই আমুদে স্বভাবের দম্পতি। যাত্রার শুরুটা বেশ আনন্দজনকই হলো। মেঘনাদও দেখলাম ওদের সঙ্গে বেশ খোলা মনে মিশে গেছে। তবে ডাম্বেলের উৎসাহই সবচেয়ে বেশী।

তবে সাইডসীন দেখার থেকে তার বেশী আগ্রহ বাইনোকুলারটা চোখের সামনে রেখে আশপাশে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা। শেষ পর্যন্ত তপতী দেবীও না বলে পারলেন না, ডাম্বেল, তোর এই বাতিকটা এবার একটু ছাড় দেখি। যা দেখতে এসেছিস সেগুলো ভাল করে আগে দেখে শুনে নে। বারবার তো আর এসব জায়গায় আসবি না।

উত্তরে ডাম্বেল একসময়ে বাইনোকুলারটা চোখে রেখেই বলেছে,—সেটাই তো দেখছি মা। যাদের এখন দেখতে পাচ্ছি তাদের হয়তো পরে আর দেখতে পাব না।

কথাটা মেঘনাদের কানে যেতে ও ফিরে তাকিয়েছে,—কাদের তুমি দেখছ ডাম্বেল?

—দুজন লোক, ডি. ডি. অর্থাৎ ডাম্বেল দত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো,—মনে হচ্ছে পুরী থেকে বেরুবার সময় থেকে আমাদের ফলো করছে।

মেঘনাদ কিন্তু ওর হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে বার কয়েক এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করেও কিছু দেখতে পেল না।

তপতী দেবী হেসে বললেন,—মেঘনাদবাবু আপনি ওর কথাকে অত গুরুত্ব দেবেন না। ও সবসময়ই সর্ষের মধ্যে ভূত দেখে।

প্রকৃতই সর্ষের মধ্যে ভূত কিনা জানি না তবে আমাদের যাত্রার মধ্যে সত্যি দুবার দুটো ঘটনা ঘটলো। ঘটনা দুটো হয়ত কাকতলীয় কিন্তু তবু মেঘনাদের উৎসাহ চতুর্গুন বেড়ে গেল।

প্রথম ঘটনা ঘটলো সকালের দিকেই।

চন্দ্রভাগা নদী দেখে আমবা তখন কোনারকের সূর্যমন্দির দেখতে চলেছি।

রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। আমাদের মারুতি ভ্যান বেশ স্পিডেই রান করছিল। সামনের সীটে আমি আর মেঘনাদ। পেছনের সীটে সুব্রতবাবুর পরিবারের চারজন।

হঠাৎ পেছনের সীট থেকে ডাম্বেল বললো. গোয়েন্দা আঙ্কেল, দেখতে পাচ্ছ, অনেকক্ষণ যাবৎ ওই জিপটা আমাদের গাড়ির পেছনে পেছনে আসছে।

—একটা গাড়ি পেছনেও আসতে পারবে না রে ডাম্বেল। গোয়েন্দা গল্প উপন্যাস পড়ে তোর মাথাটা সত্যি একটা গোয়েন্দাগিরির দপ্তর হয়ে গেছে।

সুব্রতবাবুর কথাটা শেষ হলো না—আমাদের গাড়িটা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে টাল খেল, আর পাশ থেকে বন্দুকের বুলেটের মতো পেছনের জিপটা

ওভারটেক করে চলে গেল। আমাদের গাড়ির ড্রাইবার রতন জানা কোন করমে স্টিয়ারিং সামলে ধাবমান জিপটা লক্ষ্য করে একটা অকথ্য গালাগালি দিয়ে উঠলো।

—কি কি হলো রতন? সবাই মিলে একসঙ্গে প্রশ্নটা করলাম।

—জিপটার ড্রাইভার বোধ হয় ড্রাঙ্ক হয়ে চালাচ্ছে সাব। আর একটু হলে পাশ থেকে ধাক্কা মেরে খাদের নীচে আমাদের গাড়ি ফেলে দিচ্ছিল।

—কেন, রাস্তা ফাঁকা। পাশে অনেক জায়গায়ও ছিল। সুব্রতবাবুর বিস্ময় এখনও কাটেনি।

—তবে আর বলছি কি সাব। ওভারটেক করতে চায় বলে সংকেত দেয়নি পর্যন্ত। এমনভাবে কাউকে গাড়ি চালাতে আমার বারো বছর ড্রাইভার লাইফে দেখি নি সাব। বলতে বলতে রতন জানা কপালের ঘাম মুছলো।

আমার কিন্তু তখন এসব কথায় কান ছিল না। আমি ভাবছিলাম তাহলে কি ডাম্বেলের পর্যবেক্ষণই ঠিক হলো? ওই জিপটা বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আমাদের গাড়িটাকে অনুসরণ করে আসছিল সুবিধে মতো জায়গায় এ গাড়িটাকে ধাক্কা মেরে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে বলে। তা যদি সত্যিই সে পারতো তবে এতক্ষণ আমাদের গাড়ি রাস্তা থেকে খাদের নীচে পড়ে যেত। তাহলে কি কেউ বাঁচতো?

তার মানে কেউ কি আমাদের মারতে চায়? কিন্তু কেন? আমরা কি কারুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছি?

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ওর নজব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ও এখনও দূরে ধাবমান সেই জিপটার দিকে তাকিয়ে। বললাম—হ্যাঁরে মেঘনাদ, জিপের আরোহীদের লক্ষ্য করেছিস?

—একনজরে মাথায় শিখ পঞ্জাবীদের মতো পাগড়ী, চোখে গগলস। অন্যজনের গোঁফ দাড়ি। দুটোই বোধ হয় ছদ্মবেশ।

ডাম্বেল দূরবীন নামিয়ে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে অবাক ভাবে বললো, —গোয়েন্দা আঙ্কেল, তুমি ওদের কখন দেখলে।

—যখন থেকে ওরা আমাদের গাড়িটাকে অনুসরণ করছে। তুমি ঠিকই বলেছ ডাম্বেল, আমাদের ওপর কারুর নজর আছে। এখন থেকে আমাদের কিছুটা সাবধান হতে হবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটলো উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখতে গিয়ে।

তাব আগে পথেই ভোজনপর্ব সমাধা করে ভুবনেশ্বর মন্দির, নন্দনকানন দেখে নিয়েছি, বিশেষ করে নন্দনকানন দেখে রিমা ডাম্বেল দুই ভাই বোনই খুব খুশি। আজকাল নন্দনকাননের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকটা জায়গা ঘিরে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে অরণ্যের পরিবেশ। সেখানে ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ সিংহরা। এখানে আলাদা টিকিট কেটে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের বন্দোবস্ত মতো খাঁচা গাড়ি চড়ে ঢুকে পড়লাম। দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একবার তো একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে সুব্রতবাবু খাঁচা গাড়ির জানলা খুলে ফটো

তুলতে গিয়ে হঠাৎ চমকে্ উঠলেন—কখন নিঃশব্দে একটা সিংহ গাড়ির পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। আর একটু হলে সে লাফিয়ে উঠে থাবা মাবতে পারতো। সে অবশ্য তা না করে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে একটা হাই তুলে খাঁচার পাশ থেকে সরে গেল।

ব্যাপারটা যে কি সাংঘাতিক হতে পারতো এই নিয়ে যখন রিমা চোখ বড় বড় করে বলছে, ডাম্বেল হঠাৎ বাধা দিয়ে তাচ্ছিল্যভাবে বললো,—না দিদি তেমন কিছুই হতো না। একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব অকারণে অন্যকে আক্রমণ করে না। পশুরাজ সিংহ তো নয়ই। দেখছো না দূর থেকে কেমন রাজার ভঙ্গিতে সিংহটা আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি হেসে বললাম,—মিঃ ডি. ডি. এসব তথ্য তুমি কার কাছ থেকে জানলে?

স্কুলের লাইব্রেরীর বই থেকে। প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী খিদে না পেলে অথবা ভয় না পেলে অপরকে আক্রমণ করে না।

যাই হোক, এবার আমাদের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণের কথাটা বলি ঃ

ঘটনাটা ঘটলো উদয়গিরি পাহাড়ের ওপর।

পূর্ব ঘাট পর্বতমালার ওপর পাশাপাশি দুটি পাহাড় উদয়গিরি আর খণ্ডগিরি।

পাহাড়ের গায়ে আছে অনেক গুহা। সেইসব গুহায় এককালে জৈন সন্ন্যাসীরা বাস করতেন। এখন অবশ্য সেসব গুহার ধ্বংসস্তূপ অবস্থা। তবু প্রায় দুহাজার বছর পূর্বে তৈরি সেইসব গুহাগুলি আজও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষত রিমার ইতিহাস সম্পর্কে খুবই উৎসাহ। ও এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ইতিহাস নিয়ে পড়ছে।

কিন্তু দেখার কি উপায় আছে? সারা পাহাড় ভর্তি বাঁদরের পাল। তাদের বাঁদরামীর কোন সীমা নেই। এইতো আমাদের সামনেই এক মোটা সোটা ট্যুরিস্ট মহিলা কলা খেতে খেতে জৈন গুহার শোভা দেখছিলেন হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাঁদর হুপ করে লাফিয়ে এসে ভদ্রমহিলার হাত থেকে কলা কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর সামনেব পাহাড়ের মাথায় বসে দেখিয়ে দেখিয়ে কলা খেয়ে কলার খোসাটা ট্যুরিস্ট ভদ্রমহিলার গায়ের ওপরই ফেলে গেল।

আর একটু হলে ডাম্বেলের মাথার টুপিটাও বাঁদরের মাথায় উঠতো, নেহাত ডাম্বেল খুব হুঁশিয়ার ছেলে তাই সুবিধে হলো না।

এই ভাবেই সময় আমাদের বেশ মজা করেই কাটছিল, তাই বোধ হয় একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ডাম্বেলও তার পর্যবেক্ষণ স্থগিত রেখেছিল। তাই খেয়াল করে নি।

খেয়াল হলো আশপাশের লোকজনের চিৎকারে।

উদয়গিরি পাহাড়ের ওপর থেকে গুম গুম করতে করতে নেমে আসছে বিশাল এক খণ্ড পাথর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেই জায়গাটাতে।

কি ভাবে যে সবাই মিলে ছিটকে সরে গিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম তা ভগবানই জানেন। বিশাল পাথরের চাঙড়টা আমাদের প্রায় পাশ দিয়ে ভীষণ শব্দ

করতে করতে গড়িয়ে গেল একেবারে নীচের দিকে।

এমন একটা ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে আবার স্বাভাবিক হতে মিঃ এবং মিসেস দত্তের বেশ কয়েক মিনিট লাগলো। তপতী দেবী তো দুহাতে দুই ছেলে মেয়েকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকটা সময়।

এখন প্রশ্ন হলো পাহাড়ের ওপর থেকে এতবড় পাথরের চাঙড় হঠাৎ গড়িয়ে পড়লো কেন?

নেহতাই কি পাহাড়ী ধ্বস? অথবা অন্য কোন রহস্য আছে এর পেছনে।

ইতিমধ্যে উপস্থিত ট্যুরিস্টদের মধ্যেও এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। যার হাত থেকে কিছুক্ষণ আগে বাঁদরের কলা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল তিনি বোধ করি তখনও কদলীর দুঃখ ভোলেন নি, তাই চোখ বড় বড় করে বললেন, এসবই ওই বাঁদরগুলোর বাঁদরামী। ওরাই পাহাড়ের ওপর থেকে দল বেঁধে ধাক্কা মেরে পাথরের চাঙড় গড়িয়ে দিয়েছে।

উত্তরটা ডাম্বেল দিল,—আঙ্কেল, আমার তো মনে হয় এ স্রেফ বাঁদরামী নয়, যদি রামায়ণের হনুমান হতো তবেই বোধ কবি এতবড় একটা পাথরের খণ্ড ঠেলে পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয়া সম্ভব হতো। আপনি কি বলেন?

মেঘনাদ দেখলাম হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। ও কোন কথা বললো না।

আমি ট্যুরিস্ট দলের মধ্যে খুঁজছিলাম যদি কোন পাগড়িওলা শিখ পাঞ্জাবী কিংবা দাড়িওলা টুপি পরা মানুষকে দেখতে পাই— কিন্তু না, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

॥ সাত॥

(খুন এবং হুমকি)

সন্ধেবেলা হোটেলে ফিরলাম।

কিন্তু হোটেলের লাউঞ্জে পা দিতেই ম্যানেজার নীলমণি মাহাতো ছুটে এলেন।

—মেঘনাদবাবু আপনার অপেক্ষাই করছিলাম। ইনসপেক্টর মোহান্তি ফোন করেছিলেন। সাংঘাতিক ব্যাপার।

—কি হয়েছে বলবেন তো?

—খুন.. না না, একবার ঢোক গিলে নীলমণি মাহাতো বললেন, আজ বিকেলে সমুদ্র থেকে একটা ডেডবডি ভেসে এসেছে।

—ডেডবডি! কার?

—তা জানি না মশাই। শুনেই তো আমার হৃদকম্প শুরু হয়েছে। ইনসপেক্টর মোহান্তি বলেছেন, আপনি ফিরলেই যেন আপনাকে খবরটা দিই এবং আপনি যেন একবার স্পটে যান।

—স্পটটা কোথায়?

নীলমণি মাহাতো তাঁর শোনা মতো জায়গাটার নির্দেশ জানিয়ে দিল।

সুতরাং আমাদের আর হোটেলের রুমে গিয়ে রেস্ট নেয়া হলো না। মেঘনাদ বললো, জান বন্ধু, সাপের বিষ ঝাড়া ওঝা আর গোয়েন্দার মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে।

—কি মিল?

—কানে শুনলে আর ডাক পেলেই ঘটনাস্থলে যেতে হয়।

অগত্যা আমাদের তক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হলো। একেই বলে তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।

জায়গাটা স্বর্গদ্বার থেকে খুব দূরে নয়—যেখানে সকালবেলা কিছু লোক আনাজপাতি এবং মাছ নিয়ে বসে তার সামনেই।

ওখানে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর বেশ কিছু মানুষের জটলা।

দূর থেকেই চোখে পড়লো, ইনসপেক্টর মোহান্তি একজন স্থানীয় নুলিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছেন। আর নুলিয়াটা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে কেবল মাথা নাড়ছে।

সময়টা সন্ধ্যা গড়িয়ে এলেও জায়গাটা আলোকিত হয়ে রয়েছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ জিপ থেকে ফেলা আলোর ফোকাসে।

সেই আলোতেই দেখলাম—ওখানে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একটা ডেডবডি।

পুলিসের ফটোগ্রাফারও পৌঁছে গেছে। সে এখন নানা এ্যাঙ্গেল থেকে ডেডবডির ছবি তুলছে। আর এসব ঘিরেই কৌতূহলী জনতার ভীড়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ট্যুরিস্ট।

আমরা কাছাকাছি পৌঁছতেই ইনসপেক্টর মোহান্তির দৃষ্টি আমাদের ওপব পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ কি কাণ্ড। এমন একটা মানুষকে খুন করে কি লাভ বলতে পারেন।

ইনসপেক্টর মোহান্তি যখন কথাগুলো বলছিলেন আমরা ততক্ষণে ডেডবডিটা ভাল করে লক্ষ্য করে চমকে উঠেছি।

ওই বেঁটেখাট থুরথুরে বুড়ো মানুষটাকে আমরা চিনি। একদিন আগেও ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি আমি আর মেঘনাদ।

বুড়ো সেই কেয়ারলেস পোড়ো বাড়িটার প্রাক্তন কেয়ার টেকার। পোড়ো বাড়ির জংলা বাগানে একটা ধ্বংসস্তূপের মতো ঘরে যিনি বাস করতেন পুরনো স্মৃতি বুকে ধরে।

—পুরীর সমুদ্রে জাল পেতে মাছের বদলে কিনা মানুষের লাশ। এমন কখনও শুনেছেন?

—জাল ফেলে মানুষের লাশ! মেঘনাদও অবাক না হয়ে পারে না।

—এ্যাই, এ্যাই গোবিন্দ বল না এই হুজুরের কাছে। ইনসপেক্টর মোহান্তি এবার সেই নুলিয়াটির উদ্দেশ্যে বললেন।

গোবিন্দ নুলিয়া হাতজোড় করে বললো, —হুজুর, চল্লিশ বছর এই সাগরে মাছ ধরছি। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি।

—ঘটনাটা কি?

—হুজুর, রোজকার মতো আজও ভোর রাত্তিরে ছেলে আর ভাইপোকে নিয়ে সাগরে গিয়ে মাছ ধরা জাল ফেলেছিলাম। দুপুর নাগাদ জাল গুটিয়ে তুলতে গিয়ে দেখি আশ্চর্য ব্যাপার হুজুর। জালের মধ্যে মাছের সঙ্গে উঠে এল একটা আস্ত মরা মানুষের শরীর।

—হুঁ! তা ওই বুড়ো লোকটিকে তুমি চেন গোবিন্দ?

—না হুজুর! জ্যান্ত অবস্থায় ওই মানুষটিকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

—ডেডবডিটা আমি এর মধ্যে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি মিঃ ভরদ্বাজ, ইনসপেক্টার মোহান্তি গোবিন্দর কথা শেষ হবার আগেই বললেন,— মনে হচ্ছে লোকটিকে খুন করে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়েছিল। ওর কপালে বুলেটের ইনজুরি আছে।

—বুলেট ইনজুরি, অর্থাৎ গুলির ক্ষত?

—হ্যাঁ, কপালের এই ডানদিকটায় লক্ষ্য করুন।

এবার ইনসপেক্টব মোহান্তির সঙ্গে মেঘনাদও ডেডবডির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আলোর ফোকাস তো ছিলই, এর ওপর ইনসপেক্টর মোহান্তি তাঁর হাতের টর্চের আলোর রেখাও ফেললেন মৃতদেহের মুখের ওপর।

হ্যাঁ কপালের ডানদিকটায় একটা ক্ষত চোখে পড়ছে বটে। কিন্তু ওই ক্ষত বুলেট ইনজুরি কি না তা হয়তো পুলিশের চোখ কিংবা মেঘনাদই বলতে পারবে।

তবে আমি ভাবছিলাম ওই হতভাগ্য বৃদ্ধের কথা আর গতকাল তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর কথাগুলো। বিদায় কালে ওঁকে কেমন যেন হঠাৎ ভীত সন্ত্রস্ত মনে হয়েছিল। উনি কি বুঝতে পেরেছিলেন আততায়ী ওঁর কাছেই আছে।

রহস্য যে ক্রমেই জটিল হচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কি!

মেঘনাদ কিছুক্ষণ যাবৎ মৃতদেহটা পরীক্ষা করে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, —আপনার অনুমান সঠিক ইনসপেক্টর মোহান্তি! মৃতদেহের কপালে বুলেট ইনজুরি রয়েছে। পেটে মনে হচ্ছে একটা ফোঁটা জল নেই। এর অর্থ এঁকে অন্য কোথাও খুন করে মৃতদেহটা জলে ফেলে দেয়া হয়েছিল। হয়তো কাজটা হয়েছে গত রাতেই।

ইনসপেক্টর মোহান্তি ঘাড় নেড়ে বললেন,—ডেডবডির কনডিশান দেখে আমারও সে কথাই মনে হচ্ছে। তবে একটা কি মুশকিল হচ্ছে জানেন?

—কি?

—এই ক ঘণ্টার মধ্যেও মৃতদেহটা কেউ সনাক্ত করতে পারলো না।

মেঘনাদ বললো, —এ ব্যাপারে আমি বোধ হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—আপনি! ইনসপেক্টর মোহান্তি অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, —সত্যি বলছেন।

মেঘনাদ তখন আগের দিন সেই পোড়ো বাড়ির জংলা বাগানে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া এবং কথাবার্তার পুরো বিবরণী শুনিয়ে দিল।

ইনসপেক্টর মোহান্তি সব শুনে দুচোখ কপালে তুলে বললেন, —মিঃ ভরদ্বাজ, আপনি এর পরও বলবেন ওই রহস্যময় পোড়ো বাড়িটা তল্লাশি চালাবার দরকার নেই? আমার তো মনে হয় আর দেরি না করে আজই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে বাড়িটা ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালান দরকার। যে কটা ক্রিমিনাল ঘাপটি মেরে আছে সব একসঙ্গে ধরা পড়বে।

—না ইনসপেক্টর মোহান্তি, আমার মনে হয় এখনও সময় হয় নি। বিশেষত ওরা কোন সাধারণ ক্রিমিনাল নয়। ওরা অত্যন্ত ধূর্ত। খুব বড় পাকা মাথা ওদের পেছন থেকে চালনা করে। বাড়িটাতে তল্লাশি চালালেই আপনি যে ওদের গ্রেফতার করতে পারবেন তা মনে ভাববেন না। জাল ছিঁড়ে বেরুবার রাস্তা ওদেরও জানা আছে। আমার তো মনে হয ওদের হাতে নাতে ধরার চেষ্টা করাই ভাল।

—তাহলে এখন কি করতে বলেন?

—আপনি বরং আজ রাত থেকেই গোয়েন্দা বহাল করুন। সে যেন আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় ও বাড়িতে কারা ঢুকছে বা বেরুচ্ছে তার পুরো রিপোর্ট আপনাকে জানায়। আমার মনে হয খুব শিগগির আমরা এই স্পাই অপারেশন শুরু কবতে পারবো।

—ঠিক আছে মিঃ ভরদ্বাজ। আপনি যা বললেন তাই হবে।

এরপব ইনসপেক্টর মোহান্তি বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

এসব সেরে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম রাত আটটা বেজে গেছে।

সারাদিন শরীবের ওপব অনেক ধকল গেছে।

মেঘনাদ ম্যানেজার নীলমণি মাহাতোকে অনুরোধ করলো রাতের খাবারটা হোটেলের ঘরেই সার্ভ করতে। আজ ডাইনিং রুমে গিয়ে খাবার উৎসাহ নেই।

রাত নটা নাগাদ আমবা খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম।

এরপর মেঘনাদ জানলার ধাবে সুমদ্রের দিকে মুখ করে বসলো একটা স্পাই থ্রিলার হাতে নিয়ে, আর আমি বসলাম দিনের ঘটনাগুলো আমার নিজস্ব ডাইবীতে লিখে ফেলতে।

হঠাৎ ঘরেব ফোনটা বেজে উঠলো।

আমি উঠে বিসিভার ধরতেই রিসেপসান থেকে বললো,—মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজেব একটা কল আছে, উনি কি শুয়ে পড়েছেন?

আমি বললাম, — না, একটু ধরুন।

মেঘনাদকে বলতেই ওর ভ্রূ-কুঁচকে গেল, বললো,—এখন আমায় কে ফোন

করবে? বলতে বলতে এসে ফোনটা ধরলো। তারপর কয়েক সেকেণ্ড রিসিভার কানে রেখেই আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলো। ওর দুটো চোয়াল শক্ত, দৃষ্টি খর হয়ে উঠেছে। ওর এই ভঙ্গির অর্থ আমি জানি। বললাম,— ফোনে কেউ হুমকি দিল বোধ হয়?

—হ্যাঁ। মেঘনাদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো,—আমি নাকি বড্ড বাড়াবাড়ি করছি। এসব ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামালে আমার বিপদ হবে।

—তুই কিছু বললি না?

—আমি কোন জবাব দেবার আগেই ও তরফ থেকে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে।

—গলার স্বর কেমন?

—খসখসে। ইংরেজি আর হিন্দি মিশিয়ে কথাগুলো বললো। বলতে বলতে মেঘনাদ একটা বড় করে নিঃশ্বাস টেনে বললো,—লোকটা বুঝলো না, আমায় এভাবে হুমকি দিয়ে সে আমার জেদটাই বাড়িয়ে দিল, এ কেসের শেষ না দেখে আমি ছাড়বো না। তাছাড়া আর একটা ব্যাপারেও আমি নিশ্চিন্ত হলাম—আমার ভাবনা সঠিক পথেই চলেছে।

বলতে বলতে মেঘনাদ আবার জানলার পাশে সেই স্পাই থ্রিলারের পৃষ্ঠা খুলে বসলো।

॥ আট ॥
(ডাম্বেল কোথায়?)

পরদিন সকাল সাতটা।

পুরীর আজকের আবহাওয়া খুব ভাল। ঝকঝকে আকাশ, আলোকিত প্রকৃতি। ঘুম থেকে উঠেই মনটা বেশ ভাল লাগলো। মনে হলো গতকাল পর্যন্ত এ শহরে যা ঘটেছে তা সবই দুঃস্বপ্ন। কোনটাই সত্য নয়।

মেঘনাদেরও মেজাজটা দেখলাম বেশ ঝরঝরে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক তো এমনই।

আমি আর মেঘনাদ প্রাতঃকালীন চা-চক্র শেষ করে হোটেলের বাইরে পা দিলাম।

হঠাৎ চোখে পড়লো দূর থেকে ছুটতে ছুটতে একটি কিশোরী মেয়ে আমাদের হোটেলের দিকেই আসছে।

আরে ও তো রিমা।

আশ্চর্য। এই সাত সকালে রিমা এভাবে একা আমাদের এখানে ছুটে আসছে কেন? ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

রিমাও আমাদের দেখতে পেয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের সামনে এসে

দাঁড়াল :

—মেঘনাদ আঙ্কল, ডাম্বেল এখানে এসেছে?

—ডাম্বেল? কই না তো। ও কি এখানে আসবে বলেই তোমাদের হলিডে হোম থেকে বেরিয়েছে? মেঘনাদ জিজ্ঞেস করল।

—না। ও কিছুই বলেনি। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আমরা কেউই ওকে দেখতে পাচ্ছি না। রিমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

—অন্য কেউ ওকে বেরোতে দেখেনি?

—হলিডে হোমের একজন কর্মচারী দেখেছে। সে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল এত ভোরে ও একা কোথায় যাচ্ছে? ডাম্বেল তার উত্তরে বলেছে, একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনে বেরোতে হচ্ছে। তারপর থেকে ওকে আর কেউ দেখেনি।

—স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন! মেঘনাদ ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবল। তারপর বলল, গত রাতে ও কি এ-সম্পর্কে কিছু বলেছিল?

—না তো আঙ্কেল। তবে অনেক রাত পর্যন্ত দেখেছি ও হাতের বাইনোকুলারটায় চোখ রেখে আমাদের হলিডে হোমের কিছু দূরে সেই পোড়ো ভাঙা বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। ওখানে নাকি কোনও ঘরে ও রাতে আলো জ্বলতে দেখেছে।

—তোমার বাবা কোথায় রিমা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বাবা গেছেন থানার দিকে। আমায় বললেন, আপনাদের কাছে একবার ঘুরে যেতে। ডাম্বেল আপনার মস্ত ফ্যান মেঘনাদ আঙ্কেল। হয়তো এখানে আসতেও পারে।

মেঘনাদ আর সময় নষ্ট করল না। বলল, —এসো রিমা আমার সঙ্গে। আমার মনে হয় ডাম্বেল কোথায গেছে আমি বুঝতে পেরেছি।

সেই মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল আজ সকাল থেকে মনের মধ্যে গড়ে ওঠা সুন্দর ভাললাগা মুডটা।

॥ নয় ॥
(তল্লাসী)

আমরা পোড়ো বাড়িটার সীমানায় জংধরা লোহার গেটটার সামনে দাঁড়ালাম। তারপর ভেজান গেটটা খুলে জংলার বাগানে পা দিলাম।

বাঁ দিকে সেই ভাঙা ঝুপড়ি ঘরটা।

গত দুদিন আগেও ওই ভাঙা ঘরের মধ্যে এই পোড়ো বাড়ির স্মৃতি বুকে নিয়ে যে থুরথুরে বুড়ো মানুষটা বাস করতো সে খুন হয়েছে।

কোন সে নিষ্ঠুর মানুষ এমন একজন অসহায় বৃদ্ধকে নির্মমভাবে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ভাসিযে দিয়ে এসেছে কে জানে! এই বৃদ্ধ কার কি ক্ষতি করেছিলেন?

তবে কি ওই বৃদ্ধ মানুষটা জেনে ফেলেছিলেন এই পোড়ো বাড়ির কোন গুপ্ত

রহস্য। মেঘনাদ বলেছে, যে অপরাধ চক্র আজ কোন এক প্রতিবেশী দেশের এজেন্ট হয়ে আমাদের দেশটাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করতে চাইছে, তারা কোন সাধারণ অপরাধী নয়। তাদের হাত অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। তারা ঘাঁটি গেড়ে আছে আমাদের আশেপাশে।

কিন্তু মেঘনাদ আমায় আর রিমাকে নিয়ে এখানে এল কেন? তবে কি ওর ধারণা ডাম্বেল এখানেই এসেছে? নাকি ওরাই তুলে এনেছে ওকে ওদের ওই ঘাঁটিতে?

ভাবতেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো।

আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়িটার সদর দরজার সামনে।

পরশুদিন দেখে গিয়েছিলাম বাড়ির সদর দরজায় একটা মরচেপড়া তালা ঝুলছে। আজও তাই দেখলাম।

মেঘনাদ বললো, —চল, বুড়ো কেয়ার টেকারের ঝুপড়িটাও একবার চোখ বুলিয়ে আসি।

মেঘনাদ হঠাৎ ওখানে যেতে চাইলো কেন কে জানে। যাই হোক, আমরা গিয়ে সেই ভাঙা ঝুপড়িটার মধ্যে ঢুকলাম।

ঝরঝরে ভাঙা একটা ঘর। এমন ঘরে মানুষ বাস করতে পারে মনে হয় না। হয়তো এককালে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। কিন্তু এখন যে ওখানে মানুষের বাস ছিল তা ঘরটায় চোখ বুলিয়েই বোঝা যায়।

থাকার মধ্যে আছে একটা ভাঙা উনুন, দু-একটা তৈজসপত্র, কয়েকটা শুকনো আলু, কুমড়ো, ইত্যাদি আর কিছু ছেঁড়া জামা কাপড়।

মেঘনাদ একঝলক চোখ বুলিয়েই বেরিয়ে এল। তারপর আশপাশে কি যেন খুঁজতে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগলো।

বললাম—মেঘনাদ, কাউকে খুঁজছিল?

—ইনসপেক্টর মোহান্তিকে বলেছিলাম গত রাত থেকেই এই বাড়ির ওপর গোপনে নজর রাখার জন্যে গোয়েন্দা পাঠাতে, কিন্তু...

সত্যিই তো! আশেপাশে কাউকেই চোখে পড়ছে না। হয় কেউ এখানে নেই, অথবা আমাদের সে আড়াল থেকে নজর রাখছে।

মেঘনাদ বললো, চল, এখানে দাঁড়িয়ে লাভ নেই। বাড়ির ভেতরেই ঢুকতে হবে।

বললাম—ব্যাপারটা একটু বেশী ঝুঁকি নেয়া হবে না? মানে তুই যা বলেছিস...

—একটা কিশোরের প্রাণের বিনিময়ে এটুকু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় নেই অর্ণব।

আমরা তিনজন বাড়িটাব পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগের দিনের মতো আজও সে দরজা বন্ধ হয়ে রয়েছে।

মেঘনাদ কয়েক সেকেণ্ড বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ একটা ঠেলা দিল।

আশ্চর্য! দরজাটা ক্যাঁচ করে খুলে গেল। অর্থাৎ দরজা ভেতর থেকে খোলাই ছিল।

মেঘনাদের দু'চোখের দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠেছে। ও একবার আমার আর রিমার দিকে তাকাল, তারপর ভিতরে পা দিল। ওর পেছনে আমি আর রিমা।

ভেতরে আধো অন্ধকার হলঘর। ভাঙাচোরা। একধারে একটা পুরনো কাঠের টেবিল কাত হয়ে পড়ে আছে।

হলঘরের চারদিকে খানতিনেক ঘর। সব ক'টি ঘর তালাবন্ধ, হলঘরের একদিকে একটা ভাঙা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

মেঘনাদ সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে চলল। ওর সঙ্গে আমরাও।

হঠাৎ রিমা চেঁচিয়ে উঠল, —এই দেখুন আঙ্কেল।

ফিরে তাকালাম। রিমা সিঁড়ির পাশটায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে একটা টুপি।

রিমা আর কিছু বলার আগেই মেঘনাদ রিমার হাত থেকে টুপিটা নিয়ে বলল, —গতকাল সন্ধেবেলা এই টুপিটাই ডাম্বেল মাথায় দিয়ে ছিল না?

—হ্যাঁ মেঘনাদ আঙ্কেল। রিমা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল,—এর মানে ডাম্বেল এখানে এসে নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে।

—ভয় নেই রিমা। এসো আমার সঙ্গে।

মেঘনাদ রিমার কাঁধে ছোট্ট চাপড় দিয়ে ওর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। আমিও সতর্ক পায়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টি রেখে ওকে অনুসরণ করলাম।

দোতলায় পা দিতেও সামনেই একটা হলঘর পেলাম। একতলার মতোই বিভিন্ন দিকে খানতিনেক ঘর। সব ঘরেই তালা ঝুলছে।

ডাম্বেলের টুপিটা ছাড়া এ-পর্যন্ত এখানে এসে মানুষজনের কোনও চিহ্ন বা সাড়া পাইনি।

মেঘনাদ মেঝের এককোণ থেকে কী একটা তুলল।

—কী রে ওটা মেঘনাদ।?

—বিদেশি সিগারেটের টুকরো। মেঘনাদ সেটা নাকের সামনে নিয়ে শুঁকতে-শুঁকতে বলল, —জিনিসটা খুব পুরনো মনে হচ্ছে না। এখনও পোড়া গন্ধটুকু রয়ে গেছে।

রিমা ভীত কণ্ঠে বলল,—মেঘনাদ আঙ্কেল, ডাম্বেল তো তা হলে ঠিকই বলেছিল। এ-বাড়িতে গত রাতে লোক এসেছিল।

—কিন্তু এখন তো কাউকেই দেখছি না।

আমার কথায় কান না দিয়ে মেঘনাদ রিমাকে বলল,—বিমা, এক কাজ কর তো। ডাম্বেলের নাম ধরে খুব জোরে চেঁচিয়ে ডাক।

—ডাকব?

—হ্যাঁ ডাক। কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি।

রিমা চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল—ডাম্বেল, ডাম্বেল, তুই কি এখানে আছিস?

কোথাও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মেঘনাদের ইঙ্গিতে আবার চেঁচাল

রিমা,—ডাম্বেল, মেঘনাদ আঙ্কেল এসেছেন তোকে খুঁজতে। সাড়া দে ডাম্বেল।

মেঘনাদের ইঙ্গিতে থেমে গেল রিমা। এর পর আমরা সবাই কান পাতলাম।

একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে না? কেমন যেন একটা ঘষটানির শব্দ আর সেই সঙ্গে গোঙানির মতো স্বর।

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ-ভঙ্গি আমার চেনা। এই মুহূর্তে ওর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মেঘনাদ কিছু না বলে আমাদের বাঁ দিকে শেষ ঘরটার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উত্তেজিতভাবে বলল, অর্ণব, চাপ দে। এ-দরজা ভাঙতে হবে।

বারকয়েক শরীরের ভার দিয়ে দু'জনে মিলে চাপ দিতেই ঘরের দরজাটা কব্জা থেকে খুলে বেরিয়ে এল।

মেঘনাদ প্রায় লাফ মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সবক'টা জানলা ভেতব থেকে বন্ধ। তবু বুঝতে অসুবিধে হল না ঘরে কেউ একজন রয়েছে।

মেঘনাদ কিছু বলার আগেই আমি এগিয়ে গিয়ে একটা জানলা টেনে খুলে দিলাম। তার আগে রিমার কান্নাঝরা কণ্ঠস্বর কানে এল, মেঘনাদ আঙ্কেল, অর্ণব আঙ্কেল, ডাম্বেলকে ওরা কি করেছে দেখুন।

তাকিয়ে দেখলাম। সত্যিই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ঘরের এককোণে ডাম্বেল পড়ে রয়েছে। ওর হাত-পা বাঁধা। মুখটাও একটা কাপড়ের টুকরোতে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কিন্তু ওই অবস্থাতেও চোখ খুলে পিটপিট করে তাকাচ্ছে ডাম্বেল। এখন বুঝতে পারছি ঘরের বাইরে আমাদের সাড়া পেয়ে ওই গোঙানির আওয়াজ আর মেঝেতে ঘষটানির শব্দ করে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। ওর কৌশল ব্যর্থ হয়নি।

ততক্ষণে মেঘনাদ দ্রুত হাতে ডাম্বেলের সব বাঁধন খুলতে শুরু করেছে। বাঁধন খুলতেই উঠে বসল ডাম্বেল, তারপর ওই অবস্থার মধ্যেও এতটুকু নাভার্স না হয়ে ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানাল, থ্যাঙ্কু গোয়েন্দা আঙ্কেলঙ্গ। আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত তুমি এসে আমায় উদ্ধার করবে।

—তুই থাম। রিমা ধমকে উঠল, আজ যদি মেঘনাদ আঙ্কেল এখানে আসার কথা না ভাবতেন, তোর কী অবস্থা হত বুঝতে পারছিস? এখানে কেউ কি তোর খোঁজ পেত?

—অ্যায়সা নেহি হো সকতা। আবেগের বশে রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে এল ডাম্বেলের কণ্ঠ থেকে, রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ এমন অনেক কেসে তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেছে।

ওর কথার ভঙ্গিতে না হেসে পারলাম না। সত্যি সাহস আছে ছেলেটার।

তারপর আমি কিছু বলার আগে মেঘনাদ বলল,—কিন্তু মাস্টার ডি. ডি., আগে বলো এ-অবস্থা তোমার হল কেমন করে? এখানে কে এনেছে তোমায়?

—এখানে আমি নিজেই এসেছিলাম গোয়েন্দা আঙ্কেল। একটা বিশেষ

ইনভেস্টিগেশনের জন্য।

—কী ইনভেস্টিগেশন বলো তো? মেঘনাদ বলল, তুমি নাকি গত রাতে এই পোড়ো বাড়িতে আলো দেখতে পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, গোয়েন্দা আঙ্কেল। ডাম্বেল এবার উঠে দাঁড়িয়ে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই বলতে শুরু করে, গতকাল সকালেই দেখে গেছি এটা একটা ভাঙা বাড়ি। এখানে কেউ থাকে না। কিন্তু রাতে আমাদের হলিডে হোমে ঘুমোতে যাওয়ার সময় হঠাৎ বাইনোকুলারটা দিয়ে এই বাড়িটার দিকে তাকাতেই অবাক হলাম। এ-বাড়ির দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। তুমি বলো গোয়েন্দা আঙ্কেল, ব্যাপারটা রহস্যময় নয়? তাই তো ভোর হতেই কাউকে কিছু না বলে...!

—দিনকে দিন তুই কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস ডাম্বেল। ওর দিদি রিমা স্বাভাবিক কারণেই ভাইকে ধমকায়, আজ নেহাত কপালের জোরে বেঁচে গেলি!

—অবজেকশন। ডাম্বেল গম্ভীরভাবে দিদির কথায় প্রতিবাদ করল, একজন গোয়েন্দা কখনও কপালের ভরসায় চলে না।

রিমা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেঘনাদ বলল, কিন্তু এখানে এসে তোমার এ অবস্থা হল কী করে?

ডাম্বেল বলল, ব্যাপারটা যে এমন হবে তা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি গোয়েন্দা আঙ্কেল। এ-বাড়ির গেট পেরিয়ে ঢুকে দেখলাম সমানের দরজায় দিব্যি তালা দেওয়া। তারপর ঘুরতে-ঘুরতে পেছনের ভাঙা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি কোনও লোকজনের সাড়া নেই। ভাবলাম, এসেছি, যখন সাবা বাড়িটাই একবার ঘুরে দেখে যাই। যদি কোন রহস্যের ক্লু পাওয়া যায়। এই ভেবে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছি, হঠাৎ দেখি একজন লোক সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে।

—কেমন দেখতে লোকটাকে? প্রশ্ন করলাম।

বিচ্ছিরি। কালোর রঙের শার্ট-প্যান্ট পরা। মাথায় টাক আর টাকের সামনে কপালের ওপর একটা শিঙের মতো 'আব' গজিয়ে আছে।

—শিঙের মতো আব! মেঘনাদ বিড়বিড় করল। ডাম্বেল তখন বলে চলেছে,—লোকটাকে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। লোকটাও বোধ হয় এখানে আমকে দেখবে আশা করেনি। কর্কশ গলায় বলল, 'অ্যাই কে রে তুই?' আমি বললাম, আমি গোয়েন্দা ডি. ডি.। ইনভেস্টিগেশনে এসেছি।

লোকটা চোখ পাকিয়ে বলল, 'কিসের ইনভেসিগেশন'? ততক্ষণে লোকটার পাশে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে। সে লোকটারও কেমন যেন রুক্ষ চেহারা। আমি বললাম, 'গত রাতে এ-বাড়িতে আলো জ্বলছিল। অন্যের তালা দেওয়া বাড়িতে তোমরা ঢুকেছ কেন? দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'আমরা এখানে রাতের বেলা কেত্তন করি। এসা না খোকা, দেখে যাও।' বলতে-বলতেই লোকটা নেমে গিয়ে আমায় পাঁজাকোলা করে দোতলায় নিয়ে এল। তারপর এই ঘরে ঢুকিয়ে বাঁধতে-বাঁধতে বলল, 'তুই বড্ড বেশি জেনে গেছিস। এবার এখানে পচে মর।' বলে আমায় ফেলে রেখে জানলা-দরজা বন্ধ করে দু'জনে চলে গেল।

—কী সাঙ্ঘাতিক! রিমা বলল, ওরা তোকে মেরেও ফেলত পারত!

দিদির কথায় কান না দিয়ে ডাম্বেল বলল, আমি কিন্তু একটুও নার্ভাস হইনি গোয়েন্দা আঙ্কেল। আমি জানতুম তুমি এখানে নিশ্চয়ই আসবে।

—কিন্তু মাস্টার ডি. ডি. এভাবে রিস্ক নেওয়াটা তোমার উচিত হয়নি। গোয়েন্দাদের কাজেরও একটা পদ্ধতি থাকা উচিত। তাছাড়া নিজেকে বাঁচানোর কথাটাও আগে থেকে ভাবতে হয়।

মেঘনাদের কথায় ডাম্বেল একটু যেন দমে গেল। কিছুক্ষণ মুখটা নিচু করে রইল। তারপর আবার মাথাটা তুলে বিমর্ষভাবে, বলল, জানো আঙ্কেল, ওরা আমার টুপি আর বাইনোকুলারটা কেড়ে নিয়েছে।

মেঘনাদ হেসে ওর পিঠটা চাপড়ে বলল, তোমার টুপি আমরা পেয়েছি। আর ভবিষ্যতে গোয়েন্দা ডি. ডি.'র জন্য আরও ভাল একটা বাইনোকুলার দরকার হবে। এখন চলো। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।

ভাঙাবাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক খুবই উদ্বিগ্নভাবে হন্তদন্ত হয়ে থানা থেকে ফিরছিলেন।

ডাম্বেলকে দেখে ওঁর যেন ধড়ে প্রাণ এল। এর পর মেঘনাদের মুখে সব শুনে উনি তো রীতিমত আঁতকে উঠলেন, মেঘনাদবাবু, এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত বাড়িটায় কোন অপরাধচক্রের ঘাঁটি হয়েছে।

—হুঁ। মেঘনাদ চিন্তিত গলায় বলল. ডাম্বেল কৌতূহলের বশে ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে পড়েছিল বলেই ওরা ওর মুখ বন্ধ করার জন্য ওকে আটকে রেখেছিল।

—এখন তা হলে কী করা উচিত মেঘনাদবাবু? সুব্রত দত্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন।

—যা করবার আমি করব। মেঘনাদ গম্ভীরভাবে বলে, আপনার কাছে শুধু একটাই অনুরোধ। অন্তত আজকের দিনটাতে আপনারা কেউ কোন কারণেই হলিডে হোম থেকে বেরোবেন না। বলতে-বলতে ডাম্বেলের দিকে তাকাল মেঘনাদ, মাস্টার ডি. ডি. মনে রাখবে এটা রহস্যভেদী মেঘনাদের নির্দেশ।

—ও. কে. গোয়েন্দা আঙ্কেল। ডাম্বেল সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

॥ দশ ॥
(গোয়েন্দাগিরির ফ্যাসাদ)

ডাম্বেলকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরতেই রিসেপশানের মেয়েটি মেঘনাদের হাতে একটা মুখ বন্ধ খাম ধরিয়ে দিয়ে বললো, —মিঃ ভরদ্বাজ, একটু আগে একজন এসে আপনার নামে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। বলেছে জরুরী।

—লোকটাকে চেনেন। মেঘনাদ খামটা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো।

—না স্যার। আগে কোনদিন দেখেছি মনে হয় না। খুব সাধারণ চেহারা। মনে

হয় স্থানীয় লোক।

মেঘনাদ আর কোন কথা না বলে চিঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারপর খাম খুলে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে আমায় দিল।

দেখলাম ইংরাজিতে দুলাইন লেখা আছে। বাংলা করলে দাঁড়ায় ঃ

"অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ। ইচ্ছে করলে আজই তোমার লাশ ফেলে দিতে পারতাম। শেষ বারের মতো সাবধান করছি। আমাদের পথের কাঁটা হবার সাহস ত্যাগ কর।

বন্ধু"

চিঠিটা মেঘনাদের হাতে ফেরত দিয়ে বললাম, বন্ধু না শয়তান শত্রু!

মেঘনাদ বললে, আর দেরি করা ঠিক হবে না অর্ণব। অজানা বন্ধুর সঙ্গে শেষ মোকাবিলার সময় সমাগত। বলতে বলতে তক্ষুণি ওর সেই ছদ্মবেশ ধারনের বাক্সটা নিয়ে বসলো।

এই ছদ্মবেশে ধারনের ছোট বাক্সটা মেঘনাদ যেখানেই যায় সঙ্গে রাখে। ওর মতে ইনভেস্টিগেশনের পক্ষে এ জিনিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আজকাল অপরাধীদের অপরাধ কর্মের কৌশল এবং পদ্ধতি যেমন পালটেছে তেমনই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে গোয়েন্দাকেও তার পদ্ধতি বদলাতে হবে।

এরই মধ্যে মেঘনাদ তার ছদ্মবেশ ধারণ করে ফেললো।

এখন ওকে দেখলে কে বলবে ও পুরীর মন্দিরের একজন পাণ্ডা নয়? একমুখ দাড়ি, মাথায় টিকি গলায় মোটা পৈতে, পরনে একটা থান ধুতি—খুঁট কাঁধ পর্যন্ত জড়ান।

বললাম,—হ্যাঁরে এই অবেলায় এই চেহারা নিয়ে কোথায় বেরুচ্ছিস?

—ঘুরে এসে বলবো। আমার দেরি দেখলে তুই খেয়ে নিস অর্ণব। আমার জন্যে ভাবিস নি।

বলতে বলতে একটা পান মুখে গুঁজে পুরীর পাণ্ডা হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরলো অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক বাদে।

অপেক্ষা করতে করতে খিদে পেয়ে গিয়েছিল। একাই খেয়ে নেব কি না ভাবছি হঠাৎ রিসেপশান থেকে ফোন করলো।

—অর্ণববাবু?

—বলুন?

—আপনি কি কোন পাণ্ডাকে হোটেলে এসে দেখা করতে বলেছিলেন?

—পাণ্ডা! এক সেকেণ্ড অবাক হয়েই হেসে ফেললাম। বুঝলাম মেঘনাদ রিসেপশানের মেয়েটির সঙ্গে রসিকতা করেছে। বললাম,—হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।

একটু বাদেই মেঘনাদ তার ঘরে এসে ঢুকলো। মাথা থেকে টিকি খুলতে খুলতে বললো, —এ হোটেলের রিসেপশানিস্ট যখন আমার ছদ্মবেশ বুঝতে পারেনি

তখন বুঝতে হবে পরীক্ষায় আমি উৎরে গেছি, কি বল অর্ণব?

বললাম—তুই হোটেল থেকে বেরুবার সময় ও তোকে দেখেনি।

—না, তাই তো মজাটা করলাম। মেঘনাদ হাসতে হাসতে বললো।

বললাম, ওসব কথা ছাড়, এতক্ষণ কোথায় ছিলিস তাই বল?

—তার আগে চল খেয়ে আসি। খিদেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত জ্বলছে।

সত্যি! অনেক বেলা হলো। আর এসব জায়গায় এসে ক্ষিদেটা বেড়েই যায়।

খাওয়া দাওয়া সেরে হোটেলের ঘরে মুখোমুখি বসলাম। তারপর বললাম, —এবার বল?

—গিয়েছিলাম থানায়। মেঘনাদ গাল চুলকোতে চুলকোতে বললো, ইনসপেক্টর মোহান্তির সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম।

কি ব্যবস্থা পাকা করে এলা সে প্রসঙ্গে প্রথমে না গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, —ডাম্বেলের ব্যাপারটা বলেছিস?

—নিশ্চয়ই। আমার যেতে আর একটু দেরি হলে উনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন ওই পোড়ো বাড়িতে গিয়ে তল্লাসী চালাবার জন্যে।

—তারপর?

—তাবপর আমার মুখে সব শুনে উনি বললেন, তাহলে বলুন এ অবস্থায় কি করা যায়? আমি বললাম, তার আগে আপনাকে ওই পোড়ো বাড়িটাতে গতকাল রাত থেকে গোপনে নজর রাখার জন্য স্পাই পোস্টিং করতে বলেছিলাম ' সে কি রিপোর্ট দিয়েছে বলুন?

—ইনসপেক্টর মোহান্তি কি বললেন?

—উনি যা শোনালেন তা আরও সাংঘাতিক।

—কেন, কি হয়েছে?

এবার মেঘনাদ ইনসপেক্টর মোহান্তির মুখে এ ব্যাপারে যা শুনে এসেছে তাই বলতে শুরু করলো ঃ

মদন নামে একজন পুলিশ কনসটেবলকে নাকি ইনসপেক্টর মোহান্তি পাঠিয়েছিলেন ছদ্মবেশে থেকে বাড়িটা নজর রাখতে। তা ছদ্মবেশ ধারণ করলো একজন কুষ্ঠ রুগীর।

—কুষ্ঠ রুগী?

—হ্যাঁ। তুই তো জানিস অর্ণব, পুরীতে, কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা খুব বেশী। এর কাবণ কি জানিস?

—কি কারণ?

—কারণ এটা একটা প্রচলিত বিশ্বাস পুরীর সমুদ্রতীর কুষ্ঠ রোগীদের রোগ নিরাময়ের অনুকূল স্থান, আর এর পেছনে বৈজ্ঞানিক কাবণ যাই থাক, আছে একটি পৌরানিক কাহিনী।

—কি পৌরানিক কাহিনী মেঘনাদ?

—কাহিনীটা এক কথায় হলো একবার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র শাম্বের কোন এক

গর্হিত আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন শাম্ব কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হবে। এরপর পিতার শাপে শাম্ব যখন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তখন পিতা কৃষ্ণ বলেছিলেন একমাত্র সূর্যদেবের আশীর্বাদেই সে রোগ মুক্ত হতে পারে। তখন শাম্ব চলে এসেছিল পূর্ব ভারতে। আজ যেখানে পুরীর নিকটবর্তী কোনারকের সূর্যমন্দির, এক সময়ে সেখানেই নাকি সমুদ্রতীরে শাম্ব দিনের পর দিন সূর্যস্তব করে অবশেষে সূর্যদেবকে প্রসন্ন করেন এবং কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হন।

—এর পেছনে কিন্তু রূপক আকারে একটা বৈজ্ঞানিক কারণও দেখা যাচ্ছে মেঘনাদ। আজকাল বিজ্ঞানীরা বলেন সূর্যালোকের মধ্যে যে অতি বেগুনী রশ্মি আছে তা আমাদের শরীরে ভিটামিন 'ডি' উৎপাদন করে। এটা আমাদের শরীরের ত্বকের পক্ষে খুবই উপকারী। হয়তো পুরীর মতো সমুদ্র অঞ্চলে সূর্যালোকের অতি বেগুনী রশ্মি কুষ্ঠের মতো রোগ প্রতিরোধে অনুকূল।

—সে যাই হোক, মেঘনাদ আবার প্রসঙ্গে ফেরে, গোয়েন্দা মদন গত রাতেই একজন কুষ্ঠ রোগী সেজে সেই পোড়োবাড়ির সামনের রাস্তাটায় বসে পড়লো। কিন্তু একটা ভুল সে করলো, যে ভুলের মাশুল তাকে দিতে হলো কড়ায় গণ্ডায়।

—কি ভুল?

—যেসব কুষ্ঠ রোগী পুরীতে ভিক্ষে করে, তারা সাধারণতঃ বসে মন্দিরের রাস্তায় অথবা সমুদ্রের ধারে। বসতি এলাকায় বসে তাদের ভিক্ষে করতে দেখা যায় না।

—ঠিক কথা।

—এই ভুলটা করেছিল বলেই মদন এখনও মাথায়, বুকে, পিঠে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে থানার মালখানা ঘরে শুয়ে আছে।

—কি হয়েছে বলবি তো?

—তাহলে শোন, মেঘনাদ এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে : মদন তো ভিখিরি কুষ্ঠ রোগী সেজে পোড়ো বাড়ির সামনের রাস্তাটায় বসে পড়লো। ধীরে ধীরে অন্ধকার জমাট বাঁধলো। রাত নিশুতি হয়ে এল। আসলে জায়গাটা অনেকটা নির্জন তাই এ সময়ে পুরীর অন্যত্র রাত অতটা বেড়েছে মনে না হলেও এখানে নেমে এল গভীর রাতের স্তব্ধতা। মদন চুপচাপ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কতক্ষণ এ অবস্থায় বসেছিল ওর মনে নেই। হঠাৎ ও শুনলো পেছন থেকে দু'জোড়া পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

—দু'জোড়া পদশব্দ?

—হ্যাঁ। মদন ফিরে দেখলো দুজন লোক পাশাপাশি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে লোক দুটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবে দুজনেই বেশ লম্বা-চওড়া।

কেন কে জানে মদনের ভয় ভয় করতে লাগলো। তবু কুষ্ঠ রোগী সাজা হাত দুটো তুলে সে মুখস্থ করা কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে চললো—'কটা পয়সা দাও

সায়েব। ভগবান তোমার ভাল করবে সায়েব।'

লোকদুটো মদনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। তারপর ওদের মধ্যে একজন তার চওড়া হাতের পাঞ্জায় মদনের গলাটা চেপে এক হ্যাঁচকায় দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর উর্দু মেশানো হিন্দিতে যা বললো, তার অর্থ—খুব চালাকি করেছিস। তবে এসব কুঁচো চালাকিতে আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারবি না। পাশের লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলেছে,—'বস, বল তো এ ব্যাটাকে একেবারে সাবাড় করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আসি?' উত্তরে প্রথম লোকটি বললে, এসব 'চূহা' মেরে হাত 'গন্ধি' করে লাভ নেই। বলে মদনের গলায় একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ফেলে দিল বেশ কিছুটা দূরে। সেই আঘাতেই সারারাত পথের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মদন। তারপর যখন ওর জ্ঞান ফিরেছে, দেখে সকাল হয়ে গেছে। মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে অসম্ভব ব্যথা। ওর গোয়েন্দাগিরির শখ তখন একেবারেই মিটে গেছে। কোন রকমে থানায় ফিরে ফার্স্ট-এড্ নিয়ে এখন শুয়ে আছে।

মেঘনাদের মুখে সব শুনে আমি বললাম, —মেঘনাদ, এরপরও কি তুই বলবি ওই পোড়ো বাড়িতে তল্লাশী চালাবার দরকার নেই। ওখানে যে ক্রিমিনালরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তার প্রমাণ তো আজই আমরা হাতে নাতে পেয়েছি। দিনে দিনে ওদের সাহস আরও বেড়ে চলেছে।

—ওদের সাহস সত্যি বেড়ে চলেছে অর্ণব। কারণ ওরা মনে করে ওদের দুষ্কৃত কর্মের সহযোগীর অভাব এদেশে হবে না।

—তাহলে তুই কি করতে চাস?

—আমি ওদের ছাড়বো না। যারা দেশের শত্রু তারা আমারও শত্রু। আজ আমি ইনসপেক্টর মোহান্তির সঙ্গে আমাদের যা কিছু করণীয় তা আলোচনা করে এসেছি।

—সেটা কি আমি জনতে পারি?

—নিশ্চয়ই। তবে তার জন্যে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। মেঘনাদ চুপ করলো। তখনও ভাবতে পারি নি, সেদিন রাতে কী ভয়ানক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

॥ এগারো ॥
(এক রাশ কালো ধোঁয়া)

সারাদিন মেঘনাদ আর কিছু বলেনি। দু-চারবার প্রসঙ্গটা তুলবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই ও কেমন এড়িয়ে গেছে। দুপুরে খাওয়দাওয়া সারলাম। বিকেলে সি বিচে বেড়ালাম। সমুদ্রের বুকে সেই ট্রলারটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। সন্ধেব পর দু'জনে হোটেলে ফিরে নানা বিষয়ে আড্ডা দিলাম। তারপর ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। মেঘনাদ অবশ্য বিছানায় উঠল না। জানলার ধারে ক্রাইম থ্রিলারটা নিয়ে বসল।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল মেঘনাদের ডাকে ঃ —ওঠো, অর্ণব। সময় হয়েছে। বেরোতে হবে।

হাতঘড়িতে দেখলাম, রাত বারোটা। মেঘনাদের পরনে কালো রঙের শার্ট-প্যান্ট। পায়ে রাবার সোলের জুতো। হাতে টর্চ, পকেটেও রিভলভার আছে।

আমি জানি মেঘনাদ এখন কোথায় যাবে। বললাম,—এত রাতে হোটেল থেকে বেরনো যাবে তো?

—হ্যাঁ, বলা আছে। সংক্ষেপে বলল মেঘনাদ।

মধ্যরাতে পুরীর সমুদ্রতীর ফাঁকা। এ-জায়গাটায় বিশেষ আলো নেই। তবে যেটুকু চাঁদের অলো পড়েছে সেই হালকা জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউগুলো গর্জন করে চলেছে।

আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে কখনও-কখনও দূর থেকে ভেসে আসছে রাতজাগা কুকুরের কান্না।

ওই তো সেই বাড়িটা। যেন ঘোর সুষুপ্তির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

এ-পর্যন্ত মেঘনাদের সঙ্গে একটা কথা বলারও সুযোগ পাইনি, এখন কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাব, হঠাৎ পেছনে খসখস শব্দ।

পিছু ফিরতেই আগন্তুককে চিনতে পারলাম।

ইনসপেক্টর মোহান্তি।

ওঁর পরনে অবশ্য এখন পুলিশের পোশাক নেই। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। তবু ইনসপেক্টর মোহান্তিকে চিনতে ভুল হল না।

—মিঃ মোহান্তি, সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ, মেঘনাদবাবু। সারা বাড়ি ঘিরে রয়েছে পুলিশের লোক, মেঘনাদের কথার উত্তরে ইনসপেক্টর মোহান্তি চাপা গলায় বললেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত তো সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি। আপনি কি স্থির নিশ্চিত যে...

ইনসপেক্টর মোহান্তির কথা শেষ হল না, মেঘনাদ বলল,—ওই দেখুন...!

মেঘনাদের কথামতো আমিও দৃষ্টি ফেরালাম।

উত্তরের রাস্তাটা ধরে দূর থেকে দুটো আলোর বৃত্ত, সেই সঙ্গে একটা মৃদু যান্ত্রিক শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

—মনে হচ্ছে একটা গাড়ি আসছে। ইনসপেক্টর মোহান্তি অন্ধকারে দৃষ্টিটাকে স্থির করে বললেন, কিন্তু এত রাতে সমুদ্রের ধারে গাড়ির কী প্রয়োজন? ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে।

—এর পর আরও অনেক রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে পারে ইনসপেক্টর মোহান্তি। আপনি প্রস্তুত থাকুন।

—হ্যাঁ, আমরা সবাই প্রস্তুত। গুড লাক।

ইনস্পেক্টর মোহান্তির শরীরটা অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

মেঘনাদ বলল,—অর্ণব আয়, আমরা গেটের ওই মোটা থামটার আড়ালে

দাঁড়াই। এখানেই নাটকটা জমবে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে গাড়িটা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। হালকা জ্যোৎস্নায় যেটুকু বোঝা যাচ্ছে ওটা একটা মারুতি ভ্যান।

মেঘনাদ চাপা গলায় বলল, —ওদিকে দ্যাখো অর্ণব।

ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য দৃশ্য। ভাঙা বাড়ির দোতলার একটা ঘরের খোলা জানলায় আলো দুলছে। মনে হয় কেউ একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক করে কাউকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।

ওদিকে গাড়ি থেমে গেল। ততক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি অনেকটা সয়ে এসেছে। তাই বুঝতে অসুবিধা হল না মারুতি ভ্যানের দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে এল।

গেটের থামের আড়ালে আমরা সবাই অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

লোকটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ও কি আমাদের দেখতে পেয়েছে? মেঘনাদ কী ভাবছে জানি না, আমি কিন্তু বেশ নার্ভাস বোধ করছি। বুকের ধকধক শব্দটা যেন হাতুড়ির মতো নিজের কানেই বাজছে।

হঠাৎ মেঘনাদ পাঁজরে একটা খোঁচা দিল। আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠতাম। যাই হোক, অবস্থাটা সামলে চোখ ফেরালাম। যা দেখলাম তা আরও রহস্যময় ব্যাপার।

একটা কালো ট্রাঙ্ক মাথায় চাপিয়ে একজন লোক ছায়ার মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওই বাড়িটার মধ্যে থেকে। গাড়ির আগন্তুক ততক্ষণে আমাদের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

ওদিকে ট্রাঙ্ক মাথায় লোকটির পিছু-পিছু আরও একজন বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকারে তার ঢ্যাঙা চেহারা ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না।

দু'পক্ষ মুখোমুখি হতে গাড়ির আগন্তুকের চাপা কণ্ঠস্বর শুনলাম—শশী, সব ঠিক আছে তো?

—সব ঠিক আছে বস। লেকিন পেছনে টিকটিকি লেগেছে মালুম হচ্ছে।

—টিকিটিকি! গাড়ির আগন্তুকের কণ্ঠে একটা রুক্ষতা ফুটে উঠল।

—হ্যাঁ বস। আজই জিনিসপত্র ডেলিভারি না হলে প্রবলেম হয়ে যাবে, বলতে-বলতে সে পাশের ট্রাঙ্কধারীকে বলল, অ্যাই, জিনিসপত্র সব গাড়িতে তুলে দে।

সে ট্রাঙ্ক নিয়ে একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মারুতি ভ্যানের দিকে চলে গেল।

ততক্ষণে বাড়ির ভেতর থেকে একই রকম ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে আর একজন বেরিয়ে এসেছে। শশী শ্রীবাস্তবের ইঙ্গিতে সেও জিনিসপত্র পৌঁছতে গেল মারুতি ভ্যানের মধ্যে। এর মধ্যে আরও একজন লোক আর একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে বেরোচ্ছে সেই রহস্যময় বাড়ি থেকে।

—কটা বাক্স আছে? গাড়ির আগন্তুক চাপা স্বরে প্রশ্ন করল।

যা অর্ডার ছিল। পুরো পাঁচ বাক্স। সব জিনিস আমি নিজে মিলিয়ে নিয়েছি বস।

ততক্ষণে পঞ্চম বাক্সটি নিয়ে বাহক বেরিয়ে এসেছে বাড়িটার ভেতর থেকে। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায় গাড়িটার কাছে। গাড়ির পেছনের খোলা ডালার ভেতর আগের চারটি বাক্সের ওপর এটিও সাজিয়ে রাখে, তারপর সেগুলোর ওপর একটা প্লাস্টিক শিট ঢাকা দিয়ে ডালা বন্ধ করে দেয়। নাটের গুরু দু'জনও তখন গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা গাড়িতে উঠে চম্পট দেবে।

কিন্তু তার আগেই নাটকের দৃশ্যপট বদলে গেল।

আমার পাশ থেকে যেন একটি ক্ষিপ্ত চিতার মতো ছিটকে গেল মেঘনাদ। আমি কিছু বোঝার আগেই গাড়ির আগন্তুকের পেছনে পৌঁছে তার পিঠে রিভলভারে নলটা ঠেকিয়ে বাঁ হাতে পকেট থেকে হুইস্‌ল বের করে ফুঁ দিল—ফু...র...র...র...।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই মধ্যরাতের অন্ধকার ফুঁড়ে আশপাশ থেকে জ্বলে উঠল প্রায় একডজন পাঁচ ব্যাটারির আলো। ইনস্পেক্টর মোহান্তির বাহিনী বন্দুক হাতে পজিশন নিয়ে সেই মারুতি ভ্যান ঘিরে দাঁড়াল। ততক্ষণে আমিও পৌঁছে গেছি মেঘনাদের পাশে। মেঘনাদ আমার দিকে একটুও দৃকপাত না করে একই ভাবে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, —তোমাদের খেলা শেষ। শশী শ্রীবাস্তব, তোমার লোকজনদের বলো কোনরকম চালাকির চেষ্টা যেন না করে। তাহলে তোমাদের সবক'টা বডি লাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

হঠাৎ কানের কাছে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল—দু... ম্...।

আমরা ভাবলাম বুঝি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আতঙ্কে ছিট্‌কে গেল সকলে। কিন্তু, কোন জীবন হানি হয়নি। এটা একটা 'স্মোক বম্ব্'।

দুষ্কৃতীদের মধ্যে থেকে কেউ একজন এটা আছড়ে ফাটিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে কুল কুল করে ছড়িয়ে পড়েছে কালো ধোঁয়া। একে অন্ধকার রাত্রি তার ওপর কালো ধোঁয়ার আস্তরণ—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে সব কিছু ঢেকে গেল। আমরা আব কিছুই দেখতে পারছি না।

এই অবস্থায় অসহায়ের মতো কয়েক মিনিট আমরা সবাই শুধু দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলাম। ইনসপেক্টর মোহান্তি বৃথাই 'পাকড়ো পাকড়ো' হেঁকে চললেন।

এরপর ধোঁয়া যখন কিছুটা সরলো আমরা দেখলাম মাল সমেত গাড়ি মজুত থাকলেও দুষ্কৃতীদের একজনও নেই। ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করে ওরা সবাই চম্পট দিয়েছে।

হায় হায় করে উঠলেন ইনসপেক্টর মোহান্তি, মিঃ ভরদ্বাজ। এত করেও লোকগুলোকে ধরতে পারলাম না। ব্যাটারা একেবারে চোখে ধুলো,' সরি ধোঁয়া দিয়ে পালিয়ে গেল।

আমি বললাম,—ওদের ভাণ্ডার তো ওরা ফেলে গেছে। মনে হচ্ছে এ-সবের মধ্যে একটা সূত্র পেয়ে যাবেন।

—না, হঠাৎ মেঘনাদ গর্জে উঠলো। বেশীদূর ওরা এখনও যেতে পারেনি। চলুন, আমরা ফলো করি।

—কিন্তু ওরা কোনদিকে গেছে বুঝবেন কি করে মিঃ ভরদ্বাজ? এই অন্ধকার রাতে...

—আমি অনুমান করতে পারছি। আসুন আমার সঙ্গে।

মেঘনাদকে অনুসরণ করে পুলিশ ফোর্স রওনা হলো। তার আগে অবশ্য তাদের ফেলে যাওয়া বামাল সঠিকভাবে বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা হলো।

॥ বারো ॥
(পণ্ডশ্রম?)

সমুদ্রেব ধারে এসে খুবই তৎপরতার সঙ্গে একটা মোটর বোট জোগাড় করে ফেললেন ইনসপেক্টর মোহান্তি। তারপর আমি, মেঘনাদ এবং ইনসপেক্টর মোহান্তি তাঁব জনাতিনেক সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে উঠে পড়লেন সেই মোটর বোটে।

মেঘনাদের নির্দেশ মতো মোটর বোট ছুটে চললো সমুদ্রের ভেতরে।

খুব বেশী ভেতরে অবশ্য যেতে হলো না এবং আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই হলো। মোটর বোটের এখন্‌কার গন্তব্য সমুদ্রে যে মাছধরা ট্রলারটা দাঁড়িয়েছিল সেটাই। ট্রলারটা এখনও ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকে ভাসমান এক বিশাল কচ্ছপের মতো।

আমি মেঘানাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুই কি নিশ্চিত যে শশী শ্রীবাস্তবের দল এখন ওই ট্রলারের গিয়ে লুকিয়ে রয়েছে?

মেঘনাদ অন্ধকারের মধ্যেও তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল। আমার কথায় ও কোন জবাব দিল না।

ইনস্পেক্টর মোহান্তি তাঁর সশস্ত্র পুলিশদেব নিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে রেডি হয়েই ছিলেন। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না।

ধীরে ধীরে ট্রলারটা মোটর বোটের ফোকাসের মধ্যে এসে গেল।

আমাদের মোটর বোটের ইঞ্জিনের শব্দ এবং সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই।

মেঘনাদ বললো, —ইনস্পেক্টর মোহান্তি. মোটর বোটটা ট্রলারের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড় করান।

ইনসপেক্টর মোহান্তি বললেন, ব্যাপারটা একটু রিস্‌ক হয়ে যাবে না মিঃ ভবদ্বাজ? হযতো ওরা আমাদেব জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে। সামনে গেলেই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমার মনে হলো ইনস্পেক্টর মোহান্তি তাঁর পুলিশি বুদ্ধিতে সঠিক অনুমান করেছেন। ওইসব ধূর্ত ক্রিমিনালদের অসাধ্য বলে কিছু নেই। ওরা ছল চাতুরীতেও ওস্তাদ।

মেঘনাদ কিন্তু ইনসপেক্টর মোহান্তির সঙ্গে একমত হলো না। বললো, এটুকু

রিস্‌ক আমাদের নিতেই হবে ইনসপেক্টর মোহান্তি। তাছাড়া আমাদের সবার হাতেই অস্ত্র আছে।

এরপর আর কথা চলে না। মোটর বোট সেই ট্রলারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তবু কোন বাধা এল না। ট্রলারের কাছ থেকে ইনস্পেক্টর মোহান্তি তাঁর সঙ্গী পুলিশদের নিয়ে ট্রলারের ভেতরটা ভাল করে দেখলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন,—কিছু নেই। আমাদের এতক্ষণ পণ্ডশ্রম হলো। আমি আগেই জানতাম ওরা ওখান থেকে এখানে পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকতে পারে না। কারণ ওদের মতো ক্রিমিনালরা নিশ্চয় জানে এই ট্রলারেও পুলিশের নজর আছে এবং পুলিশ এসে এটা তল্লাশী চালাবে। ইনস্পেক্টর মোহান্তির কথাবার্তার সুরে ওঁকে এবার বেশ বিরক্ত বলেই মনে হলো। ওঁর বিরক্তি অবশ্য মোটেই অকারণ বলা যায় না। রাত দুপুরে এত দৌড় ঝাঁপ করেও যদি ক্রিমিনালের টিকি ছোঁয়া না যায়...।

আমি বললাম, এ অবস্থায় আপনি কি চান?

—আমার তো মনে হয় এ সময়ে আগে স্থলপথগুলো বন্ধ করা দরকার ছিল।

—তাতে কোন লাভ হতো না ইনস্পেক্টর মোহান্তি, মেঘনাদ ওঁর কথা শেষ হবার আগেই বললো, পুলিশের দৌড় ওরা জানে। কোন পথে পুলিশ ওঁদের খোঁজ করবে সে অনুমান ওরা করতে পারে। তাছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে ওভাবে পালানোটাও সম্ভব নয়।

—তবে কি আপনার ধারণা ওরা লাইফবোট নিয়ে এখনও সমুদ্রেই ভেসে রয়েছে? ইনস্পেক্টর মোহান্তির কণ্ঠস্বরে এবার কিছুটা ব্যঙ্গই ফুটলো।

মেঘনাদ ইনসপেক্টরের সে কথার জবাব না দিয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললো, আমাকে আর একটু সময় দিন। আমাদের তল্লাশী এখনও শেষ হয় নি।

সমুদ্রে আলোর ফোকাস ফেলতে ফেলতে আমাদের মোটর বোটটা এখন চরকিপাক খাচ্ছে।

এ এক অসাধারণ দৃশ্য। সাধারণ ভ্রমণ বিলাসীদের পক্ষে এ দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব নয়। গভীর রাতে গভীর সমুদ্রের মধ্য থেকে সমুদ্র দর্শণ চতুর্দিকের অন্ধকারের মধ্যে পিছলে যাচ্ছে আমাদের মোটর বোটের আলোর ফোকাস। এই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে এক একটা মাছ।

কিন্তু কি খুঁজছে মেঘনাদ? এই গভীর সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিরালা। তবে কি ইনস্পেক্টর মোহান্তির অনুমানই সঠিক? আমরা বৃথাই পণ্ডশ্রম করছি। ক্রিমিনালরা পালিয়েছে স্থলপথ ধরে!

ইনস্পেক্টর মোহান্তির অধৈর্য কণ্ঠস্বর কানে এল, —মিঃ ভরদ্বাজ। আর নয়। অনেকক্ষণ আমরা খোঁজাখুঁজি করেছি। এখানে ওদের পাওয়া যাবে না। মনে হচ্ছে এ যাত্রা ওদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্রের ভাণ্ডার নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর সে সবের মধ্যে যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়...

—ইনসপেক্টর মোহান্তি, দেখুন তো দূরে একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে। আলোর

ফোকাসটা ওদিকে একবার ভাল ভাবে ফেলুন তো।

মেঘনাদ যে দিকটা নির্দেশ করলো, ওই দূরত্বে আলো ফোকাস ঠিক মতো পৌঁছোয় না।

সুতরাং মোটর বোটের মুখ ঘুরলো সেই দিকে।

কিছুটা এগুতেই আলো ফোকাসের মধ্যে এসে পড়লো জিনিসটা। এবং তখনই বোঝা গেল ওটা একটা জেলে ডিঙ্গি।

—জেলে ডিঙ্গি। মেঘনাদ ভ্রু কুঁচকালো ঃ আমি যতদূর জানি জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধবতে বেরোয় শেষ রাত্তিরে অথবা সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু এখন তো মাঝ রাত্তির।

—সবাই কি আর অত নিয়ম মেনে চলে মিঃ ভরদ্বাজ। ইনস্পেক্টর মোহান্তি বললেন।

—নিযম না মানাটাই তো সন্দেহজনক। চলুন, ডিঙিটা আমি একবার দেখতে চাই।

॥তেরো॥
(বুনো ওল—বাঘা তেঁতুল)

জেলে ডিঙির পাশে আমাদের মোটর বোটটা দাঁড়াল।

ইনস্পেক্টর মোহান্তি বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন। একটা মাছ ধরার নৌকার মধ্যে জনা তিনেক নিরীহ ধরনের লোক। দেখতে স্থানীয় নুলিয়াদেরই মতো।

লোকগুলো মোটর বোট দেখেই ভয়ে জড়সড মনে হলো।

ইনস্পেক্টর মোহান্তি তবু ওদের একটা পুলিশি ধমক দিয়ে উড়িয়া ভাষায় বললেন,—এ্যই, এই মাঝ রাত্তিরে তোরা এখানে কি করছিস?

ওদের একজন হাতজোড় করে উড়িয়াতেই উত্তর দিল,—মাছ ধরতে বেরিয়েছি গো সায়েব।

—এ সময়ে কেন? এত রাতে তো তোমরা বেরোও না।

—রাতের বেলা না বেরুলে বেশী ভেতরে যাওয়া যায় না গো সায়েব। সমুদ্রের জল এখন ক্রমেই নোংরা হয়ে যাচ্ছে। বেশী মাছ আর তীরের কাছাকাছি পাওয়া যায় না।

কথাটার মধ্যে বোধহয় যুক্তি আছে। 'ওয়াটার পলিউশন' কথাটা আজকাল খুব ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ যেমন নিজের আকাঙ্ক্ষা এবং লোভ মেটাচ্ছে, গাছপালা নষ্ট করে ভূভাগের পরিবেশ আর আবহাওয়াকে ক্রমেই বিযাক্ত করে তুলছে, তেমনই ভূভাগের যাবতীয় জঞ্জাল এবং ক্ষতিকর কেমিক্যাল ক্রমাগত সমুদ্রে নিক্ষেপ করে সমুদ্রের জলকেও করছে বিষাক্ত। এর জন্য প্রচুর সামুদ্রিক মাছ মরতে শুরু

করেছে এবং এই সব দূষণ যেহেতু সমুদ্র কিনারেই সবচেয়ে বেশী তাই মাছেরা ও আর সমুদ্রের ধারে·বেশী আসতে চায় না। এর ফলেও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

—এ্যই, তোদের ডিঙ্গির ভেতরে ওটা কে শুয়ে রয়েছে রে।

অকস্মাৎ মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

সত্যি তো। জেলে ডিঙ্গির ভেতরে পাটাতনের ওপর কে একজন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে।

—ও আমার খুড়ো সায়েব। ওদের মধ্যে একজন হাত জোড় করে বললোঃ সন্ধে থেকে জ্বর। আজ রাতে বেরুতে বারণ করেছিলাম সায়েব, কিন্তু শোনে নি। তারপর ডিঙ্গিতে উঠে জ্বর বেড়েছে। আর বসে থাকতে পারেনি।

—ওকে একবার উঠে বসতে বল তো। মেঘনাদ বেশ কড়া গলায় বললো।

লোকটি শুয়ে থাকা লোকটির কানে কানে কি বললো। সেও কি যেন উত্তর দিল। এবার লোকটি কাঁচুমাচু গলায় বললো,—খুড়ো মাথা তুলতে পারছে না সায়েব। জ্বর বোধ হয় বেড়েছে। মাথায় যন্ত্রণাও হচ্ছে।

ওর কথা শেষ হবার আগেই মেঘনাদ গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে সেই ডিঙ্গি নৌকোটার ওপর। ওর হাতে উদ্যত রিভলবার।

আর তখুনি ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর পট পরিবর্তন।

মেঘনাদ যখন সেই ডিঙ্গি নৌকোয় নামলো, ততক্ষণে সেই গুটি সুঁটি মেরে শুয়ে থাকা 'অসুস্থ খুড়োমশাই' উঠে বসেছে। তার হাতে উঠে এসেছে A.K 47-এর মতো সর্বাধুনিক এক আগ্নেয়াস্ত্র। সেটা সে সরাসরি তাক করে ধরেছে মেঘনাদের দিকে। এরপর চোস্ত হিন্দিতে ও যা বললো তার অর্থ ঃ হাতের ওই সেকেলে রিভলভাটা ফেলে এবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক বন্ধু। এতক্ষণে তোমার বাহাদুরি শেষ। আবার আমার খেলা শুরু।

বলতে বলতে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। তার রুক্ষ চওড়া মুখ। হিংস্র চোখের দৃষ্টি, মাথা জোড়া টাক। কপালের ওপর একটা 'আব' শিং এর মতো উঁচু হয়ে রয়েছে।

ও মানুষকে চিনতে ভুল হবার নয়—শশী শ্রীবাস্তব। দেশ বিরোধী, বিরোধীচক্রের এজেন্ট।

—ইনস্পেক্টর মোহান্তি, আমি পাঁচ গোনার মধ্যে যদি আপনারা ওই মোটর বোট ছেড়ে এই জেলে ডিঙ্গিতে উঠে না আসেন তবে আমি সর্বপ্রথম এই টিকটিকিটাকে শেষ করবো, তারপর আপনাদের কাউকে রেহাই দেব না।

—কি চাও তুমি? ইনস্পেক্টর মোহান্তি গর্জন করে উঠলেন।

—কি চাই! অকস্মাৎ হা হা করে হেসে উঠলো শশী শ্রীবাস্তব। তার সে ভীষণ হাস্যরবে কেঁপে উঠলো অন্ধকার সামুদ্রিক প্রকৃতি। হাসি থামলে শশী শ্রীবাস্তব বললো,—এটাও বুঝলে না আহম্মক? তোমাদের এই ডিঙ্গিটায় নামিয়ে দিয়ে আমরা তোমাদের মোটর বোটে উঠে চম্পট দেবো। আর সঙ্গে নিয়ে যাব এই টিকটিকিটাকে। এর লাশ তোমরা পাবে আগামীকাল সকালে পুরীর সমুদ্রতটে—যদি না অবশ্য তার আগেই সমুদ্রের মাছরা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলে।

বলতে বলতে আবার বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো শশী শ্রীবাস্তব। এবার তার কুৎসিত হাসিতে যোগ দিল তার চ্যালারাও। এতক্ষণে তাদের হাতেও এক একটা বন্দুক উঠে এসেছে।

রীতিমত ভয়ঙ্কর পরিবেশ। ঘটনা যে এভাবে হঠাৎ অন্যদিকে মোড় নেবে তা একটু আগে আমরা কেউ ভাবতে পারি নি। শশী শ্রীবাস্তবের এক চ্যালা তখন গুনতে শুরু করেছে এক... দো... তিন... চার...!

—দাঁড়াও! হঠাৎ ওই অবস্থার মধ্যেও চেঁচিয়ে উঠলো মেঘনাদ,—তোমরা যা ভেবেছ তা হতে পারে না। কারণ মোটর বোটের ওই পাঁচজন এই ছোট্ট ডিঙ্গিতে এসে নামলেই এ ডিঙ্গি ভার সইতে পারবে না। তোমরা ডিঙ্গি ছেড়ে মোটর বোটে ওঠার আগেই এ ডিঙ্গি সমুদ্রে ডুবে যাবে। তখন একসঙ্গে সকলেরই সলিল সমাধি।

হঠাৎ থমকে গেল শশী শ্রীবাস্তব। মনে হলো মেঘনাদের যুক্তিটা তার মনে ধরেছে। সত্যি তো এই ছোট্ট জেলে ডিঙ্গির দশজন লোক বইবার ক্ষমতা কোথায়?

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড ভেবেই উপায় বার করে ফেললো শশী শ্রীবাস্তব। বললো, ঠিক আছে মোটরবোট থেকে একজন করে এই নামবে তার বদলে একজন জেলে ডিঙ্গি থেকে মোটর বোটে উঠবে। তাহলে আর বেশী ভার পড়বে না। বলতে বলতে শশী তার একজন সাকরেদকে উদ্দেশ্য করে বললো, —নুরুদ্দিন?

—ইয়েস বস?

—বহুত হুঁশিয়ার থাকবি। এরা একটু চালাকির চেষ্টা করলেই সব কটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিবি। অবশ্য সবচেয়ে আগে আমার হাতে মরবে এই পালের গোদাটা।

—ও. কে বস।

নুরুদ্দিন আর তার সঙ্গীরা হাতের বন্দুক আরও শক্ত করে তাক করে রইলো আমাদের দিকে। কে বলবে একটু আগেই এই লোকগুলো নীরিহ জেলের ভূমিকায় নিঃখুত অভিনয় করেছে।

আমাদের রীতিমত অসহায় অবস্থা। এমন পরিস্থিতিতে বোধকরি কখনও পড়িনি। ইনস্পেক্টর মোহান্তি দেখলাম দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা অনবরত কামড়াচ্ছেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সারা মুখে। ওঁর সঙ্গী সশস্ত্র পুলিশ তিনজনও অসহায়ের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা জানে এ অবস্থায় কোনরকম বীরত্ব দেখাতে যাওয়ার অর্থ মেঘনাদ ভরদ্বাজকে নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া।

কিন্তু নিশ্চৎ মৃত্যুর মুখেই তো দাঁড়িয়ে আছে মেঘনাদ। শশী শ্রীবাস্তবের A. K. 47 রাইফেলের নলটা মেঘনাদের পিঠে ঠেকানো।

মোটর বোটর আলো এবং ফোকাসে এখন সমস্ত স্থানটা দৃশ্যমান। মেঘনাদের মুখের দিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য ভাবলেশহীন ওর মুখটা। ওর কি মৃত্যুভয় নেই, নাকি আসন্ন পরিণতির কথা টের পাচ্ছে না? যদি ওদের দাবী মেনে এই মোটর বোট ওদের হাতে তুলেও দেয়া হয় তবু মেঘনাদকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়ে ওরা ওকে খুন করবে। আর ওদের কথা মানলে আমরা সবাই একসঙ্গে

মরবো।

এমন ভয়ানক বিপদে জীবনে কখনও পড়েছি মনে পড়ে না।

—এ্যই, সবাই হাতের বন্দুক ফেলে দাও, শশী শ্রীবাস্তব আবার গর্জন করে উঠলো। নইলে এক্ষুনি এই লোকটাকে গুলি করে মারবো।

মোটর বোটে আমরা সবাই হাতে বন্দুক নামিয়ে রাখলাম। এ অবস্থায় অসহায় ভাবে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় কি!

—তোরা আমার অনেক লোকসান করে দিয়েছিস, শশী শ্রীবাস্তবের কণ্ঠস্বর সাপের মতো হিস্ হিস্ করে উঠলো, পাঁচ পাঁচ পেটি মাল ফেলে আসতে হয়েছে। সব কিছুর মূলে এই টিকটিকিটা। একে আমি দু দুবার হুঁশিয়ার করেছিলাম। কিন্তু কথা শোনে নি। এবার এর লাশ হয়ে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

মেঘনাদ কোন কথা বলছে না। ও কি চুপচাপ মৃত্যুর প্রহর গুনছে?

—নুরুদ্দিন, তুই পাঁচ গোন। তার মধ্যে ইনস্পেক্টর মোহান্তি এই ডিঙ্গিতে চলে না এলে...!

কিন্তু নুরুদ্দিনকে আব গণনা শুরু করতে হলো না তার আগে ইনস্পেক্টর মোহান্তি আমাদের মোটর বোট থেকে ডিঙ্গিটায় লাফিয়ে নামতে গেলেন। জানি না ভয়ে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ইনস্পেক্টর মোহান্তির লাফটা একটু জোরে হয়েছিল, আর তার ফলে ছোট ডিঙ্গি নৌকাটা সজোরে দুলে উঠলো।

আর ওইটুকু সময়ই মেঘনাদের কাছে যথেষ্ট

শশী শ্রীবাস্তবের মুহূর্তের অসাবধানতা আর টালমাটালের সুযোগে মেঁঘনাদ 'ঝাপৎ' করে লাফিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মোটর বোটের আলো আর ফোকাসটা কেউ একজন বুদ্ধি করো নিভিয়ে দিল।

যাকে বলে নিশ্চিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল দিক চরাচর। কে যে কোথায় আছে কিছুই বোঝা গেল না।

মেঘনাদের এই হঠাৎ আচরণে যাকে বলে বিভ্রান্ত হয়ে গেল শশী শ্রীবাস্তবের দল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওরা অন্ধকারের মধ্যেই এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করলো।

—র‍্যাট্...ট্যা...ট্যা...ট্যা...

আমরা তার আগেই মোটর বোটের পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়েছি। টের পেলাম আমাদের মাথায় ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক খুলি উড়ে গেল। কে জানে কেন মোটর বোট লক্ষ করে ওরা গুলি চালায় নি—সম্ভবত মোটর বোট সমুদ্রের ডুবে গেল ওদের পালাবার পথ বন্ধ হবে ভেবেই।

কয়েক মিনিট এভাবে এক তরফা গুলি চললো।

তারপরই হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর শুনলাম ঃ

—শশী শ্রীবাস্তব। আবার খেলার দানটা ঘুরে গেছে। এক্ষুনি তোমার হাতের অস্ত্রটা জলে ফেলে দাও। সাগরেদদেরও তাই করতে বল। দেরি করলে আমি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। আমার হাতের রিভলভাবটা তোমাব মতে সেকেলে হলেও জান নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়। আমি পাঁচ গুনছি—এক... দুই...

POLICE

দপ করে আমাদের মোটর বোটের আলোটা কেউ একজন জ্বালিয়ে দিল।

সেই আলোতে মাথা তুলে দেখি মেঘনাদ কখন নিঃশব্দে অন্ধকারে ওই ডিঙ্গি নৌকোয় পেছন থেকে উঠে এসেছে। ওর হাতের রিভলভারটা শশী শ্রীবাস্তবের কপালে ঠেকানো।

মেঘনাদ গুনে চলেছে — তিন... চার... পাঁচ...

সাকরেদদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো শশী,—হাতিয়ার ফেলে দাও।

ওরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো।

আর তখনই নজর পড়লো আমাদের মোটর বোটের ড্রাইভার কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে ইনস্পেক্টর মোহান্তি। সময় মতো আলোর ফোকাসটা উনিই জ্বেলেছেন। মেঘনাদের মতো ওর পোশাক থেকেও জল ঝরছে।

অর্থাৎ মেঘনাদের মতো সেই মুহূর্তে উনিও সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে শত্রু-পক্ষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন।

যেমন বুনো ওল—তেমনি বাঘা তেঁতুল!

॥চোদ্দ॥

('মেঘনাদ আঙ্কেল, তুমি গ্রেট')

ঘটনার পরদিন কথা হচ্ছিল সুব্রত দত্তের হলিডে হোমের ঘরে বসে।

আগের দিন রাতে দুষ্কৃতীদের পুরো দলটা ধরা পড়েছে। শশী শ্রীবাস্তব স্বীকার করেছে সে একজন বেআইনী অস্ত্র ব্যবসায়ী। ওর কাজ হলো বিদেশ থেকে মারাত্মক সব অস্ত্র চোরা পথে আমদানি করে এখানকার দেশবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠী বা চক্রের কাছে বিক্রি করা। ব্যাপারটা এবার সি. বি. আই তদন্ত করে দেখবে। শশী শ্রীবাস্তব সঙ্গে এমন কোন কোন গোষ্ঠী চক্রের যোগাযোগ আছে।

তবে আগের রাতে যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সব শুনে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ডাম্বেলের। সে বার বার বলছে,—উঃ গোয়েন্দা আঙ্কেল, এমন একটা থ্রিলিং কাণ্ডের মধ্যে আমি থাকতে পারলাম না! শশী শ্রীবাস্তব তোমার কপালে A.K 47-ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই অবস্থায় তুমি একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে যেভাবে উল্টোচাল দিয়ে তার কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে তাকে দিয়ে আত্মসমর্পণ করালে একাজ আমার ফেবারিট রহস্যভেদী মেঘনাদের পক্ষেই সম্ভব। তবে একটা আপশোষ কিন্তু আমার রয়েই গেল গোয়েন্দা আঙ্কেল।

—কি বল?

—এমনি একটা থ্রিলিং অপারেশনে তুমি তোমার এই জুনিয়ার এ্যাসিসটেন্টকে সঙ্গে নিলে না।

রিমা বললো,—তুই থাম পাকারাম। তুই সঙ্গে থাকলে অমন সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে গোয়েন্দা আঙ্কেল শশী শ্রীবাস্তবের মোকাবিলা করতে পারতেন? হয়তো ওই অবস্থায় তোর নিরাপত্তার কথা ভেবেই ওদেরই কাছে আত্মসমর্পণ করতে হতো।

—ঠিক কথা, সুব্রতবাবুও বললেন, — যা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল।

গতকাল গভীর রাতে আমরাও সমুদ্রের দিক থেকে প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ পেয়েছি।

তপতী দেবী যোগ করলেন, সারাটা রাত আমরা ঘুমোতে পারি নি। সবাই বলছিল এমন ঘটনা পুরীতে আগে কোনদিন ঘটেনি।

বললাম, মিসেস দত্ত, শুধু পুরী কেন, আজ সারা দেশই ওই সব ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদীদের মুখোমুখি। তবে এভাবে ওরা কোনদিন জিততে পারবে না।

মেঘনাদ বলল, তবে যাই বলুন আপনারা, এ রহস্যভেদের আসল কৃতিত্ব কিন্তু মাস্টার ডি. ডি. ওরফে আপনার পুত্র ডাম্বেলের। ও যদি না সমুদের বুকের সেই ট্রলারটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করত কিংবা পরদিন ভোরবেলা নিজের জীবন বিপন্ন করে ওই পোড়ো বাড়িটায় না ঢুকত...!

—ধন্যবাদ। মেঘনাদের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডাম্বেল গম্ভীরভাবে বলল,—আমি রহস্যভেদী মেঘনাদের জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু পালন করেছি মাত্র।

ডাম্বেলের কথার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। এর পর হাসতে-হাসতে মেঘনাদ ওর অ্যাটাচির মধ্যে থেকে একটা বাইনোকুলার বের করে ডাম্বেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাখো তো জুনিয়ার, এটা চিনতে পারো কি না?

এতক্ষণে ডাম্বেলের মুখে স্বাভাবিক ছেলেমানুষি হাসি ফুটল। বাইনোকুলারটা মেঘনাদের হাত থেকে প্রায় লুফে নিয়ে বলল, এই তো আমার সেই হারানো বাইনোকুলার। এটা কোথায় পেলে গোয়েন্দা আঙ্কেল?

—শশী শ্রীবাস্তবের ব্যাগের মধ্যে। শেষপর্যন্ত এটাও সে নিতে পারেনি।

ডাম্বেল বাইনোকুলারটা নিজের গলায় ঝুলিয়ে ডান হাতটা ওপরে ছুঁড়ে বলল,—মেঘনাদ আঙ্কেল, তুমি গ্রেট!

ভীমভেটকার ঘটোৎকচ

॥এক॥

(উথাল পাথাল ঢেউ)

ভীম গর্জন! সেই সঙ্গে সঙ্গে উথাল-পাথাল ঢেউ! না, এই মুহূর্তে আমি কোন সমুদ্রসৈকতে নেই। স্রেফ বসে রয়েছি বম্বে মেলের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের জানলার ধারে।

আমার পাশে মেঘনাদ এক বিদেশী থ্রিলারে ডুবে রয়েছে। আর সামনের আপার বার্থে কিছুক্ষণ যাবৎই শুরু হয়েছে নাসিকা গর্জন, সেই সঙ্গে ট্রেনের চাকার তালে তালে উথাল পাথাল হচ্ছে একটা ভুঁড়ি। সমুদ্রের ঢেউও বুঝি হার মানে তার কাছে।

বিশাল বপু ঐ লোকটির নাম বিশ্বনাথ চৌরাশিয়া। ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর ষাটেক। উনি কলকাতায় কালীমাতা দর্শণ করে বাড়ি ফিরছেন। বাড়ি ভূপাল।

লোয়ার বার্থে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন ওঁর স্ত্রী।

যেখানে প্রথম গিয়ে উঠবো নিউটাউনের চার ইমালিতে আমার এক পিসেমশায়ের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে আর কোথায় যেতে হবে এক্ষুণি বলা সম্ভব নয়। হঠাৎ ভূপালে কেন? বিশেষতঃ যাত্রাপথে আমার সঙ্গী হিসেবে যখন স্বনামধন্য রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ, তখন প্রশ্নটা উঠতেই পারে।

তাহলে দিন পাঁচছয় আগে থেকে প্রসঙ্গটা শুরু করতে হয়। সেদিন সকালে হঠাৎ ফোনে মেঘনাদের জরুরী তলব পেলাম—অর্ণব এক্ষুণি চলে আয়।

নিশ্চয়ই কোথায় কোন জট পাকিয়েছে। বেলতলা রোডে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি মেঘনাদ ওর ঘরে টেবিলের ওপর একগাদা কাগজপত্তরের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—কি ব্যাপার বন্ধু, হঠাৎ তলব কেন?

উত্তরে কোন কথা না বলে কাগজের একটা কাটিং ও আমার দিকে এগিয়ে দিল।

পড়ে দেখলাম, 'বিচিত্র সংবাদ' জাতীয় একটা খবর। খবরটা যেমন অদ্ভুত, তেমনই রহস্যময়। যা লেখা আছে তা হলো —

ভীমভেটকায় ঘটোৎকচের আবির্ভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভূপাল থেকে ৫৩ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে ভীমভেটকা নামে যে গুহা পর্বত অঞ্চল আছে দশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে, সেইসব গুহায় ছড়ানো রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র। সম্প্রতি সেখানে এক অদ্ভুত রহস্যের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। দানবাকৃতি এক বিশাল জীবকে নাকি ভীমভেটকার সেই পার্বত্য অঞ্চলের আনাচে কানাচে দেখা যাচ্ছে। মানুষ কিংবা জীবজন্তু কাউকেই সে রেহাই দেয় না। ইতিমধ্যে জনা কয়েক ট্যুরিস্ট প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র দেখার বাসনায় সেখানে গিয়ে সেই অদ্ভুত দানবাকৃতি জীবের দেখা পেয়েছে বলে দাবী করেছে। তারা কোনক্রমে সেই দানবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ফিরে এসে তার বর্ণনাও দিয়েছে। বর্ণনাগুলিব মধ্যে মোটামুটি মিলও আছে। বিশাল দানবাকৃতি চেহারা। কপালে একটামাত্র চোখ জ্বলে নাকি ভাঁটার মতো। স্থানীয় লোকজনের মতে ঐ ভয়ঙ্কর দানব মহাভারতে উল্লিখিত ভীমপুত্র ঘটোৎকচ। এর মাতা রাক্ষসী হিড়িম্বা। কিন্তু এত যুগ বাদে সে হঠাৎ জেগে উঠলো কেন তাই নিয়ে নানামহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সরকারীসূত্রে অবশ্য এ রহস্যের সমর্থন মেলেনি। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস কিছু লোকের কুসংস্কার ছাড়া এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য নেই।

তবে ব্যাপারটা যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুক ঘটোৎকচের কথা ইতিমধ্যেই স্থানীয় অধিবাসী এবং ট্যুরিস্ট মহলে ছড়িয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেকেই আর ও এলাকায় পা দিতে সাহস পাচ্ছে না।

পড়া শেষ করে মেঘনাদকে বললাম, —ভূপালের কুষ্ঠি ঠিকুজিটা মনে হচ্ছে

কোন রাজজ্যোতিষিকে দেখান দরকার। এই তো কয়েক বছর আগে হঠাৎ গ্যাস লিক করে কয়েক হাজাব মানুষ মারা গেল, এবার সেখানে খোদ মহাভারতের রাক্ষস খোক্কস.. !

মেঘনাদ আমায় থামিয়ে দিয়ে বললো,—ফাজলামি রাখ। ভূপালে তোর এক পিসেমশাই আছেন বলেছিলি না?

—আজই ওঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দে। আগামী বৃহস্পতিবার ভূপাল পৌঁছে আমরা ওঁর অতিথি হব।

মেঘনাদের কথার ধরনই এরকম। একবার যদি মাথায় কোন পোকা নড়ে তখন আর ও অন্য কোন কথায় কান দেয় না। সে রহস্যের সমাধান না করে ওর শান্তি নেই। আর যেহেতু আমাকেই ও ওর জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করে তাই ওর সকল রহস্যভেদের কর্মে আমাকেই ওর সঙ্গী হতে দেয়। লোকে বলে শার্লক হোম্‌সের ওয়াটসন—তেমনি রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের অর্ণব সেন। অতএব পরের ব্যাপারগুলো একের পর এক হয়ে গেল। ভূপালের পিসেমশায়কে টেলিগ্রাম পাঠালাম। উনি জবাব দিলেন তারপর নির্দিষ্ট সময়ে উঠে বসলাম ভূপালগামী ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে।

এবার আমাদের সহযাত্রী বিশ্বনাথ চৌরাশিয়া দম্পতির কথা সেরে নিই।

আমরা ক্যুপেতে পা দেবার আগেই ওঁরা উঠে বসেছেন। কত্তা গিন্নী দুজনেই বিপুল দেহের অধিকারী। সঙ্গে বিশাল একটা বেডিং সুটকেশ ছাড়াও লাটবহর প্রচুর—কুঁজো থেকে শুরু কবে হাঁড়িকুড়ি কিছুই বাদ নেই। এমনকি দুটো হুকে নারকোল দড়ি বেঁধে তাতে ঝুলিযে ফেলেছেন শাড়ী জামা থেকে শুরু করে ময়লা তিলচিটে গামছাটা পর্যন্ত। ওঁদেব এসব লাটবহর রেখে আমাদের জন্য স্থান মিলেছে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র।

শুধু কি তাই, ট্রেন চলতে শুরু করার পর থেকেই শুরু হয়েছে ওঁদের খাদ্যপর্ব। বিরাট একটা টিফিন কেরিয়ার খুলে সীট ভর্তি কবে সাজিয়ে ফেলেছেন পুরী, লাড্ডু আর রাবড়ির হাঁড়ি। আমাদেরও অবশ্য ভদ্রতা করে সে ভোজনের ভাগী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেঘনাদের মতো পেটুকও সাড়া দিতে পারেনি।

খাওয়ার পাট চলার ফাঁকে ফাঁকেই চৌরাশিয়া কত্তা আলাপ পর্ব চালিয়ে গেলেন।

নিউটাউনে ওঁর মিঠাই দোকান আছে ‘চৌরাশিয়া সুইট সপ’।

কথায় কথায় নিজের দুঃখের কথাও জানিয়েছেন—একমাত্র ছেলে সুরেশ এখনও মানুষ হলো না। দিনরাত শুধু হিন্দি সিনেমা দেখে আর বম্বের সুপারস্টার হবার স্বপ্ন দেখে ঘুরে বেড়ায়। ২১/২২ বছর বয়স হলো, কিন্তু এখনো কোনও কাজকম্মে মন নেই। বলতে কি, ছেলের মতিগতি ফেরাতেই চৌরাশিয়া দম্পতি কলকাতায় গিয়েছিলেন ‘কালী মাইয়া’র পায়ে পূজা চড়াতে। একই সঙ্গে ভোজন পর্ব এবং বাক্য পর্ব শেষ করে চৌরাশিয়া দম্পতি যথারীতি শয্যা নিয়েছেন।

কিন্তু তার পরেরটাই মারাত্মক। কত্তামশায় ঘুমিয়ে যেভাবে আওয়াজ ছেড়ে

চলেছেন আমার চোখে রাতের ঘুম নামবে কি না সন্দেহ।

মেঘনাদ অবশ্য নির্বিকার। এই প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যেও ওযে কিভাবে এত মনোযোগ সহকারে বই পড়ছে কে জানে।

॥দুই॥
(ট্রেনের কামরায় 'ধর্মনাশ')

আমাদের এবারের ট্রেনে যাত্রায় যে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই তা পরদিন সকালেই টের পাওয়া গেল।

গতরাতে নাসিকা গর্জন শুনতে শুনতে বোধ হয় শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমটা ভাঙলো তুমুল হৈচৈ চেঁচামেচিতে। তাকিয়ে দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে।

আমাদের ক্যুপের মধ্যে যাকে বলে একটা যুদ্ধাবস্থা। ক্যুপের মধ্যে এসে ঢুকেছে এক জোড়া হিপি তরুণ-তরুণী। হিপি ছাড়া ওদের অন্য কিছু ভাবাই যায় না। কলকাতার পথে ঘাটে এদের আমরা আখচার দেখি। দুজনেরই শুকনো ফ্যাকাশে চেহারা। তা বলে রুগ্ন বলা যায় না। মাথার চুলে জট পড়েছে। সেখানে উকুনের বাসা থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। ছেলেটির পরণে প্যাণ্ট, বুকখোলা হাওয়াই শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল আর মেয়েটির পরণে ঢোলা পাঞ্জাবী, জিন্‌সের প্যাণ্ট।

ওদের নিয়ে ক্যুপের মধ্যে যাকে বলে তুলকালাম কাণ্ড চলছে।

—আরে ইধার মাৎ বৈঠো, ধরমনাশ.হো যায়েগা।

পরিত্রাহী চিৎকার করছেন চৌরাশিয়া গৃহিণী। তিনি তাঁর বিপুল দেহভার নিযে পুরো সিটটা জুড়ে শুয়ে পড়েছেন।

চৌরাশিয়া কত্তাও চিৎকার শুরু করেছেন,—দুসরা কোই কামরা মে যাইয়ে। ইয়ে সৎ যাত্রীকা কামরা হ্যায় বাবা।

হিপি-হিপিনী দুজন রীতিমত ভড়কেই গেছে। কিন্তু তাই বলে স্থানচ্যুত হবার কোন ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। তারা নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কিসব কথাবার্তা বলতে লাগলো।

কিন্তু চৌরাশিয়া দম্পতি ছাড়বার পাত্র নন। সৎ যাত্রীর ধর্ম রক্ষার দায় বড় দায়। তাঁরা পরিত্রাহী চিৎকার করেই চলেছেন।

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও মিট মিট করে হাসছে। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে বলেই বোধ হল।

আমার দিকে চোখাচোখি হতেই চোখ মটকালো। তারপর বৃদ্ধ চৌরাশিয়া কত্তার দিকে তাকিয়ে বললো, —আপনি কি জানেন, রেলের নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা এখানে ছ'জন বসে যেতে পারে। অতএব আইনতঃ আপনি ওদের চলে যেতে বলতে পারেন না। এরপর মেঘনাদ হিপি দুজনেব দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললো, —আপনারা আমার পাশে বসতে পারেন।

'থ্যাঙ্ক য়ু, থ্যাঙ্ক য়ু' বলে ওরা বসে পড়লো মেঘনাদের পাশে। সামনের কর্ত্রী তখন নাক টিপে উঠে বসেছেন। বোঝাই গেল সৎ তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে ম্লেচ্ছ হিপিদের এক ক্যুপেতে ভ্রমণ তিনি একবারেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। অথচ কোন উপায় নেই।

এদিকে ট্রেন আবার দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করেছে। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে দেখলাম, মেঘনাদ নতুন আগন্তুকদের সঙ্গে জোর আলাপ জুড়ে দিয়েছে।

তরুণটির নাম জেমস আর তরুণীটির নাম ডোরা। দুজনেরই বাড়ি নাকি আমেরিকার কালিফর্ণিয়ায়। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে, বললো এদিকে চলেছে খাজুরাহ দেখবে বলে। সাতনায় নেমে খাজুরাহ যাবে। তারপর ফিরবে দিল্লীতে।

ওরা আমাদের গন্তব্য জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু মেঘনাদ ভূপালের কথা বেমালুম চেপে গেল। বললো,—আমরা যাচ্ছি জব্বলপুর। মার্বেল রক দেখবো।

মার্বেল বক! হাউ বিউটিফুল।—ডোরা বলে উঠলো।

বেলা তিনটে নাগাদ ওরা সাতনায় নেমে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চৌরাশিয়া দম্পতি।

তারপর ট্রেনটা ছাড়তেই মেঘনাদ হঠাৎ সেই হিপিদের বসার জায়গাটা থেকে আবিস্কার করলো এক টুকরো কাগজ। তাতে কেবলমাত্র লেখা ঃ

"ডঃ ফ্রেডরিক সাইমন
ভীমভেটকা
এম, পি, ইণ্ডিয়া।'

এই টুকরো কাগজটা সম্ভবতঃ হিপি দুজনের কোনও একজনের পকেট বা ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে। তবে যে ওরা বললো খাজুরাহ হয়ে সোজা দিল্লী চলে যাবে! এর অর্থ কি?

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ওর ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেছে। আপনমনেই বললো—মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে।

মেঘনাদ কি কোন রহস্যের গন্ধ পেয়েছে? জানি এখন প্রশ্ন করে মেঘনাদের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে না। তবে মেঘনাদের এ ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী সময়ে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল—কিন্তু যেভাবে মিলেছিল আমি বাজী রেখে বলতে পারি মেঘনাদ এসময়ে তা কল্পনাও করতে পারে নি।

সে কথা পরে।

।।তিন।।
(পিসেমশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ)

ট্রেন ঠিক সময়েই ভূপাল পৌঁছলো। পিসেমশাই প্লাটফর্মেই অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন থেকে নামতেই দেখা হয়ে গেল। ওঁর সঙ্গে মেঘনাদের পরিচয় করে দিলাম। আমার এই পিসেমশায় মানুষটি খুব ভাল। যেমন স্নেহবৎসল তেমনি সরল স্বভাবের। মেঘনাদকে উনি রীতিমত হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এই প্রথম দেখা

হয়েও যেন কতদিনের আলাপ।

পরিচয়পর্ব শেষ করে আমরা অটোরিক্সায় গিয়ে উঠলাম।

ভূপাল স্টেশনটি ওল্ড সিটিতে। আমরা যাব নিউ টাউনে। অটোরিক্সা চলতে শুরু করলো। আমরা শহর দেখতে দেখতে চলেছি।

ড্রাইভারের পাশে বসে পিসেমশাই হঠাৎ বললেন,—বুঝলে অর্ণব ভায়া, এতদিন বাদে ভূপাল এলে, কিন্তু যে সময়টা বেছে এলে তা মোটেই ভাল নয়।

প্রসঙ্গতঃ আমরা এখানে যে ভীমভেটকার ঘটোৎকচ রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এমন কথা পিসেমশায়কে ঘুণাক্ষরেও বলিনি। শুধুমাত্র বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসার কথাটাই শুনিয়েছি। মেঘনাদের এমনই নির্দেশ ছিল।

এখন পিসেমশাই এর কথার উত্তরে আমি কিছু বলার আগেই মেঘনাদ বললো—আপনি কি ভীমভেটকার ঘটোৎকচের কথা বলছেন?

তুমিও শুনেছ বুঝি গুজবটা? ব্যাপারটা নিয়ে তো এ তল্লাটে খুব আলোড়ন চলছে। পুলিশ অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চায়। তবু বিশ্বাস করার লোকেরও অভাব নেই। বেশ একটা আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে বলতে পার।—বলতে বলতে একটু থেমে পিসেমশাই বললেন ঃ আমি সে কথা বলছিলাম না, আমি বলছিলাম সম্প্রতি এখানে আর এক উৎপাতের কথা।

—আর এক উৎপাত?

—হ্যাঁ।

কিন্তু পিসেমশাই-এর উত্তর আর শেষ হলো না, তার আগেই আমাদের অটোরিক্সা পৌঁছে গেছে পিসেমশাইয়ের কোয়ার্টারের দোর গোড়ায়।

দোতলার বারান্দায় পিসীমার পাশে দাঁড়িয়ে দুই পিসতুতো বোন বুবু আর সোনা হাত নাড়ছে। অগত্যা আপাততঃ প্রসঙ্গের সমাপ্তি।

কিন্তু "আর এক উৎপাত" কথাটা আমার মনের মধ্যে থেকেই গেল। কি বলতে চাইলেন পিসেমশাই।

সেটা জানলাম, একদিন পরে।

॥চার॥
(প্রবাসে বাঙ্গালী সজ্জন)

প্রথম দিনটা অবশ্য হৈ চৈ করে কেটে গেল। বেশ কিছুকাল বাদে পিসেমশাইয়ের বাড়ী এসেছি। সবাই মিলে আমাদের নিয়ে মেতে উঠলো।

পিসিমা রন্ধন পটু। সেদিন নিজের হাতেই নানারকম রান্না করলেন। তার মধ্যে বাঙ্গালী পদতো ছিলই মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় কিছু স্পেশাল রান্নাও বাদ যায়নি। আর মেঘনাদের মতো পেটুক, বলাই বাহুল্য, কব্জি ডুবিয়ে খেয়েছে। মেঘনাদের এ গুণটা বরাবরই আছে যে কোন জায়গাতেই মিশে যেতে পারে। এখানে এসে

একবেলার মধ্যে সে প্রমাণ নতুন করে পেলাম।

এখানে প্রথম দিনেই দুটো তথ্য জানা গেল, প্রথমটা বেশ ইন্টারেস্টিং। তা হলো কিছুদিন যাবৎ মানে ভীমভেটকায় ঘটোৎকচের প্রাদুর্ভাবের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে হঠাৎ নাকি 'ভীম পূজোর' হিড়িক শুরু হয়ে গেছে।

ভীম পূজো!—আমি অবাক হয়ে পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়েছি ঃ সেটা আবার কি?

—আর কিছু নয়, একটা দশাসই ভীমের মূর্তি বানিয়ে স্থানীয় লোকেরা পুজো করতে শুরু করেছে, যাতে মধ্যম পাণ্ডব তুষ্ট হয়ে পুত্রের উপদ্রব থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা করেন। পুরাণ মতে একদা ঐ এলাকাতেই তো ভীমসেন রাক্ষসী হিড়িম্বার সঙ্গে বসবাস করেছিলেন এবং পুত্র ঘটোৎকচ জন্ম হয়েছিল।

আমি অবাক হয়ে মেঘনাদের দিকে তাকাতে মেঘনাদ বললে,—ভীমপুজোর ব্যাপারটা অবশ্য বাংলায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূমে কিছু কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। এবার তাহলে এখানেও শুরু হয়েছে।

বলতে বলতে হেসে ফেলে মেঘনাদ।—আরে, ভয় থেকেই তো অনেক দেবদেবীর উদ্ভব।

—তা বটে।

দ্বিতীয় তথ্যটার সঙ্গে অবশ্য ঘটোৎকচের রহস্যের কোনও সম্পর্ক নেই, তবে আগন্তুক হিসেবে নিজেদের শরীর গতিকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

যে কথাটা এখানে আসার পথে পিসেমশাই বলতে গিয়েও বাধা পড়েছিল সে কথাটা হলো, দিনকয়েক যাবৎ এক অদ্ভুত জ্বর রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে ভূপালের আশেপাশে। জনাকয়েক মারা গেছে বলেও খবর এসেছে। এমনকি পিসেমশায়ের বাড়িতে দুবেলা কাজ করে যায় যে বৌটি তার কোলের ছেলেটিও মারা পড়েছে। দিন কয়েক পূর্বে।

রোগটি বড় অদ্ভুত ধরনের। প্রথম তিন/চার দিন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, তারপর শরীর হলুদবর্ণ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রুগীকে বাঁচান খুবই কঠিন হয়।

ডাক্তার বলছেন এ রোগের নাম নাকি 'ইয়লো ফিভার' বা পীত জ্বর। আমাদের দেশে এ জ্বরের প্রকোপ আগে দেখা গেছে কিনা ডাক্তারেরা কেউ বলতে পারেননি। হঠাৎ আবির্ভাব ঘটেছে রোগটার।

কথাটা শুনিয়ে পিসেমশাই বলছেন,—তাই তো বলছি ভায়া, এখানে বেড়াতে আসার সময়টা তোমরা ভাল বাছনি।

মেঘনাদ কিন্তু প্রতিটি কথা খুব মন দিয়ে শুনেছে। কোন জবাব দেয়নি। ওর মনের কথা বোঝা বোধকরি দেবতাদেরও অসাধ্য।

বিকেলের দিকে দুই পিসতুতো বোনকে নিয়ে ভূপাল শহরটা ঘুরতে বেরুলাম। পিসেমশাই জীপের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। এক চক্কর ঘুরে নিলাম এখানকার

পাহাড় চূড়ায় বিখ্যাত বিড়লা মন্দির, ভারতসভা ভবন, বিরাট এ্যাকোরিয়াম হাউসে।

ফেরার পথে বেঙ্গলী ক্লাবটাও ঘুরে এলাম। আমার পিসতুতো বোন বুবু আর সোনা এখানে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ওরা এখানকার কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। পরিবেশটা বেশ ভাল। মেঘনাদ অবশ্য এখানে ওর সঠিক আত্মপরিচয়টা দিল না।

এখানেই পরিচয় হল মিঃ সেন-এর সঙ্গে। উনি পুরাতত্ত্ববিদ। বয়স চল্লিশের মধ্যেই। কথায় কথায় ওঁর মুখে শুনলাম ভীমভেটকার প্রাগৈতিহাসিক কালের অরণ্য পবর্ত গুহার সেই সব আদিম গুহাচিত্রের কথা। দশ হাজার বছর আগে থেকে এক লক্ষ বছর আগের সেই সব গুহাবাসী মানুষদের আঁকা আশ্চর্য গুহাচিত্রগুলি আজও অক্ষত হয়ে রয়েছে। সেইসব প্রাচীন মানুষদের জীবনযাত্রাব পরিচয় পাবার জন্য ওগুলো মহামূল্য দলিল, সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে ভীমভেটকার ঘটোৎকচের রহস্যের কথাটাও ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু মনে হলো উনি যেন সযত্নে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। কারণ ঠিক বুঝলাম না।

যাই হোক্, সেদিন আর রাত না করে কোয়ার্টারে ফিরলাম। ততক্ষণে ভূপালের নিউ টাউনের সমস্ত আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

কোয়ার্টারের ছাদ থেকে সে এক মনোরম দৃশ্য—মনে হলো ওপরেব নক্ষত্রখচিত আকাশটাই বুঝি বা নেমে এসেছে শহরেব বুকে।

কিন্তু তখনও কি ভেবেছিলাম এই সুন্দর শহর থেকে মাত্র অর্ধশত কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আর একটা নাটক—তা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি লোমহর্ষক।

সে নাটকের রঙ্গমঞ্চে পদার্পণের সুযোগ ঘটে গেল মাত্র পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।

॥পাঁচ॥
(নিতান্ত দুঃসংবাদ)

দুপুরবেলা সাইট থেকে ফিরে খাওয়ার টেবিলে পিসেমশাই যে খবরটা দিলেন তা রীতিমত চমকপ্রদ। খবরটা পিসিমাকে শুনিয়ে বলছিলেন পিসেমশাই—শুনছো, নিউমার্কেটে তোমার প্রিয় মিষ্টির দোকান চৌরাশিয়া সুইট-এর সেই ভ্যাগাবণ্ড ছেলেটা, সুরেশ না কি যেন নাম, পুলিশ আজ তাকে ভোর রাতে এ্যারেস্ট করেছে খুনের অপরাধে।

আমি আর মেঘনাদ দুজনেই চমকে উঠি। 'চৌরাশিয়া সুইট সপ্' নামটার সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত। আর চৌরাশিয়া দম্পতির সঙ্গেতো আমাদের আলাপ হয়েছে আরো আগে, ট্রেনে এখানে আসার পথে সে সময় তাদের ছেলে সুরেশের মতিগতি সম্পর্কে চৌরাশিয়ার কত্তার খেদোক্তি শুনেছি। কিন্তু তাই বলে—!

মেঘনাদ বললো,—আপনি বিশ্বনাথ চৌরাশিয়ার ছেলের কথা বলছেন তো? কাকে খুন করেছে সে?

পিসেমশাই অবাক হয়ে বললেন।—তুমি তাদের চিনলে কি করে?

মেঘনাদ সংক্ষেপে সব জানাতেই পিসেমশাই বললেন,—লোকাল থানায় এক অটোরিক্সা চালক গত সন্ধ্যায় এসে জানিয়েছে সুরেশ চৌরাশিয়া গতকাল দুপুরবেলা দুজন হিপি ট্যুরিস্টকে গাইড হিসেবে সঙ্গে নিয়ে তার অটোরিক্সা চড়ে গিয়েছিল ভীমভেটকার অরণ্য পাহাড় এলাকায়। জঙ্গল থেকে একটু দূরে সে তার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল আর সুরেশ হিপি দুজনকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। ইতিমধ্যেই আকাশে মেঘ করে আসে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়। ঘণ্টাকয়েক বাদে হঠাৎ সুরেশ চৌরাশিয়া একা উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে এবং গাড়িতে উঠে বলে জলদি ফিরে চল। অটোরিক্সার ড্রাইভার হিপি দুজনের কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেও নাকি সঠিক উত্তর পায়নি। প্রতিবারই একই কথা বলেছে সুরেশ—ঘটোৎকচ দানব নাকি ধরে নিয়েছে ওই হিপি দুজনকে। পুলিশ সব শুনে মনে করেছে আসলে সুরেশ তাদের সেই অবণ্য গুহা রাজ্যে খুন করেছে টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেবাব জন্য। আর সে কারণেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে সুরেশকে।

সব শুনে মেঘনাদ বললো, —আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখানকার পুলিশ ভীমভেটকার ঘটোৎকচ আবির্ভাব কথাটা বিশ্বাস করে না।

পিসেমশায় খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাস তুলে বললেন,—সে তো আগেই বলেছি। পুলিশ নাকি বাবকয়েক জায়গাটাতে তল্লাশি চালিয়েছিল কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কিছু পায়নি। শেষ পর্যন্ত ওদের ধারণা হয়েছে সবটাই স্থানীয় লোকদের কুসংস্কাব কিংবা কোন মতলববাজের কাজ। অর্থাৎ শিগগির ওখানে ভীম বা ঘটোৎকচের নামের কোন একটি মন্দির বা আশ্রম বানানোর জন্য এক উদ্দেশ্যমূলক প্রচার আর কি! ইতিমধ্যে তো ভীমপূজো শুরু হয়ে গেছে।

মেঘনাথ বললো পুলিশের এমন ধারণার পেছনে কোন কারণ আছে কি না জানেন?

পিসেমশায় বললেন, —বিস্তারিত বলতে পারবো না, তবে শুনেছি এমন একটা প্রচারও নাকি হয়েছে যে আগের যে সাধুজী ভীমভেটকার কাছে পাহাড়ী গুহায় থাকতেন, তিনি নাকি নিয়মিত ভীম আর ভীমপুত্র ঘটোৎকচের পুজো করতেন। কিছুদিন হলো হঠাৎ তিনি মারা যান ফলে মন্দিরটা বন্ধ হয়ে যায় আর তারপর থেকেই এই উপদ্রব শুরু হয়েছে।

—অর্থাৎ নিয়মিত পূজো বন্ধ হবার পর থেকেই ঘটোৎকচ কুপিত, তাই তো? বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মেঘনাদ।

অর্থাৎ আমাদের এ আলোচনা এখনকার মতো শেষ। আর পরদিন থেকেই শুরু হলো মেঘনাদের আসল তৎপরতা।

বিচিত্র সে পথ।

॥ ছয় ॥
(মশা থেকে চৌরাশিয়া)

পরদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলে দেখি পূবদিকের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে।

মেঘনাদকে দেখলাম ওপাশের জানলাটার ধারে একটা চেয়ার টেনে বসে আপন মনে কি একটা বই পড়ছে।

আমি আস্তে আস্তে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বইটা 'মেডিকেল এণ্ড হেলথ এনসাইক্লোপিডিয়া।' অবাক হলাম। মেঘনাদের হঠাৎ ডাক্তারী বই খুলে বসার কি দরকার পড়লো।

মেঘনাদকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবো ভাবছি তার আগেই হঠাৎ ও বলে উঠলো,—এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছি।

—কি খুঁজছিস?

—মশাটার নাম।

—মশা!

—হ্যাঁ। এ্যালডিস অ্যাজিপটি (Aldes Aegypti)! ওরা সেই সংক্রামক ভাইরাস বয়ে নিয়ে গিয়ে যাকে কামড়ায় তারই রোগটা হয়। রীতিমত মারাত্মক রোগ। মড়ক পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে বললাম,—কি সব বলতে শুরু করলি মেঘনাদ?

মেঘনাদ বললো,—একটা কথাও আমার বানান নয়, সব এই মেডিকেল এনসাইক্লোপিডিয়া' বলছে। 'ইয়লো ফিভার' মানে যাকে তোরা পীত জ্বর বলিস তার আদি উৎপত্তি আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার ঘন বনাঞ্চলে। এ্যালডিস অ্যাজিপটি নামে এক ধরনের মশা ঐ রোগের ভাইরাস ছড়াতে সাহায্য করে, যেমন ম্যালেরিয়া ছড়ায় এ্যানোফিলিস আর গোদ ক্লিউলেক্স।

কিন্তু ভীমভেটকায় ঘটোৎকচ রহস্যের সমাধানের সঙ্গে এই মশাদের সম্পর্ক কি?

মেঘনাদ আমার হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে বললো আচ্ছা বলতে পারিস, আফ্রিকা আর আমেরিকার পীতজ্বর মশাগুলো হঠাৎ ভারতে এসে হাজির হয় কি ভাবে?

—কি ভাবে আর, আটলান্টিক পেরিয়ে স্রেফ দু'ডানায় ভড় করে...

কথাটা আমি নেহাতই মজা করে বললেও মেঘনাদ সহসা আমার পিঠ চাপড়ে বললো,—ঠিক বলেছিস অর্ণব।

মেঘনাদের কণ্ঠস্বর কিন্তু এ সময় রসিকতা আছে বলে মনে হলো না, এর পরই বই মুড়ে রেখে বললো,—অনেক হয়েছে। এবার চটপট তৈরী হয়ে নে। বেরুতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবি?

—থানায়, লকআপে সুরেশ চৌরাশিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হবে না?

একেই বলে মাথা খারাপ। মেঘনাদের কোন প্রসঙ্গের সঙ্গেই পরবর্তী কোন প্রসঙ্গের যোগ নেই—কোথায় মশা আর কোথায় সুরেশ চৌরাশিয়া।

মেঘনাদ তাড়া লাগালো—বী কুইক ফ্রেণ্ড। হাতে একদম সময় নেই।

অগত্যা!

॥ সাত ॥
(মেঘনাদ বনাম ঘুঘু)

থানায় ঢুকেই থমকাতে হলো।

অফিসার ইন্‌চার্জের ঘরের সামনে পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসে রয়েছেন চৌরাশিয়া দম্পতি।

এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কত্তাগিন্নীর চেহারায় যেন কালি পড়ে গেছে। বিশ্বনাথ চৌরাশিয়া অমন পাঁচ নম্বরী ফুটবল সাইজের ভুঁড়ি একেবারে চুপসে গেছে। খুবই স্বাভাবিক। ওঁদের একমাত্র ছেলে পুলিশ লকআপে রীতিমত মার্ডার চার্জে আটকে রয়েছে।

আমাদের দেখে তারা বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল কিন্তু মেঘনাদ ওদের কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঢুকে পড়লো অফিসার ইনচার্জের ঘরে।

অফিসার ইন্‌চার্জ ইন্সপেক্টর প্রকাশ দুয়ার রীতিমত দশাসই চেহারা। মেঘনাদ ওঁর কাছে আর নিজের সত্য পবিচয় লুকালো না। ইনস্পেক্টর দুয়া দেখলাম বেশ খোলামেলা স্বভাবের মানুষ। মেঘনাদের পরিচয় পেয়ে উনিতো উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন,—আমার কি সৌভাগ্য। আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি। তাছাড়া কলকাতাকে আমি ইণ্ডিয়ার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলেই মনে করি। সেখানকার প্রাইভেট ডিটেকটিভদের প্রতিও আমার মোস্ট রিগার্ড আছে।

মেঘনাদ হেসে বললো, —আমি কিন্তু ঠিক ডিটেকটিভ নই, বরং বলতে পারেন রহস্যভেদী।

এরপর মেঘনাদ তার আসার উদ্দেশ্য এবং ভীমভেটকার কিংবদন্তী সম্পর্কে ওর কৌতূহলের কথা জানিয়ে বললো,—আমি এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাই মিঃ দুয়া।

—অবশ্য, অবশ্য। ইনস্পেক্টর দুয়া বললেন। তারপর একটু থেমে বললেন, তবে কি জানেন পুরো ব্যাপাবটা আসলে বোগাস।

এরপর তিনি যে মতামত জানালেন তা আমরা আগেই শুনেছি পিসেমশাই-এর মুখে। পুলিশ এটাকে স্থানীয় কুসংস্কার এবং ভবিষ্যতে ঐ জায়গায় একটা মন্দির বানানোর পরিকল্পনা ছাড়া অন্যকিছু মনে করে না।

বললাম, কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় বর্তমানে ভীমভেটকায় ট্যুরিস্ট যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এটাতো ঠিক?

প্রকাশ দুয়া ঢোঁক গিলে বললেন—হ্যাঁ ওতো ঠিক, লেকিন...ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা এসে গিয়েছিল। মেঘনাদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, —আচ্ছা মিঃ দুয়া, আপনি তো সব বিশিষ্ট লোকদের চেনেন। মিঃ ফ্রেডরিক সাইমন নামে কোন বিদেশীর কথা এই চত্বরে শুনেছেন?

—ফ্রেডরিক সাইমন। একটু চিন্তা করলেন ইন্সপেক্টার প্রকাশ দুয়া তারপর বললেন,—না, ঐনামে এখানে কেউ আছে বলে তো শুনিনি। আপনি নামটা কোথায় পেলেন মি. ভরদ্বাজ?

—কে একজন বলেছিল, বলেই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে মেঘনাদ বললো,—আমরা একবার লকআপে সুরেশ চৌরাশিয়া ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে পারি?

স্পষ্ট দেখলাম দুয়ার ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল। একটু চুপ করে থেকেই বললেন, —দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ আপনি ঐ খুনে ছোকরাটা সম্পর্কে আমায় কোন রিকোয়েস্ট করবেন না প্লীজ।

মেঘনাদ বললো,—ও যে খুন কবেছে তাব কোন প্রমাণ আছে?

—অটোরিক্সা চালক নিজে থানায় এসে এজাহাব দিয়েছে। দুজন বিদেশী ট্যুরিস্টকে ভীমভেটকার জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ও আর ফিরিয়ে আনেনি। আমাদের কাছেও নানা আজগুবি কথা বলে নিজেব কুকর্ম ঢাকার চেষ্টা করেছে।

—আপনি কি ভীমভেটকার জঙ্গলে অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ পাঠিয়ে ছিলেন?

—নিশ্চয়ই। তবে সে কি আর একটুখানি জায়গা মিঃ ভরদ্বাজ। খুন করে কোন পাহাড়ের গুহা বা গর্তের মধ্যে ফেলে এলে কেউ কোনদিনও খুঁজে পাবে না।

—মেঘনাদ কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললো,—আমায় যদি একবার অন্ততঃ ছেলেটার সঙ্গে দেখা কবতে দেন সত্যিই বাধিত হবে।

চুপ করে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন মিঃ দুয়া। তারপর বললেন—একান্তই যদি চান আমি আপত্তি করবো না। চলুন আমি নিজেই যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। তবে জানবেন মিঃ ভরদ্বাজ ছেলেটা আস্ত ঘুঘু।

মেঘনাদ হেসে বললো—ঘুঘুর বাসা ভাঙতেই তো আমার আনন্দ।

॥ আট ॥
(ঘটোৎকচ দর্শন)

থানার লকআপের এক কোণে গুম হয়ে বসেছিল সুরেশ চৌরাশিয়া। বছর একুশ-বাইশ বয়স। ছিপছিপে। একমাথা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। পরণে রঙিন ব্যাগি শার্ট। জিন্সের প্যান্ট। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ অবিন্যস্ত। পুলিশের হেফাজতে এক রাত্তিরেই চোখের কোণে কালি পড়েছে।

লকআপের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে মেঘনাদ ওর সঙ্গে কথা বলার উদ্যোগ করতেই সুরেশ চিৎকার করে উঠলো,—আমি বলবো না, কিচ্ছু বলবো না। কেন বারবার আপনারা আমাকে বিরক্ত করছেন—আপনারা আমাকে জেলে ভরুন, ফাঁসি দিন, যা খুশি করুন।

ইনস্পেক্টর দুয়া ওকে ধমকে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মেঘনাদ তার আগেই বললো,—আমায় কথা বলতে দিন। ওর এভাবে ভেঙেপড়া অস্বাভাবিক তো কিছু নয়।

উত্তরে প্রকাশ দুয়া কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন বললেন না। এরপর মেঘনাদ সুরেশের সঙ্গে আলাপ শুরু করল। ওর এই কায়দার সঙ্গে আমার অবশ্য আগেই পরিচয় আছে। ঠিক সাপুড়ের মতোই বাঁশিতে সুর তুলে ও সাপ বশ করার কৌশল জানে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। মেঘনাদ কণ্ঠে আশ্চর্য মমতা এনে সুরেশকে নিজের পরিচয় ও ওর বাবার সঙ্গে ট্রেনে আলাপের সব বৃত্তান্তই জানাল। দেখলাম ক্রমে সুরেশের মুখের ভঙ্গি স্বাভাবিক হচ্ছে। ওর সেই উদ্ধত ভাবটা কাটতে শুরু করেছে।

এরপর সুরেশ শোনাতে শুরু করলো ওর অভিজ্ঞতার কথা। ট্রেনে চৌরাশিয়া কত্তা বেঠিক কিছু বলেননি। তাঁদের এই ছেলেটির মতিগতি সত্যিই বড় অস্থির। না হলে খামোখা ভীমভেটকার ট্যুরিস্ট গাইড হবার শখ হবে কেন।

ব্যাপারটা ঘটেছে গতকালই দুপুরে। ভূপাল স্টেশনে গিয়েছিল বম্বেগামী ট্রেনের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। কারণ কিছুদিন যাবতই ওর মনে হচ্ছিল এভাবে আর সময় নষ্ট না করে ও সরাসরি বোম্বেতেই পাড়ি দেবে। ওখানকার রূপালী পর্দার হিরো না হতে পারলে জীবনটাই বৃথা। ওর দোস্তরা তো উঠতে বসতে বলে, ওর চেহারা আর হাসির সঙ্গে বম্বের এক 'সুপারস্টার'-এর হুবহু মিল আছে। কিন্তু সেদিন স্টেশনে পা দিতে না দিতেই ঝামেলা বাধলো। তখুনি প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন এসেছিল আর ট্রেন থেকে নেমে একেবারে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল এক হিপি-হিপিনী।

জড়ান ইংরেজীতে ওরা যা বললো, তার অর্থ ওরা ভীমভেটকা দেখতে চায়। একজন গাইড দরকার।

সুরেশ প্রথমে ওদের সেখানে যেতে বারণ করলো। সেখানকার উৎপাতের কথাও বললো।

কিন্তু এসব শুনে ওরা দুজন হেসে উঠলো। ব্যাঙ্গ করে বললো নেটিভ ইণ্ডিয়ানরা এখনও কুসংস্কারের মধ্যে বাস করছে। তবে সুরেশ যদি গাইড হয় ওরা ভাল টাকা দেবে।

এবার লোভে পড়লো কারণ বম্বে গিয়ে 'সুপার স্টার' হবার খরচ বিস্তর। বাবার কাছ থেকে পাওয়া মুশকিল। অতএব এই মওকা সুরেশ ছাড়লো না।

একটা অটো রিক্সা ভাড়া করে সুরেশ হিপি-হিপিনীকে নিয়ে তখনই ভীমভেটকা যাত্রা করলো।

ওরা যখন যাত্রা করেছিল তখন ছিল পরিষ্কার আকাশ, ফুটফুটে দিনের আলো।

কিন্তু অটো রিক্সা ছেড়ে হিপি ট্যারিস্ট দুজনকে নিয়ে সুরেশ যখন ভীমভেটকার জঙ্গলে প্রবেশ করলো আকাশটা হঠাৎ মেঘলা হয়ে এল।

ট্যারিস্ট দুজনের যেন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা পাঁচ ব্যাটারী টর্চ ব্যাগ থেকে বের করে ওরা একটার পর একটা গুহা দেখতে শুরু করলো সেখানকার বিচিত্র গুহাচিত্রগুলি আর মাঝে মাঝে শুধু আওয়াজ তুলতে লাগলো—ওয়াণ্ডারফুল। মার্ভেলাস!

দেখতে দেখতে অনেক ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা। ইতিমধ্যে বৃষ্টিটা থামলেও দিনের আলো কমে এসেছে।

বিদেশী ট্যুরিস্ট দুজনের তখনও গুহা দেখে বেড়ানোর বিরাম নেই। প্রতিটি গুহার মধ্যে তারা আলো ফেলে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

এই সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। একটা বড় গুহার মধ্যে ঢুকে ওরা দুজন টর্চের আলো ফেলে কিসব দেখছে। গুহার ভেতরের দেওয়ালে কোন ছবি আঁকা নেই, তবু ওরা কি দেখছে সুবেশ বুঝতে পারে না।

হঠাৎ চমক ভাঙে ঘড় ঘড় শব্দে। সুরেশ পিছু ফিরে দেখে এক অদ্ভুত কাণ্ড। গুহার পেছনের পাথরটা সরে যাচ্ছে। খুলে যাচ্ছে এক সুড়ঙ্গেব মুখ। আর সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে এক বিকট দানব।

সুরেশ একপলকমাত্র দেখেছিল সেই ভীষণাকৃতি দানবটাকে। বিশাল কালো শরীব। ভাঁটার মতো চোখে যেন ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলছে। সে দৃষ্টি সুরেশের প্রতিই নিবদ্ধ।

দাঁড়ায়নি সুরেশ। প্রাণের দায় বড় দায়। সেই অবস্থায় সে যে কিভাবে ছুটতে ছুটতে ভীমভেটকার গুহা রাজ্যের বাইরে অপেক্ষমান অটো রিক্সায় চেপে বসেছিল তা আর এখন মনে করতে পারে না।

—আর সেই বিদেশী ট্যুরিস্ট দুজন। তাদের কি হলো? প্রশ্ন করেছিলাম।

—বলতে পারি না স্যার। প্রাণের ভয়ে তাদের দিকে তার আকাতে পারিনি। বোধহয় ঐ দানব ঘটোৎকচই ওদের ধরে নিয়ে গেছে সেই গুহার মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে বিকটভাবে ধমকে উঠলেন ইনস্পেক্টর দুয়া,—ব্যাটা, চালাকি করার জায়গা পাওনি। ট্যুরিস্ট দুজনকে খুন করে এসে আজগুবি বানানো হচ্ছে। পড়ুক দুবার গুঁতো, সব কথা বেরিয়ে যাবে।

এবারও মেঘনাদ ইনস্পেক্টরকে থামিয়ে দিয়ে বললো,—আচ্ছা মনে করে বলতো, যে দুজন হিপি-হিপিনী ট্যুরিস্ট তোমার সঙ্গে গিয়েছিল তাদের কারু নাম জেমস বা ডোরা কিনা?

একটু ভাবলো সুরেশ, তারপরই ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো,—আপনি কি করে জানলেন স্যার? ঠিকই তো। ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, জেমস আর ডোরা নামেই পরস্পরকে ডাকছিল।

তাকিয়ে দেখলাম ইনস্পেক্টর প্রকাশ দুয়ার দু চোখের দৃষ্টি এবার বিস্ময়ে বড়

হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদ ওঁর দিকে তাকিয়ে বললো,—ব্যাস আমার যা জানার শেষ হয়েছে। এবার আপনার ঘরে চলুন।

থানা থেকে ফেরার পথে মেঘনাদ জিজ্ঞেস করলো,—ইনস্পেক্টর দুয়াকে তোর কেমন লোক বলে মনে হলো বলতো?

—অফিসার ইন্‌চার্জ যেমন হয়। তবে ভদ্রলোক অনেক খবর টবর রাখে দেখলাম। তোর নামটাও ওঁর কাছে অপরিচিত নয়। বলতে বলতে একটু থেমে প্রশ্ন ক-বলাম,—সুরেশ চৌরাশিয়ার গল্প তুই বিশ্বাস করেছিলি?

—ফ্রেডরিক সাইমনকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এর উত্তর বলা সম্ভব নয়। মেঘনাদ কেমন হেঁয়ালী করেই বললো,—তবে ভীমভেটকায় হিপি-হিপিনী জেমস আর ডোরা যখন এসে পৌঁছেছে, আশা করি সাইমনকেও পাওয়া যাবে।

আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। এই দুজন হিপি ট্যারিস্ট যদি আমাদেব ট্রেনে দেখা সেই দুজন হয় তবে হঠাৎ ওদের এভাবে ভীমভেটকায় এসে নিরুদ্দেশ হওয়াটা অদ্ভুত বৈকি। বলাই বাহুল্য সুরেশের মত নিছক কল্পনাবিলাসী একটি ছেলে ওদের দুজনকে খুন করে লাশ পাচার করে এসেছে কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

ব্যাপারটা যাই হোক, থানা থেকে বেরুবার সময় চৌরাশিয়া দম্পতির সঙ্গে দেখা হলো, ওরা তখনও একইভাবে বসে রয়েছেন থানা অফিসারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সত্যি মায়া হয় ওদের মনের অবস্থার কথা ভেবে।

॥ নয় ॥
(দুর্ঘটনা না খুন)

মেঘনাদ বললো,—খবরটা শুনেছিস অর্ণব, সুরেশ চৌরাশিয়া খুন হয়েছে।

পিসেমশাই-এর ঘরে দুপুরবেলা দুই পিসতুতো বোন বুবু আর সোনার সঙ্গে ক্যারাম খেলছিলাম। মেঘনাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল থেকে 'রেড' গুটিটা ছিটকে বেরিয়ে গেল বোর্ডের বাইরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—সর্বনাশ, তুই বলছিস কি?

প্রসঙ্গতঃ, সুরেশকে গত কালই পুলিশ জামিনে ছেড়ে দেয়। ওর বাবা বিশ্বনাথ চৌরাশিয়া ছাড়াও এ ব্যাপারে মেঘনাদের হস্তক্ষেপ ছিল।

মেঘনাদ বাইরে বেরিয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে। মেঘনাদ বললো, ঘটনাটা একটু আগেই ঘটেছে নিউমার্কেটের সামনের রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনলাম সুরেশ একটা স্কুটার নিয়ে আসছিল, পেছনে থেকে একটা লরী রং সাইডে এসে ওকে একেবারে স্কুটার শুদ্ধ পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তায় এখনও স্থানীয় লোকের জটলা চলছে। পুলিশ এসে লাশ তুলে নিয়ে গেছে। আমি বললাম,—এতো দুর্ঘটনা। তুই খুন ভাবছিস কেন?

মেঘনাদ চোয়াল চেপে বললো,—আমার স্থির বিশ্বাস সুরেশকে মারবার জন্যই লরিটা ঐভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ওকে মেরে কার কি লাভ? সুরেশ কার স্বার্থ হানি করেছে? গতকাল ও জামিনে খালাস পেয়েছে তারপর গত রাতেই এসেছিল মেঘনাদের কাছে। অনেকক্ষণ যাবৎ কথা বলেছে ওর সঙ্গে।

মেঘনাদের গলা শুনে পিসেমশাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

পিসেমশাইকে দেখে মেঘনাদ বললো,—পিসেশমাই এখানকার এস. পি বিক্রম সিং-এর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে? আমি আজই ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

—এস, পি বিক্রম সিং-এর সঙ্গে আমার অবশ্য কিছুটা আলাপ আছে। বড় জবরদস্ত লোক। তা তোমার আবার তাকে কি দরকার ভায়া? সব শুনে পিসেমশাই বেশ বিচলিত হয়েই বললেন,—বেড়াতে এসেছ—খাও, দাও, ফূর্তি কর। সময়টা এখন এখানে খুবই খারাপ যাচ্ছে।

অতিথিদের নিয়ে পিসেমশাই-এর মত সরল সাদাসিধে মানুষের দুশ্চিন্তা নিশ্চয়ই অকারণ নয়। কিন্তু মেঘনাদের ধাত উনি চেনেন না। ওর মাথায় যখন পোকা নড়েছে শেষ পর্যন্ত না গিয়ে দাঁড়াবে না।

অতএব সেদিন সন্ধেবেলাই মেঘনাদ পিসেমশাই-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এল এখানকার এস. পি. বিক্রম সিং-এর সঙ্গে।

আর এদিন রাত্রেই আমাদের ঘরের খাটের ওপর চাদরের নিচে থেকে মেঘনাদ আচম্বিতে খুঁজে পেল পাহাড়ী বিচ্ছু।

দোতলার ঝকঝকে ফ্ল্যাটে শোবার ঘরে পাহাড়ী বিচ্ছু কি করে এল এ প্রশ্নটা যখন আমার মাথায় ঘুরছে। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর কানে এল,—আসল লড়াই এবার শুরু হলো অর্ণব।

লড়াই! কার সঙ্গে লড়াই? কে আমার শত্রুপক্ষ? এ সবই এখনও আমার কাছে গাড় অন্ধকারে ঢাকা।

॥ দশ ॥
(এবার আসল লড়াই)

এর পরের ঘটনাগুলো যেমন নাটকীয় তেমনি রোমাঞ্চকর। সেদিনের পঞ্জিকা মতে ভীম চতুর্দশী। ভূপাল এবং আশেপাশের বেশ কয়েক জায়গায় এবছর এ দিনটিতে ধূমধাম করেই ভীমপূজা হচ্ছে দেখলাম। যদিও এ উৎসব এককালে গ্রামীণ বাংলাতেই উদ্‌যাপিত হতো। কিন্তু আজ ভয়ের তাড়নায় মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরের বুকেও গদাধারী ভীমের মূর্তির পূজা শুরু হয়েছে।

পিসেমশাই-এর ফ্ল্যাটের সামনের খোলা মাঠটিতেও দেখলাম রীতিমত প্যাণ্ডেল বানিয়ে ভীমের মূর্তি বানান হয়েছে। অধিকন্তু সঙ্গে রয়েছে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ।

শিল্পীর কল্পনায় সে এক ভয়াবহ মূর্তি। হাঁড়ির মতো মাথা, ভাঁটার মতো চোখ, মূলোর মতো দাঁত আর গোদা হাত পা, মানষ যে কিভাবে ভয় থেকে দেবমূর্তির কল্পনা করতে পারে এই ঘটোৎকচ মূর্তিটাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গত দু'দিন যাবৎ মেঘনাদের খুব একটা পাত্তা পাচ্ছি না। ও যে কি কর্মে ব্যস্ত তা বোঝার উপায় নেই। আমি দূরের কথা, পিসেমশাই পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তর পাননি।

তবে একটা কথা মেঘনাদ ইতিমধ্যে বলেছে, ভীমভেটকার ঘটোৎকচ রহস্য নেহাৎ আজগুবি বা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবার নয়। এর পেছনে আছে কোন গভীরতর অভিসন্ধি। কার এবং কি অভিসন্ধি তা অবশ্য ওর মুখে শুনিনি, তবে কথাটা আমারও মনে ধরেছে। তবে একটা জিনিস এই সঙ্গে বুঝতে পারছি না, লোকাল পুলিশ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না কেন। এমনকি সুরেশ চৌরাশিয়ার মৃত্যুটাকে নিছক এ্যাকসিডেন্ট ছাড়া অন্য কিছু বলতে চাইছে না।

কিন্তু সত্যি কি সেটা এ্যাকসিডেন্ট? আর সেদিন রাত্রে দোতলার ঘরের মধ্যে যে পাহাড়ী বিষাক্ত বিচ্ছু পাওয়া গেল সেটাও কি নিজে থেকেই সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে বলতে হবে?

সেই হিপি-হিপিনিই বা ভীমভেটকা জঙ্গলে ঢুকে হারিয়ে গেল কেন? ফ্রেডারিক সাইমন কার নাম?

সব উত্তরগুলোই কেমন যেন অস্বচ্ছ, ধোঁয়াটে বলে বোধ হয়।

ইতিমধ্যে আর এক সমস্যা—সেই মারাত্মক পীতজ্বর ক্রমেই মহামারীর রূপ নিতে শুরু করেছে। সরকারী এবং বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে বেশ কিছু রুগী ভর্তি হয়েছে। মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। সরকারের টনক নড়েছে কিন্তু এর সঠিক চিকিৎসা এখানকার ডাক্তারদের করায়ত্ত নয়।

বিকেলবেলা চারইমলির মাঠে প্যাণ্ডেলের নিচে ভীম আর ঘটোৎকচের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, হঠাৎ পিঠে হাত পড়লো।

ফিরে তাকিয়ে দেখি মেঘনাদ। ওর চোখদুটো ঝকঝক করছে। বললো, —শুধু মূর্তির ধ্যান করে সত্যি সত্যি ঘটোৎকচের দেখা পেতে চাস?

—তার মানে?

—আগামীকাল সকালেই রেডি হয়ে নিস। আমরা ভীমভেটকায় যাব।

—আমরা বলতে কি শুধু তুই আর আমি?

—এর চেয়ে বেশী আপাততঃ জানতে চেও না বন্ধু।

॥ এগারো ॥
(ভীমপুত্র ঘটোৎকচ)

জঙ্গলে পা রাখার অভিজ্ঞতা এর আগে যে আমার হয়নি তা নয়—কিন্তু দিনের দুপুরে এমন শ্বাসরুদ্ধ স্তব্ধতার সম্মুখীন এর আগে কখনও হইনি।

মাত্র কিছুক্ষণ হলো ভীমভেটকার এই জঙ্গলে পা দিয়েছি আমি আর মেঘনাদ।

গতরাত্রেই মেঘনাদ তার এই ইচ্ছার কথাটা পিসেমশাইকে জানিয়েছিল। অবশ্য আসল কথাটা খুলে বলেনি। বলেছে ভীমভেটকার রক পেন্টিংস' দেখতে যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

পিসেমশাই এই কদিনে অন্ততঃ বুঝেছেন যে মেঘনাদ ভরদ্বাজকে কোন জেদ থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। তবু বলেছেন, একান্তই যদি যাও থানায় একটা খবর দিয়ে যেও, আর সঙ্গে...

সে ব্যাপারে আপনার কোন চিন্তা নেই পিসেমশাই। মেঘনাদ তার কোল্ট ৩৫ বোরের রিভালবারটা পকেট থেকে বার করে বলেছে এটা আমার সঙ্গে সব সময় মজুত থাকে।

এরপর পিসেমশাই-এর বাইকটা নিয়ে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ একেবারে ভোর বেলাতেই।

বেরুবার সময় আমি মেঘনাদকে না বলে পারিনি,—হ্যাঁরে ওটা যখন কোন শয়তানের ঘাঁটি বলেই মনে করিস, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হতো না?

মেঘনাদ তার সেই বিখ্যাত রহস্যময় হাসিটা হেসে বলছে,—বন্ধু, তুমি শুধু আমার ওপর ভরসা রাখ, তারপর এগিয়ে চল।

নিশ্চিত অবশ্য হতে পারিনি, তবে মেঘনাদের সঙ্গ ছাড়াও সম্ভব হয়নি।

আপাততঃ ভীমভেটকার অরণ্য পাহাড় রাজ্যে পা রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি।

রাক্ষস-খোক্ষসদের উপযুক্ত জায়গাই বটে। এই সাত সকালেও যেন গভীর রাত্রির স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

ভীমভেটকায় প্রাগৈতিহাসিক গুহারাজ্যে ঢোকার মুখেই রয়েছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক একটি বোর্ডে এই স্থান বিবরণী এবং কিছু নির্দেশিকা।

এসব কথা আমাদের আগেই জানা হয়ে গেছে। এখানকার জঙ্গলের পরিধি অন্ততঃপক্ষে দশ কিলোমিটার হবে। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোষের পিঠের মতো এক একটা পাহাড়।

ঠিক পাহাড় না বলে এক একটা পাথরের টিলাও বলা যায়। কোন কোনটাই অবশ্য খুবই বড়। এক একটা টিলার সামনের অংশটা কিছুটা এগিয়ে এসে ছাতার মতো হয়ে রয়েছে। সেগুলি এক একটি প্রাকৃতিক আবাসের মতোই। কিছু কিছু আবার গুহাও রয়েছে। এগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা নানা চিত্রাবলী।

সত্যিই অপূর্ব সেইসব গুহাচিত্র। শ্লেট পাথরের বুকে আদিমানবের অপটু হাতে আঁকা এইসব চিত্রে কোথায়ও শিকারের দৃশ্য, হরিণ ছুটছে, ষাঁড়, ঘোড়ার পিঠে বর্শাধারী মানুষ, আরও কত কি যে রয়েছে। মাঝে মাঝে তো মনে হয় আজকের কোন শিল্পীর আঁকা এ্যাবস্ট্রাক্ট রীতির চিত্ররূপ।

ভাবলেও অবাক হতে হয় দশহাজার থেকে এক লক্ষ বছর পূর্বে এখানে অবস্থানকারী গুহাবাসী আদিম মানবেরা এইসব ছবি এঁকে ছিল স্রেফ নরম পাথর ঘষে কিংবা জংলী পাতায় নির্যাস থেকে রং বানিয়ে—কিন্তু আজও অনেক ছবি অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা। যত ঢুকছি ততই যেন নৈঃশব্দ্য বুকের ওপর চেপে বসছে। মেঘনাদের হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। দিনকয়েক পূর্বে বৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন নিচু জায়গায় এখনও মাটি নরম হয়ে বসেছে। ও বোধ হয় কিছু খুঁজে চলেছে এখানকার মাটিতে। মাঝে মাঝে পাতা ঝবার শব্দে চমকে উঠতে হচ্ছে। এখানকার প্রকৃতি এমনই আশ্চর্য শব্দহীন।

মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা এক অভিশপ্ত এলাকায় ঢুকে পড়েছি। অশুভ আত্মা আব শক্তিরা আড়াল থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে প্রতি মুহূর্তে।

হঠাৎ মেঘনাদেব কণ্ঠস্বর শুনলাম, লুক হিয়ার অর্ণব।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি মেঘনাদ মাটির ওপর এক জায়গায় উজাড হয়ে কি যেন দেখছে।

তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে আমিও নিচু হলাম। এখানে মাটিতে এখনও কিছু ভেজা ভাব রয়েছে। তার মধ্যে অস্পষ্ট একটা ছাপ।

পায়ের ছাপ বলেই বোধ হচ্ছে। কিন্তু মানুষের পায়ের পাতা কি এক ফুট দৈর্ঘ্যের হতে পারে? অজান্তে মুখ ফসকে বেবিয়ে এল, ভীমভেটকার ঘটোৎকচের পায়ের ছাপ!

মেঘনাদ তখনও উপুড় হয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে চোখ দিয়ে মাটিটা পরীক্ষা কবছিল। আমার কথা শুনে বললো, শুধু ঘটোৎকচই নয় বন্ধু, এই সঙ্গে আধুনিক বুট জুতো, স্যাণ্ডেল এমনকি মেয়েদের হাইহিল জুতোরও ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

—তাই তো!

হঠাৎ মনে হলো স্যাণ্ডেল, হাইহিল এগুলো কি সেই হিপি-হিপিনীর—যারা কয়েকদিন আগে সুরেশ চৌরাশিয়াকে সঙ্গে এনে নিরুদ্দেশ হয়েছিল?

মেঘনাদকে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল অঘটনটা।

একটা গুম গুম শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। ওপাশের টিলার সামনে বিরাট পাথবেব চাঙড়টা সরে যাচ্ছে। খুলে যাচ্ছে একটা গুহামুখ। তারপরই একটা ভয়ঙ্কর গর্জন।

শিউরে উঠে দেখলাম সেই গুহাব ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক বিশাল বীভৎস দানব মূর্তি।

প্রায় আটফুট উচ্চতা। কুচকুচে কালো দেহ। গোদা গোদা হাত পায়ের গঠন।

জ্বলন্ত ভাঁটার মতো চোখ। হিংস্র দাঁতের পাটিগুলি বেরিয়ে আছে। কোমরে একখণ্ড পশু চর্মের আবরণী।

ভীমভেটকার ঘটোৎকচ। অজান্তেই একপা একপা করে পেছাতে শুরু করেছি।

—গুড়ুম...গুড়ুম...গুড়ুম...!

তাকিয়ে দেখি মেঘনাদ পিছু হটতে হটতে ঐ দানব মূর্তি লক্ষ্য করে রিভলবার থেকে একটার পর একটা গুলি বর্ষণ করছে।

কিন্তু কই, একটা গুলি তো লাগছে না ওর গায়ে। কেমন যেন পিছলে ফিরে যাচ্ছে।

—মেঘনাদ, দানবকে কখনও গুলি করে মারা যায় না। এখনও সময় আছে পালিয়ে চল।

আর একবার ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠলো সেই দানব।

—গুড়ুম...গুড়ুম...গুড়ুম...!

মেঘনাদ এখনও পিছু হাঁটতে হাঁটতে গুলি ছুঁড়ে চলেচে। গুলির ভাণ্ডার ফুরিয়ে এল, তবু সেই দানবকে আহত করা যায়নি। ও এগিয়ে আসছে দুহাত বাড়িয়ে—টলতে টলতে। মেঘনাদকে কেমন যেন অস্থির, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মনে হচ্ছে।

—টং।

মেঘনাদ দানবটাকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়লো। সেটা ঐ দানবের বুকে প্রতিহত হয়ে একটা ধাতব শব্দ সৃষ্টি করলো।

ভীমভেটকার ঘটোৎকচ কি লোহার বর্ম পরে এসেছে? আমার ভাবনা শেষ হলো না। তার আগেই আর একবার অমানুষিক গর্জন করে উঠলো ঘটোৎকচ আর তারপরেই হাঁ করলো। ধোঁয়ায় ভরে গেল চতুর্দিক। মাথার মধ্যে ঝিমঝিমে অনুভূতি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে অনুভব করলাম কে আমায় কাঁধে তুলে নিল।

।। বারো।।
(ডঃ ফ্রেডারিক সাইমন)

আমিই ডঃ ফ্রেডারিক সাইমন। শুনলাম আপনারা আমার খোঁজ
দুজন নিগ্রো রক্ষীর ঠেলা খেয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কণ্ঠস্বর শুনলাম।

তাকিয়ে দেখি ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি। পরনে কোট প্যান্ট মাথা জোড়া চকচকে টাক রিমলেস ফ্রেমের চশমার আড়ালে নিষ্ঠুর দুটি চোখ। শক্ত চোয়াল আর থুতনির নিচে অল্প একটু ছাগল দাড়ি।

ঘর না বলে সেটাকে গুহারই একটা অংশ বলা যায়। পায়ের নিচ থেকে শুরু করে সিলিং সবই পাথরের। প্রাকৃতিক গুহাকেই কেটে প্রয়োজনমতো বানিয়ে

নেওয়া হয়েছে।

এটা একটা ল্যাবোরেটরী বলেই মনে হচ্ছে। চতুর্দিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা বিচিত্র সরঞ্জাম—টেস্টটিউব, বার্ণার, সারিসারি নানা ধরনের কেমিক্যালের জার, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি।

একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফিরতে নিজেদের আবিষ্কার করেছি একটা বন্ধ ঘরে বন্দী অবস্থায়। দুজন নিগ্রো প্রহরী আমাদের জ্ঞান ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। আমাদের চোখ মেলে তাকাতে দেখেই তুলে নিয়ে এসেছে এই ঘরটার মধ্যে।

মনে হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে এটা একটা গুপ্ত ঘাঁটি। কিন্তু এরা কারা? কি উদ্দেশ্যে ভীমভেটকার জনহীন পার্বত্য গুহার মধ্যে ঘাঁটি বানিয়ে বসেছে সে রহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি।

হঠাৎ চোখে পড়লো ল্যাবোরেটরী ঘরের অন্যদিকে। একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়ে টেবিলের সামনে বসে মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে কী যেন পরীক্ষা করছে। মেয়েটাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। এর আগে কোথায় যেন দেখেছি।

ভাবতে ভাবতেই শুনলাম মেঘনাদ বলছে ডঃ সাইমন, যন্ত্রদানব ঘটোৎকচ তাহলে আপনারই সৃষ্টি?

মেঘনাদের কথার উত্তরে এবার যেন কৌতুকে হেসে উঠলো ফ্রেডারিক সাইমন। তারপর বললো—হ্যাঁ, আমি খোঁজ নিয়েছি তুমি একটি বুদ্ধিমান টিকটিকি। আর সেই জন্যই তো কোন রিস্ক নিতে চাইনি। সরাসরি তুলে এনেছি আমাদের ঘাঁটিতে। তোমার মতো লোককে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।

—তোমরা ভীতু, কাপুরুষ। মেঘনাদ ধমকে বলে উঠলো নাহলে সুরেশ চৌরাশিয়ার মতো একটা নিরীহ তরুণকে এভাকে খুন করতে পার।

সাইমন রাগ করলো না, ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো,—ছেলেটা একটু বেশী জেনে ফেলেছিল। ও জেনেছিল আমাদের গুপ্ত পথের হদিশ। বলতে বলতে পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো,—আর এর জন্য জেমস আর ডোরাকেই দায়ী করবো আমি। গাইড হিসাবে ওকে নিয়ে এই ভীমভেটকার জঙ্গলে ঢোকা ওদের ঠিক হয়নি।

এতক্ষণে মনে পড়েছে। ওপাশে একমনে কর্মরতা মেয়েটিকে আমি দেখেছি ট্রেনে ভূপাল আসার পথে। হিপি জেমসের সঙ্গী হিসেবে। ওরা আসলে এদেরই লোক। আর ঐ ঘটোৎকচ দানব তাহলে একটা যান্ত্র দানব? ল্যাবোরেটরীতে ঢোকার মুখেই ওটাকে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

কিন্তু এরা কারা? কোন কর্মকাণ্ড এখানে ফেঁদে বসেছে? ঘটোৎকচের নামে একটা রোবোট বানিয়েই বা কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়?

প্রশ্নটা তোলার আগেই সেখানে প্রবেশ করেছে ঝাঁকড়া চুল লাল দাড়ি আর এক সাহেব। ডঃ সাইমনকে ইংরাজিতে যা বললো তার অর্থ—কন্ট্রোলরুমে হেড কোয়ার্টার থেকে বেতার সংকেত এসেছে। হেডকোয়ার্টার ডাঃ সাইমনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সাইমন। আমার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিগ্রো রক্ষী দুজনকে কী একটা বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল গুহা ঘর থেকে। মেয়েটিও অনুসরণ করলো তাকে।

এখানে এখন শুধু আমি আর মেঘনাদ। প্রহরায় রয়েছে দুজন অস্ত্রধারী।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ কেটে গেল তারপর মেঘনাদ বললো,—এদের ব্যাপার স্যাপার কিছু বুঝতে পারছিস্।

—তুই বুঝছিস্?

—মনে হয় কিছু কিছু পারছি। ভীমভেটকার রহস্য যত জটিল ভেবেছিলাম এখন মনে হচ্ছে আসলে তার চেয়েও অনেকবেশী জটিল।

।। তের।।
(জীবাণু যদ্ধ কাকে বলে)

বললাম—তোর এ কথার অর্থ?

মেঘনাদ বললো এ পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে, নেহাত কোন সাধারণ অপরাধীচক্র এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে নেই অর্ণব। চক্রান্তের ঘাঁটি গেড়েছে এক বিদেশী গোপনচক্র। ভীমভেটকার গভীর গহন জঙ্গলে পাহাড়ে লুকোনো গুহারাজ্যে তারা গড়ে তুলেছে এক গোপন গবেষণাগার। আর লোকে যাতে জায়গাটাতে আসতে ভয় পায় তারই জন্যে সৃষ্টি হয়েছে ঘটোৎকচ কিংবদন্তী এবং যান্ত্রিক রোবোট ঘটোৎকচ।

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী চক্রের ব্যাপারটা মেঘনাদের মনে হলো কেন?

মেঘনাদ আমার মনের কথাটা অনুমান করেই বললো,—আমার ধারণা, কিছুদিন যাবৎ ভূপাল শহর এবং আশোপাশে হঠাৎ যে মারাত্মক ইয়েলো ফিভার বা পীত জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে এখানকার এক্সপেরিমেন্টের একটা যোগসূত্র আছে।

এবার আমার কেমন ধাঁধা মনে হয। বলি, তুই কি বলতে চাইছিস যে ঐ রোগ এরাই সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে?

মেঘনাদ বললো—ব্যাপারটা যদি তাই হয় আমি অবাক হব না। কারণ বন্ধু, তুমি তো জান বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সভ্যতার রূপ বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের আক্রমণের কায়দা দিনে দিনে বদলাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আগামীদিনে কোন কোন দেশের ওপর 'ভাইরাস ওয়ার' বা জীবাণু যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে অত্যন্ত গোপনে।

—জীবাণু যুদ্ধ!

—হ্যাঁ। এ যুদ্ধ পরমাণু যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ।

—তার মানে তুই বলতে চাইছিস বৃহত্তর শক্তির সাম্রাজ্যবাদী কোন দেশ যখন

কৃত্রিমভাবে ভাইরাস সৃষ্টি করে কোন দেশে দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে সে দেশের সরকার এবং জীবনধারাকে বিপর্যস্ত ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে তখন তাকেই ভাইরাস ওয়ার বা জীবাণুযুদ্ধ বলে, তাই তো?

—ঠিক তাই। মেঘনাদ বললো,—আধুনিক পৃথিবীর যুদ্ধবাজ বৃহৎ শক্তিধরের দল ক্রমশঃ এইভাবেই আগামীদিনের জন্য তাদের রণনীতিকে সংগঠিত করতে চাইছে। একটা দেশের সম্পদ, ইমারত, কলকারখানা কোনকিছু ধ্বংস হবে না, অথচ সেই দেশের জনগণের বৃহৎ অংশকে পঙ্গু করে অথবা পোকামাকড়ের মতোই হত্যা করে দখল করে নেয়া যাবে সমগ্র দেশটি।

কী সর্বনাশ। আমি আঁতকে উঠলাম। তোর কি ধারণা এই ভীমভেটকার গোপন ঘাঁটিতে এমন কোন এক্সপেরিমেন্টই চালান হচ্ছে?

—আমার ধারণা তাই।...

—সাবাস! ব্রেভো।

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মি. সাইমন ল্যাবরেটরী ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখ দুটো একাধারে হিংস্রতা আর কৌতুকে চক্‌চক্ করছে ধারাল ছুরির মতো।

।। চোদ্দ।।

মৃত্যুর পদধ্বনি

ড. সাইমন বললো,—মেঘনাদ ভরদ্বাজ যুবকটি গোয়েন্দাগিরিতে বুদ্ধিমান, আগেই খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু এতটা ক্ষুরধার বুদ্ধি আশা করিনি। আমার নিজের দেশে হলে তোমাকে উপযুক্ত কাজেই লাগানো যেতো। বলতে বলতে এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটায় বসে ডঃ সাইমন বললো,—তবে তোমরা বোধহয় ভাবতে পারনি যে, তোমাদের এ ঘরে রেখে কন্ট্রোলরুমে গেলেও এখানকার লুকানো মাইক্রোফোনে তোমাদের সব আলোচনাই শুনতে পাচ্ছিলাম।

—আমাদের আলোচনার মধ্যে তো কোন গোপনীয়তা নেই। আপনাদের মতলব আমরা ধরে ফেলেছি।

এবার হা-হা করে হেসে উঠলো ফ্রেডারিক সাইমন। তারপর হাসি থামিয়ে বললো,—সত্যিই কি তোমার মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই মেঘনাদ ভরদ্বাজ?

বলতে বলতে ওর মুখটা বদলে যেতে লাগলো, হিংস্রতায় রক্তিম হয়ে উঠলো মুখমণ্ডল। সোফা থেকে উঠে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগলো।

কি করতে চায় ডঃ সাইমন?

মেঘনাদের একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। তারপর অকস্মাৎ মেঘনাদের বাঁ হাতের কব্জি থেকে টেনে ছিঁড়ে নেয় ঘড়িটা।

মেঘনাদের হাতে নিশ্চয়ই খুব লেগেছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না সাইমনের এমন কর্মের অর্থটা কি? বন্দী হবার পর আমাদের সঙ্গে যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল তা তো এরা আগেই কেড়ে নিয়েছে। ঘড়িটাও খুলে নেবার দরকার হলে তো আগেই নিতে পারতো। মিছেমিছি একটা ঘড়ি...

—তোমাকে শুধু ধূর্ত ভেবেছিলাম। এখন দেখছি পাক্কা শয়তান। সাইমন বলছে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে।

—আমাকে আজ পর্যন্ত এভাকে কেউ বোকা বানাতে পারেনি, বলতে বলতে মেঘনাদের ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে বললো,—এর মধ্যে যে একটা ছোট ওয়ারলেস যন্ত্র লুকোন আছে এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিলো।

—অনুমানটা বড্ড দেরীতে করেছ ডঃ সাইমন। মেঘনাদের মুখেও ফুটে উঠেছে চাপা কৌতুক—এতক্ষণে তোমাদের এখানকার হদিস জেনে গেছে ভূপাল পুলিশ...না না তোমার অনুগত চর প্রকাশ দুয়া নয়, খোঁদ এস. পি. বিক্রম সিং নিজেই পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে এতক্ষণে হয়তো ঘিরে ফেলেছে পুরো এলাকাটা।

একেই বোধকরি বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। ক্ষণিকের জন্য বুঝি বিহ্বল মনে হলো শয়তান চক্রের পাণ্ডাকে।। তারপর সে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—কিন্তু এত সহজে আমাদের হদিস পাওয়া যাবে না জেনে রেখো। আমাদের এই গুহা দুর্গের মতোই মজবুত, তাছাড়া আশে পাশের বিভিন্ন গোপন স্থানে লুকোনো রয়েছে স্বয়ংক্রিয় মেসিনগান। কন্ট্রোল রুমে বসে বোতাম টিপলে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি নানা জায়গা থেকে বেরিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে একটা গোটা সেনাবাহিনীও।

শুনতে শুনতেই শিউরে উঠলাম।

—কিন্তু তার আগে তোমাদের দুজনের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। হেড কোয়ার্টার থেকেও সে নির্দেশ এসেছে। বলতে বলতে সেই তিক্ত বিদ্রূপের হাসিটা আবার ফুটে উঠলো শয়তান সাইমনের ঠোটে, বললো—কিন্তু যেহেতু আমি একজন বিজ্ঞানী তাই তোমাদের শেষ ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থাটা ছুরি ছোরা বন্দুকের সাহায্যে করতে চাই না—যা করবো, তাও হবে আমার এক্সপেরিমেন্টেরই অঙ্গ। বলতে পার ঘটনাচক্রে তোমাদের জীবনও আমাদের এই সিক্রেট অপারেশনের কাজে লেগে যাবে।

—কি করতে চাও তুমি? বুঝতে পারছি মেঘনাদ প্রাণপণে নিজের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে।

—কি করতে চাই? সাইমনের শয়তানী হাসিটা এবার ওর সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো, বললো—শুধু একটা ইন্‌জেকশান দেব তোমাদের দুজনকে৷ তাতে ভরা থাকবে মারাত্মক ইয়োলো ফিভারের ভাইরাস। রোগাক্রান্ত হবার পর তোমাদের দুজনকে আলাদা ঘরে বন্ধ রেখে হয়তো তিন/চার দিন মাত্র সুযোগ পাব। এরই মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করবো শরীরে এই বিশেষ ভাইরাসটির প্রতিক্রিয়া—যা আমাদের আগামী 'জীবাণু যুদ্ধ পরিকল্পনাকে' আরো শানিত করে তুলতে সাহায্য করবে।

—না। অজান্তেই একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে৷ শিহরিত হায় বললাম,—কোন মানুষ এ কাজ করতে পারে না। আপনি তো বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করাই আপনার আদর্শ হওয়া উচিত৷

আমার কথার মধ্যে বীভৎস অট্টহাসি হেসে উঠলো ডঃ সাইমন, তারপর

[illegible] চার্লস ডারউইনের থিয়োরি অফ [illegible]-এর সূত্র অনুসারে জগতে একমাত্র যোগ্যতমেরই [illegible] অধিকার আছে। আজকের দুনিয়ায় সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আরো তীব্র। সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই বৃহৎ শক্তিরা প্রভুত্ব করে অনুন্নত দেশগুলির উপর। চিরকাল তাই হয়েছে—'সার্ভাইবাল অফ দি ফিটেস্ট'—বলতে বলতে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো সাইমনের দুই ঠোঁটের ফাঁকে। বিষাক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—পদ্ধতিটা এখন শুধু বদলে গেছে। মাকড়সা যেমন ধীরে ধীরে শিকারকে তার জালে জড়িয়ে এক সময় গ্রাস করে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও কোন দুর্বল দেশকে পদানত করার জন্য প্রয়োজন হয় নানা কৌশল প্রয়োগের—একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক জাতীয় সংহতিবোধ ধ্বংস করার জাল বিস্তার করা হয় তেমনি এই সঙ্গে দরকার পড়ে দেশের মানুষকে নৈতিকতাহীন দুর্বল, পঙ্গু করে দেয়া...

ডঃ সাইমনের মুখ থেকে ভয়ঙ্কর কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ নজর পড়লো ল্যাবরেটরী গুহার এক কোণে এ্যাকোরিয়ামের মতো কয়েকটা বড় বড় কাঁচের বাক্স, তার মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে বিশেষ চেহারার ঝাঁক ঝাঁক মশা। আমি স্থির নিশ্চিত ঐসব মশাগুলিকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হচ্ছে 'হলুদ জ্বরের' ভাইরাস বহনের জন্য।

—ডোরা, ইন্‌জেকশান রেডি কর। শয়তান ফ্রেডরিক সাইমনের হুকুম কানে হল।

জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও অবাক না হয়ে পারলাম না। ট্রেনে পারচিতা সেই চঞ্চলা কৌতুক স্বভাবের হিপি মেয়েটি আসলে এই শয়তান চক্রেরই একজন এবং কি নিরসক্ত ভঙ্গিতেই না এই অমানবিক হুকুম তামিল করতে চলেছে। ওকে দেখে একবারও মনে হয়নি, ও আমাদের চিনতে পেরেছে। একমাত্র মানুষই পারে শয়তানের চেয়ে নিষ্ঠুর হতে।

সিরিঞ্জে হলুদ রঙের তরল ভরে ডোরা এগিয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই তরল প্রবেশ করবে আমাদের রক্তবাহী শিরায়। তারপর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে পীত জ্বরের ভাইরাস।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাথরের মতো ভাবলেশহীন ওর মুখ। ওকি জীবনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছে? তবে কি এইভাবেই আমাদের মরতে হবে?

ডঃ সাইমনের হাতে ইন্‌জেকশানের সিরিঞ্জ। ওর দু ঠোঁটের পাতায় ফুটে উঠেছে সেই তীব্র বিষাক্ত বিদ্রুপের হাসিটা।

সাইমন এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। প্রথমে কার পালা—আমার না মেঘনাদের? দুহাতে চোখ ঢাকলাম!

।।পনের।।
(ক্যারাটের প্যাঁচ)

কতক্ষণ চোখ বুজিয়ে ছিলাম মনে নেই। আতঙ্কে সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ একটা উত্তেজিত কোলাহল কানে এল। একাধিক লোক যেন চিৎকার করছে।

চোখ খুললাম। তাকিয়েই যাকে সামনে দেখলাম, .তাকেও আমরা আগেই দেখেছি—হিপি জেমস। ডোরারই মতো তাকেও অবশ্য এখন আর নিছক হিপি মনে হচ্ছে না। পরনে দিব্যি ঝকঝকে স্যুট, টাই।

হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত কণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় ও কি যেন বলছে সাইমনকে। শুনতে শুনতে সাইমনও বেশ উত্তেজিত বোধ হলো। এক সময় চূড়ান্ত উত্তেজনায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সাইমন। তারপর জেমসের পিছু পিছু প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘবের বাইরে। ডোরা এবং প্রহরী দুজনও দেখলাম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সেই মুহূর্তে আমাদের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সাইমনকে অনুসরণ করলো।

খুবই ঘোরতর কোন সংকট দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই। তবে কি এস পি বিক্রম সিং পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে সত্যি সত্যি ঘিরে ফেলেছেন পুরো এলাকা—আর তাই কি সাইমন আমাদেব কথা ভুলে ছুটে গেল কন্ট্রোল রুমে অবরোধকারী পুলিশ মিলিটারীর যুদ্ধ পরিচালনা করতে?

কিন্তু এই মুহূর্তে আর ভাববার সময় নেই। আমি আর মেঘনাদও বেরিয়ে এলাম ল্যাবোরেটরী গুহার বাইরে।

(পট পরিবর্তন)

সে এক দারুণ বিপদসঙ্কুল অবস্থা। ল্যাবোরেটরীর বাইরে গুহাপথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে বিভিন্ন দিকে।

পদশব্দ শুনলাম। কারা যেন ছুটে আসছে এদিকে। একদিকের গলিপথে সারে দাঁড়ালাম। দুজন অস্ত্রধারী রক্ষী ছুটে গেল। ওদের খুবই উদ্বিগ্ন বোধ হচ্ছে।

রক্ষী দুজন চলে যেতেই আবার ফিরে চললাম। আমাদের লক্ষ্য এখানের কন্ট্রোল রুম। শয়তান ডঃ সাইমন সেখানে আছে। সম্ভবতঃ সেখান থেকেই পরিচালিত হচ্ছে যা কিছু কার্যকলাপ।

একটা হুঙ্কার কানে আসতেই ফিরে তাকালাম আর তারপরই পা দুটো কাঁপতে শুরু করালা ঠকঠক করে। যন্ত্রদানব ঘটোৎকচ হাঁটতে শুরু করেছে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসেই ওর পতিপথ পরিবর্তিত হয়ে চলে গেল। ও চলে গেল অন্য দিকে।

মেঘনাদ চুপি চুপি বললো,—সম্ভবতঃ ঘটোৎকচকে পাঠানো হচ্ছে গুপ্তপথের বাইরে।

তাই হবে। বাইরে তুমুল একটা কিছু ঘটছে মনে হয়। সে কারণে ওরা এখানে আমাদের দুজনের অস্তিত্বের কথাও ভুলে গেছে। কে জানে অবস্থাটা কেমন!

আপাততঃ আর ভাববার সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে ওরা আমাদের সম্পর্কে সচেতন হতে পারে আর এরপর আমরা কিছুতেই রেহাই পাব না। মরণ ওৎ পেতে আছে।

মেঘনাদের পিছু পিছু এগিয়ে চললাম গুহাপথ ধরে অতি সন্তর্পণে।

মেঘনাদের ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালাম। ওর দিকের প্রান্তে ঐ গুহা ঘরটাই যে কন্ট্রোল রুম তা আর বলে দেবার দরকার নেই।

আমরা এবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চললাম। আর একটু এগুতেই কন্ট্রোলরুমটা পরিষ্কার দেখা গেল। একটা বাঁকের পাশে নিজেদের লুকিয়ে রেখে আমরা লক্ষ্য করতে লাগলাম কন্ট্রোল রুমের ভেতরের কার্যকলাপ। কন্ট্রোল রুমটি আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে গড়ে তোলা হয়েছে। নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে ভরা। চতুর্দিকে কয়েকটা টি ভি স্ক্রীন। তাতে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে বাইরে ভীমভেটকার বিভিন্ন দৃশ্য। সে দৃশ্য ভয়াবহ।

অসংখ্য পুলিশ ফোর্স এসে ঘিরে ফেলেছে গুপ্ত ঘাঁটির চতুর্দিকে। কিন্তু এগুতে পারছে না তারা। আশেপাশে লুকানো স্বয়ংক্রিয় স্টেনগান থেকে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষিত হচ্ছে তাদের উপরে। বেশ কয়েকজন আহত, মৃত্যুও ইতিমধ্যে ঘটেছে কিনা কে জানে।

এই সঙ্গে আরও একটা দৃশ্য চোখে পড়লো। গুপ্ত গুহাপথ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ভয়ঙ্কর রোবটদানব ঘটোৎকচ। ভীষণ মুখ্যব্যাদান করে তেড়ে যাচ্ছে পুলিশবাহিনীর প্রতি। ওর মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে বেরুচ্ছে ধোঁযার কুণ্ডলী। ওটা যে আসলে বিষাক্ত এবং মানুষদের চেতনাহরণকারী গ্যাস সে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।

এই সমস্ত যুদ্ধটাই কন্ট্রোলরুম থেকে চালনা করছে একজন মাত্র ব্যক্তি—সে এই ঘাঁটির প্রধান, দুষ্ট বহিঃশক্তির প্রতিনিধি ডঃ ফ্রেডরিক সাইমন।

ডঃ সাইমনের সাহায্যকারী জেমস ছাড়া কন্ট্রোলরুমের ভেতর আর কাউকে চোখে পড়লো না। মেঘনাদ ফিসফিস করে বললো,—কোনভাবে কন্ট্রোলরুমটা দখল করতে পারলেই কেল্লা ফতে করা যাবে অর্ণব।

কিন্তু সে তো অসাধ্য কর্ম। ঘাঁটির অন্যান্য প্রহরীদের এখানে দেখা যাচ্ছে না বটে তবে তারা হয়তো আনাচে কানাচে আমাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে অথবা অন্য কোন গুপ্ত পথ ধরে এগিয়ে চলেছে প্রয়োজনে লড়াইতে যোগ দেবে বলে।

একজন পাহারা দিচ্ছে কন্ট্রোলরুমের সামনে দাঁড়িয়ে। যমদূতের মতো চেহারার এক নিগ্রো প্রহরী। কুচকুচে কালো তার গায়ের রং, জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখ, পেশীবহুল স্বাস্থ্য। সাক্ষাৎ হিংস্রতার প্রতীক। অচঞ্চল যন্ত্রমানবের মতোই হাতের স্টেনগানটা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সদাজাগ্রত প্রহরায়। একটা মাছিও তার দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকতে পারবে বলে মনে হয় না।

মেঘনাদের দিতে তাকালাম। ওর চোখের তারা কাঁপছে। তার মানে ভেতরে ভেতরে কোন মতলব আঁটতে শুরু করেছে ও। এইভাবে আরও কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

—হু...উ...হা...।

হঠাৎ একটা ভীমনাদ শুনে চমকে তাকালাম। অভূতপূর্ব দৃশ্য।

আচমকা সেই স্টেনগানধারী প্রহরীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্চর্য ক্যারাটের কৌশলে ওকে আঘাত করলো মেঘনাদ। সেই বিশেষ আঘাতে অতবড় শরীরটা একান্ত অসহায়ভাবে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো কাটা কলাগাছের মতো।

এককালে ইউনিভার্সিটির 'ব্লু' ক্যারাটেতে দক্ষ 'ব্ল্যাক বেল্ট' চ্যাম্পিয়ান মেঘনাদ ভরদ্বাজ এই ভীষণ কাজটা করে ফেললো কত অনায়াসেই।

কিন্তু এখন আর এসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। চিৎকার শুনে কন্ট্রোলরুমের ভেতরে ডঃ সাইমন আর তার সাগরেদ জেমস উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তারা কোন কিছু করার আগেই মেঘনাদ সেই নিগ্রো প্রহরীর স্টেনগানটা তুলে নিয়েছে নিজের হাতে—সরাসরি তাক করেছে তাদের দিকে। হুঙ্কার দিয়ে বলছে,—আর কিছুমাত্র চালাকির চেষ্টা কবলে তোমরা দুজনেই মববে ডঃ ফ্রেডরিক সাইমন।

।। আঠার ।।
(শেষ কথা)

এর পরের ঘটনা আর বিস্তারিত বলার কিছু নেই। বিদেশী চক্রের ঘাঁটির কন্ট্রোলরুম দখল করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত বানচাল করে দিয়েছিলাম সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, তারপর গুপ্ত প্রবেশপথ খুলে দিতেই এস. পি. বিক্রম সিং-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ এবং জওয়ান ঢুকে পড়লো বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মতো।

তারপর?

তার পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়।

ভূপালের নিকটবর্তী ভীমভেটকায় বিদেশী চক্রের ঘাঁটির স্বরূপ উদঘাটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। ফ্রেডরিক সাইমন আর তার দুই সহকারী জেমস ও ডোরাকে ভালোমতো জেরা করে জানা গেল সমস্ত সূত্রগুলো। প্রসঙ্গটা মধ্যপ্রদেশ বিধানসভাতে তো উঠলোই লোকসভাতেও জনপ্রতিনিধিরা এই ভয়াবহ বিদেশী চক্রান্তের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা চালালেন এবং অবশ্যই ভীমভেটকায় এই ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গার মূল কৃতিত্বের জন্য জাতীয় তরফে অভিনন্দিত করা হলো রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজকে।

আর মেঘনাদ?

ওর কিন্তু এতসব মাতামাতিতে বিন্দুমাত্র স্পৃহা আছে, চোখে পড়লো না। তার বদলে এবার দিনকয়েক লক্ষ্মীছেলের মতো ভূপালের পিসেমশাই, পিসিমা এবং

পিসতুতো বোনেদের হাতের যত্ন খেয়ে, বেড়িয়ে হুল্লোড় করে যথাসময়ে আমরা ফিরে এলাম কলকাতায়—তবে ফেরার সময় বগলদাবাই করে ভীমভেটকার ঘটোৎকচ রহস্যের আনুপূর্বিক বিবরণীটা আনতে মেঘনাদ ভোলেনি।

সব ব্যাপারটা নিয়ে জমিয়ে একটা ক্রাইম থ্রিলার লিখতে পারলে মন্দ হয় না!

শ্রীযুক্ত পীযূষ রায়
প্রিয়সুহৃদবরেষু

মেঘনাদ সিরিজ-এর অন্যান্য বই

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

স্পাইরা পাশেই আছে

নিবেদন

এই বই-এর দুই মলাটের মধ্যে একই সঙ্গে ভরে দেয়া হলো বর্তমান কিশোর সাহিত্যের প্রিয় চরিত্র মেঘনাদ অর্ণব জুটির একটি কল্পবিজ্ঞান অ্যাডভেঞ্চার এবং দুটি শ্বাসরুদ্ধকর গোয়েন্দা অভিযান। আমরা আশা রাখি আগের মতো এই বইটিও সব বয়সী পাঠকের মন জয় করবে।

এই বইতে

রত্নগুহার অভিশাপ/৩
ছিন্নমস্তার খাঁড়া/৩২
আতঙ্কের দ্বীপ/৫০

রত্নগুহার অভিশাপ

॥ ১ ॥

কিংবদন্তির বিচিত্র ইতিহাস

স্বামী ধর্মপাদ মানুষটার আসল পরিচয় জানিস? —ছোট্ট হাত-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে সাবান ঘসতে ঘসতে মেঘনাদ বললো।

আমি তখন ঘরের সোফাটায় আধশোয়া হয়ে সরকার প্রকাশিত 'রাজগীর ভ্রমণ-পুস্তিকা'য় চোখ বুলোচ্ছিলাম। মেঘনাদের কথায় ওর দিকে চোখ না তুলেই বললাম—তুই কি ভাঙা গুহার ওই থুরথুরে বুড়ো সন্ন্যাসীর কথা বলছিস?

—হ্যাঁ। মেঘনাদ দাড়িতে সাবান লাগান শেষ করে এবার সেফটি-রেজার হাতে তুলে নিয়ে বললো,—তুই কি জানিস, উনি প্রথম জীবনে ছিলেন এক অধ্যাপক। কলকাতার বাসিন্দা। নাম সদাশিব বসু?

এবার আমি ভ্রমণ-পুস্তিকার পাতা বন্ধ করে মেঘনাদের দিকে তাকাই, বলি—আজ ভোরে একা রাজগীরের জঙ্গলে ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলি নিশ্চয়ই?

—ঠিকই ধরেছিস। মেঘনাদ গালে ব্লেড চালাতে চালাতে বললো, —স্বামী ধর্মপাদ আজ আমায় ওঁর আশ্চর্য জীবন-কাহিনী শোনালেন, সেই সঙ্গে এক অজানা তথ্য।

বললাম, —নিশ্চয়ই বিম্বিসার রত্নগুহার কিংবদন্তি সম্পর্কে নতুন কোন কথা। কিন্তু এত কিছু থাকতে তুই হঠাৎ রাজগীরের প্রাচীন রত্নগুহার কিংবদন্তি নিয়ে কেন যে মেতে উঠলি, আমি ভেবে উঠতে পারছি না মেঘনাদ।

—'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন'—নির্বিকার হেঁয়ালিতে জবাব দিল মেঘনাদ।

ব্যাপারটার সূত্রপাত মাসখানেক আগে। মেঘনাদ কি একটা কাজে তখন রাজগীর এসেছিল।

পাঁচ পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা উপত্যকা রাজগীর এক প্রাচীন নগরী। তখন নাম ছিল রাজগৃহ। মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। শিশুনাগ-বংশীয় রাজারা এখানে বহুকাল রাজত্ব করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালের নৃপতি ছিলেন বিম্বিসার। আরও পরে পাটনার নিকটবর্তী পাটলিপুত্র নগরটি রাজধানী হয়ে উঠলে রাজগীরের গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু গুরুত্ব যাই থাকুক, জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা এই রাজগীর উপত্যকা আজও বহন করে চলেছে প্রাচীন গৌরব আর স্মৃতি। এখানকার গৃধ্রকূট পর্বতে বহুবছর তপস্যায় অতিবাহিত করেছিলেন বুদ্ধদেব। ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ ভূমি,

মহারাজ বিম্বিসারের রাজ-চিকিৎসক জীবকের আমবাগান, বিম্বিসারের রত্নগুহা— যা 'শোন ভাণ্ডার' নামে বেশী পরিচিত, অজাতশত্রুর রাজপ্রাসাদ আর কারাকক্ষের ধ্বংসাবশেষ—এ সবই প্রাচীন দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।

মেঘনাদ এখানে এসে সব থেকে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল এখানকার বিম্বিসার-রত্নগুহার প্রাচীন কিংবদন্তিতে।

গতকাল সকালে রাজগীর এসে এরই মধ্যে একবার মেঘনাদের সঙ্গে গিয়ে সেই 'রত্ন-ভাণ্ডার' দেখে এসেছি। টাঙ্গায় চড়ে অনেকটা ভেতরে গিয়ে দেখা যায় বহু পুরনো এক প্রস্তর-কক্ষ। পাহাড় কেটে তৈরী। একতলায় একটা অংশ এখনও অটুট। সামনে খোলা প্রবেশ-দ্বার। দুপাশে ঘুলঘুলি, ভেতরে দেয়ালে খোদাই নানা বুদ্ধমূর্তি ! আর পেছনের দেয়ালে রয়েছে এক দুর্ভেদ্য পাথরের বন্ধ দরজা। এই বন্ধ দরজার পেছনে নাকি আজও আছে এক গুপ্ত ধনাগার।

এই 'বিম্বিসার রত্নগুহা'কে কেন্দ্র করেই এক বিচিত্র কিংবদন্তি এখানে বহু যুগ ধরে প্রচলিত।

কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িত ইতিহাসটা আগে বলি ঃ

মহারাজা বিম্বিসার শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন তথাগতের চরণে। এ সময় তিনি তাঁর পুত্র অজাতশত্রু দ্বারা কারারুদ্ধ হন এবং সেই কারাকক্ষেই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়। বিম্বিসারের সে কারাকক্ষের স্থান আজও রাজগীরের জঙ্গলে হারিয়ে যায় নি। অজাতশত্রু পিতাকে কারারুদ্ধ করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন; সময়টা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি।

এই পর্যন্ত ইতিহাস। এবার ইতিহাসের সঙ্গে যে কিংবদন্তিটা জড়ান রয়েছে তা বলি ঃ

বিম্বিসার কারারুদ্ধ হলে তাঁর মহিষী নাকি অগাধ ধনসম্পদ যাতে পিতৃদ্রোহী সন্তানের হাতে না পড়ে সেজন্য গৌতম-বুদ্ধের নামে তা ওই 'শোনভাণ্ডার' বা রাজা বিম্বিসারের রত্নভাণ্ডারের গোপন গুহায় লুকিয়ে আশ্চর্য কৌশলে গুহামুখ বন্ধ করে দেন। তারপর গুহার বাইরে খোদাই করে দেয়া হয় এক অদ্ভুত লিপি—যা নাকি গুহার দরজা খোলার একমাত্র সংকেত।

ব্যাপারটা অনেকটা অলিবাবার 'চিচিং ফাঁক'র মতো আর কি!

তবে শোনা যায় আজ পর্যন্ত নাকি কেউ সে লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি—তাই গুহামুখ আজও অভেদ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ওখানে গিয়ে গাইডের মুখে শুনেছি—ইংরেজরা নাকি দরজা খোলার চেষ্টায় তোপ দেগেছিল, তবু দরজায় চিড় ধরে নি। সে দাগ এখনও দরজায় রয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য নানা কারণে আর কোন সরকারী প্রচেষ্টা হয়নি—হলে অবশ্য কী হতো তা বলা যায় না। তবু কিংবদন্তি থেকেই গেছে।

এবার কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত স্বামী ধর্মপাদের কথাটা বলা দরকার।

অশীতিপর ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি বাস করেন রাজা বিম্বিসারের রত্নগুহার কাছাকাছি একটা প্রাচীন ভগ্ন গুহায়। একমাস আগে মেঘনাদ রাজগীর এসে প্রথম ওই সন্ন্যাসীটিব সঙ্গে পরিচিত হয়, তারপর আমায় হঠাৎ টেনে নিয়ে আবার আসে রাজগীরে।

এখানে এসে পৌঁছেছি গতকাল দুপুরে। কিন্তু দুপুরে এসে হোটেলে উঠেই মেঘনাদ আমায় সঙ্গে নিয়ে টাঙ্গা ভাড়া করে সর্বপ্রথম গিয়ে হাজির হয় স্বামী ধর্মপাদের গুহাকক্ষে।

সময়টা তখন সন্ধ্যা। আবছা অন্ধকার নেমে আসছে পাহাড় ডিঙিয়ে। গুহার অল্প আলোয় একা বসেছিলেন সেই অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটি। পরণে একটা বহুকালের পুরনো ঝলমলে আলখাল্লা আর ছেঁড়া ধুতি। আলখাল্লার রঙটা হয়তো একদিন গেরুয়াই ছিল, এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। ধুতিটা শতছিন্ন। গুহার একদিকে দেওয়ালের কাছে একটা ঝোলা আর মাটির কয়েকটা পাত্র। শুনলাম স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে কখনও কেউ কেউ খাবার দিয়ে যায়, নয় তো দিনের বেলা নিজেই জঙ্গলে ঘুরে বুনো ফলমূল জোগাড় করে খান। তবে পয়সা-কড়ি একদম ছোঁন না। মানুষটাকে আমার ভারী অদ্ভুত মনে হয়েছিল। এভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারে। কথাবার্তার ধরনেই বোঝা গেল মেঘনাদ আগের বারই এসে স্বামী ধর্মপাদের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচয়-পর্ব সেরে গেছে।

হিন্দিতে বেশ কিছুক্ষণ বাতচিত হলো দুজনের মধ্যে। আমি একটা দুটো কথা শুনেই গুহার বাইরে চলে এসেছিলাম। প্রায অন্ধকার ওই গুহার মধ্যে অমন একটা আদ্যিকালের অদ্ভুত মানুষের কাছে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। স্বামী ধর্মপাদ শুধু থুরথুরে বুড়োই নয়, কানেও রীতিমত কম শোনেন। মেঘনাদ যে কেন ওব সঙ্গে কথা বলাব এত মেহনত পোয়াল কে জানে!

অবশ্য একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, তখনই অনুমান করেছি। ও শুধু পেশায়ই নয়—মনে প্রাণেও বহস্য-সন্ধানী।

একটা কোন রহস্যের সন্ধান যে ও পেয়েছে সে ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে আজ সকালে।

সেই পাখি-ডাকা ভোরে মেঘনাদ বিছানা ছেড়ে উঠে একা বেরিয়ে গেছে হোটেল থেকে। আমায় কিছু না বলে গেলেও, জানি ও কোথায় গেছে।

ফিরেছে খানিক আগে। আশা করে আছি নিজে থেকেই ও কিছু বলবে।

মেঘনাদ কিন্তু প্রথম চোটেই অবাক করেছে আমায়।

ওই বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি অতীতে এক বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন—নাম সদাশিব বসু। কিন্তু এমন লোকেরও এ হাল হলো কি করে!

মেঘনাদ এতক্ষণে দাড়ি কামান শেষ করে তোয়ালেতে মুখ মুছে খাটের

ওপর হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছে।

বললাম—স্বামী ধর্মপাদের অতীতে সম্পর্কে কী যেন বলবি বলছিলি?

—বলছিলাম তাঁর জীবন-কথা। মেঘনাদ বালিশটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলে,—আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে প্রফেসর সদাশিব বসু, রাজগীরে বেড়াতে এসে রাজা বিম্বিসারের রত্নগুহার কিংবদন্তিতে আকৃষ্ট হয়ে সংকেত-লিপির অর্থ উদ্ধারের নেশায় মেতে ওঠেন এবং অবশেষে সে লিপির অর্থ উদ্ধার করেন।

আমি চমকে উঠি। এ কি সত্য! আজ পর্যন্ত অন্য কেউ যা পারেনি......!

মেঘনাদ অচঞ্চল ভাবে বলে,—আজ ভোরে স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর বসু তাঁর জীবনের সমস্ত কথা আমায় জানিয়েছেন—তা যেমন করুণ, তেমনি বিস্ময়কর।

মেঘনাদ যা শোনাল, তা সত্যিই বড় অদ্ভুত।

বিশ বছরের নিরলস পরিশ্রমে প্রফেসার সদাশিব বসু বিম্বিসার রত্নগুহার দ্বার খোলার সংকেত-লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। এই কুড়িটা বছর সমাজ, সংসার সবকিছু থেকে উনি ছিলেন স্বেচ্ছা-নির্বাসিত।

প্রফেসর বসুর জীবনের আসল ট্রাজেডি শুরু হয় এর পর। বিশ বছরের সাধনা সফল হবার পর উনি যখন নিজের সংসারে ফিরতে চাইলেন, সংসার ওঁকে ঠাঁই দিল না।

কারণ এতগুলি বছরের মধ্যে সংসারের হালটাই গিয়েছিল বদলে। স্ত্রী মারা গেছেন বহু বছর স্বামীর অবহেলার অভিমান বুকে নিয়ে। একমাত্র ছেলে এখন বড় হয়েছে, বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। সে বাবাকে পাগল বলে অপমান করলো। আসলে এই বিশবছর তার ও মায়ের প্রতি পিতার অবহেলা আর ঔদাসীন্য বুঝি তাকেও নিষ্ঠুর করে তুলেছিল।

সেই প্রথম প্রফেসর বসু উপলব্ধি করলেন জীবনের প্রায় সবটাই তিনি হারিয়ে ফেলেছেন এক মিথ্যে সোনার হরিণের পিছনে ছুটে। এখন তিনি বৃদ্ধ নিঃ[illegible]। এই বিপুল সম্পদ ওঁর কাছে অর্থহীন, অভিশপ্ত।

জীবন আর সংসারের প্রতি এক আশ্চর্য বিরাগ বোধ করলেন প্রফেসার বসু। উপলব্ধি করলেন গভীরতম সত্য। তার পরই সব কিছু ত্যাগ করে আবার ফিরে এলেন পুরনো রাজগৃহের জঙ্গলে।

প্রফেসর বসুর জীবন-ইতিহাস শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। মেঘনাদ থামতেই বললাম,—কিন্তু এ অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে তোর কী প্রয়োজন বুঝলাম না তো!

মেঘনাদ উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিল তা আর সেই মুহূর্তে শোনা হলো না, তার আগেই ঘরের বাইরে থেকে এক বিচিত্র মিহি গলা শোনা গেল—মেঘনাদ বাবু, অর্ণববাবু, ঘরে আছেন নাকি মশাই?

নাগপতিবাবু ছাড়া আর কে! নির্ঘাৎ কুণ্ডতে স্নান সেরে ফিরছেন!

ঠিক যা ভেবেছি! দুহাতে দুটো জল-ভর্তি ঢাউস কুঁজো। সোজা ঘরে ঢুকে এলেন।

মানুষটা ভারী মজার!

॥ ২ ॥

শ্রীমান নাগপতি নাগ

নাগপতিবাবুর পুরো নাম শ্রীমান নাগপতি নাগ। হোটেলে আমাদের পাশের ঘরটাতেই এসে উঠেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে একই ট্রেনের একই কামরায় আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। চেহারাটা ডিগডিগে, মাথাটা বড়— যেন 'পেটের রুগী'র বিজ্ঞাপন। আর এসেও দেখছি তাই। ভদ্রলোক গতকাল আসার পর থেকে ইতিমধ্যেই অন্তত বার দশেক এখানকার কুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ ঘুরে এসেছেন। ওঁর ধারণা এখানকার কুণ্ডর জলের যা গুণ, যা সব মিনারেলস্ আছে, তা পেটটাকে একেবারে মেরামত করে দেয়। প্রতিবছর দিন কয়েক করে নাকি উনি রাজগীর এসে কাটিয়ে যান ; তারপব সারা বছরটা ভালই কেটে যায়। ভদ্রলোকের কলকাতায় নিজস্ব সোডা-ওয়াটার ফ্যাকট্রি আছে।

নাগপতিবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে জলের কুঁজো দুটো ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে একটু দম ছেড়ে বললেন,—আপনারা দুটিতে তো ভারী আজব লোক মশাই। বাইরে ফুট-ফুট করছে রোদ্দুর আর এখনও আপনারা হোটেলে বসে রয়েছেন!

মেঘনাদ বললো,—আজ এই নিয়ে দ্বিতীয়বাব বুঝি কুণ্ড থেকে ঘুরে এলেন?

—এ্যাঁ! নাগপতিবাবু অবাক ঃ আপনি কি ঘরে বসেই সব দেখতে পান নাকি?

—মেঘনাদ নিশ্চয়ই পথে আপনাকে দেখেছে। আমি বললাম।

—বেরিয়েছিলেন নাকি মশাই। কই কুণ্ডতে তো দেখলাম না আপনাদের কাউকে?

আমি বললাম,—আপনি ক্ষেপেছেন, মেঘনাদ যাবে সাত সকালে কুণ্ডতে স্নান করতে!

—তবে কি ভোরবেলা কোথাও পূজোটুজো দিতে গিয়েছিলেন নাকি? নাগপতিবাবু অবাক হয়ে বলেন,— এখানে তো প্রতি দশ পা অন্তর হয় একটা করে বৌদ্ধ না হয় জৈন বা শিব মন্দির।

—আরে না মশাই, ওসব কিছু নয়। মেঘনাদ এতক্ষণ চুপ করে থেকে এবার বলে,—আমি গিয়েছিলাম একটু পুরনো রাজগীরের জঙ্গলে।

শুনে নাগপতিবাবুর সে কি হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,—ওই কোকিল ভোরে গিয়েছিলেন রাজগীরের জঙ্গলে। গাঁদাফুল তুলতে নাকি মশাই?

—তা কথাটা নেহাত বেঠিক বলেন নি। নাগপতিবাবুর হাসির মধ্যেই বেশ হেঁয়ালি করে মেঘনাদ বলে,—কোন্ বনে কী ফুল ফুটে আছে সে খোঁজ কি আমরা সবাই রাখি? নাগপতিবাবুর হাঁ-করা মুখের দিকে তাকিয়ে এবার মেঘনাদ বললো,—মনে হচ্ছে কুণ্ডতে আর একবার আপনি যাবেন?

—হ্যাঁ, মানে ঘণ্টাখানেক বাদে.........নাগপতিবাবু হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে আমতা-আমতা করেন।

—তখন আমার এই বন্ধুটিকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে গা ধুইয়ে নিয়ে আসবেন। বন্ধুবর আমার অপেক্ষায় সকাল থেকে কোথাও বেরুতে পারেনি।

মেঘনাদের কথায় এ ধরনের খোঁচা খেতে আমি অভ্যস্ত। তাই সেটুকু উপেক্ষা করেই বললাম,—কিন্তু তুই এখন কী করবি?

—ঘুমবো। মেঘনাদ হাই তুললো, রাতের ঘুমের 'ডিউপার্ট' টুকু পুষিয়ে নিতে হবে। বলেই থপ্ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

—সেলফিশ্! এর বেশী আর কী বলতে পারি আমি।

॥ ৩ ॥

রুস্তমজীর ভীমরতি

সকালে যে কথাটা শুনতে গিয়েও শোনা হলো না, সেটা শোনার ফুরসৎ পাওয়া গেল বিকেলে ঘরে বসে চা খেতে খেতে।

আমার কিন্তু মেঘনাদের বক্তব্য মোটেই প্রাঞ্জল মনে হয়নি। একটা কী অস্বাভাবিকতা এর মধ্যে রয়ে গেছে!

স্বামী ধর্মপাদ নাকি তাঁর পাঠোদ্ধার করা রাজা বিম্বিসারের রত্নগুহায় প্রবেশের সংকেতের অর্থটা মেঘনাদকে দিয়ে যেতে চান।

আমি তো বুঝতে পারি না স্বামী ধর্মপাদ কেনই বা ওকে তা দেবেন? মেঘনাদ ওঁর কে? নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। আগে সেটাই জানা দরকার।

মেঘনাদ কিন্তু আমার যুক্তিটা প্রায় উড়িয়ে দিয়েই বললো,—কিন্তু ওঁর কথা মতো আগামীকাল সন্ধ্যের পর গুহায় গিয়ে ওঁর কাছ থেকে সেই সংকেত-লিপিটা নিয়ে আসতে তো ক্ষতি নেই।

আমার মনে হলো মেঘনাদ লোভে পড়েছে। আশ্চর্য! ওর চরিত্রের এ দিকটার সঙ্গে তো আমার আগে কখনও পরিচয় হয়নি। কিন্তু মুখ ফুটে আমি আর কিছু বলার আগেই মেঘনাদ বললো,—স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর যে কথাটা সরাসরি বলতে চান নি বা পারেন নি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তা কী জানিস?

—কী?

—হি ইজ ইন ডেঞ্জার, তিনি কোন এক দারুণ বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

—বিপদ......!

কথাটা আর শেষ হলো না আমার, মেঘনাদ হঠাৎ দবজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—কে, কে ওখানে?

আমি ছুটে গেলাম দরজার কাছে। ভেজানো দরজাটা ঝট্ করে খুলে দিতেই দেখি রুস্তমজী তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করছেন।

মেঘনাদও ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁক দিয়ে বললো—শুনুন রুস্তমজী, আপনি কি কিছু বলতে এসেছিলেন?

রুস্তমজী হঠাৎ খুবই অপ্রস্তুতে পড়ে গেছেন বোঝা গেল। ভদ্রলোকের বছর ষাট কিংবা কিছু বেশীই বয়স হবে কিন্তু সমর্থ চেহারা। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেলেও এখনও দাঁত পড়েনি। মহারাষ্ট্রের পুনায় বাড়ী। চাকরী থেকে অবসর নেয়ার পর একা একা সারা ভারত ঘুরে বেড়ানো নাকি নেশা। আমরা এ হোটেলে এসে ওঠার আগে থেকেই ওপরতলায় একটা ঘর ভাড়া করে রয়েছেন। কাল রাত্তিরেই ভদ্রলোক নিজে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে গেছেন। বেশ কয়েক বছর নাকি কলকাতাতেও ছিলেন, সেই সুবাদে ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতে পারেন।

রুস্তমজী মেঘনাদের কথার উত্তরে আমতা আমতা করে বললেন—না, ইয়ে, বাইরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি........মানে রিস্টওয়াচটা স্টপ হয়ে গেছে...তাই....

—তা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে না থেকে ডাকলেই তো পারতেন। কথাটা আমিই বললাম।

রুস্তমজী মুখে একটু হাসি টানার চেষ্টা করে বললেন—হ্যাঁ মানে....না, ভাবলাম ঘরে আপনারা কোন সিরিয়াস ডিসকাসান করছেন।

—ভেজান দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সেটুকুও বুঝে ফেলেছেন। মেঘনাদের আত্মগত নীচু স্বর কানে এল।

এ সময় হঠাৎ নাগপতিবাবুকে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে রুস্তমজীর হঠাৎ যেন ধড়ে প্রাণ এল, বললেন—এই যে মিঃ নাগপতি, আপনার রিস্টওয়াচে টাইমটা কত হলো একটু বলবেন?

নাগপতিবাবু তো শুনে হৈ হৈ করে উঠলেন,—বলেন কি মশাই, আধঘণ্টাও হয়নি দেখলাম হোটেলের সামনের স্টুডিওটার কাছে দাঁড়িয়ে ঘড়ি মেলাচ্ছেন। এমন আম-পাড়া ঘড়ি রাখেন কেন?

এরপর রুস্তমজী আর দাঁড়ালেন না।

রুস্তমজীর চলে যাওয়ার গতি দেখে আমি আর মেঘনাদ মনে মনে হাসলেও নাগপতিবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হৈ হৈ হাসি হেসে বললেন,—সময় মেলাবার

সময় আর ওঁর নেই। আসলে বুড়ো বয়সের ভীমরতি মশাই। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদাকে দেখেছি রিটায়ার করে দিবারাত্তির বাড়ীর দাওয়ায় বসে সামনের বেলগাছের পাতা গুনতেন।

নাগপতিবাবুর দরাজ হাসির মধ্যেও মেঘনাদের অস্ফুট মন্তব্য কানে এল—কিন্তু এ ভীমরতির প্রকৃতিটা আরও বিচিত্র!

॥ ৪ ॥

নৃশংস খুন

পরদিন সকালবেলা। আমি আর নাগপতিবাবু কুণ্ডতে স্নান সেরে ফিরছিলাম। মেঘনাদ আজও আমাদের সঙ্গে আসেনি। গতকাল সন্ধ্যেবেলায় কোথায় যেন বেরিয়েছিল। ফিরেছে রাত করে। আমি জিজ্ঞেস করেও জবাব পাই নি। আজ সকালে যখন নাগপতিবাবুর ডাকে হোটেল থেকে বেরিয়েছি মেঘনাদকে তখনও দেখেছি গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকতে!

নাগপতিবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বকে চলেছিলেন,—আমি তো মশাই রাজগীরে এসে কুণ্ডস্নান না করার অর্থ মনে করি বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানা, মালদায় ফজলী আম কিংবা কাশীতে গিয়ে ল্যাংচা না খেয়ে ফিরে যাওয়া। শুধু এই বলেই নাগপতিবাবু ক্ষান্ত হলেন না, আরও বললেন, কিছু মনে করবেন না মশাই, দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে এসে আপনার বন্ধুটির এভাবে একা একা থাকা ব্যাপারটা আমার মোটেই দৃষ্টি সুখকর মনে হচ্ছে না।

আমি কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো একটু দূরে। পুরনো রাজগীরের দিক থেকে একটা টাঙ্গা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। ওতে রয়েছেন বৃদ্ধ রুস্তমজী। উত্তেজনায় উনি যেন ছুটন্ত টাঙ্গার মধ্যেই ওঠ-বোস শুরু করেছেন মনে হলো।

নাগপতিবাবুও লক্ষ্য করেছেন। আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছি রাস্তার ধারে।

ততক্ষণে টাঙ্গা আমাদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। রুস্তমজী টাঙ্গার ভেতর থেকেই আমাদের দেখে চেঁচাতে শুরু করেছেন,—এই রোক্‌কে, রোক্‌কে! ঠারো ভাই, ঠারো!

টাঙ্গাওলা আমাদের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম কষে ধরলো। রুস্তমজী হাঁপাতে হাঁপাতে টাঙ্গার মধ্যে বসেই বললেন,—অর্ণববাবু, নাগপতিবাবু, শুনিয়েছেন—এখানে একটা মার্ডার হয়েছে।

—মার্ডার! মানে খুন। আমি কিছু বলার আগেই নাগপতিবাবু আঁতকে উঠলেন।

—কোথায় খুন হয়েছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—ওদিকে জঙ্গল এরিয়ায় ওল্ড রাজগীর ফরেস্টে কিং বিম্বিসারের স্বর্ণ-ভাণ্ডার আছে না, তার পাশে ওই যে কেভ-টা....

—হ্যাঁ, 'সন্ন্যাসী গুহা'। ওখানে তো বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী ধর্মপাদ থাকেন। এবার আমি আতঙ্কিত হই।

—সাধুজি মার্ডার হইয়ে গেছে অর্ণববাবু। রুস্তমজী তাঁর ভাষার জগাখিচুড়ির মধ্যে প্রায় ককিয়ে ওঠেন।

খবরটা আমার কাছে একটা বিরাট ধাক্কার মতো, যদিও স্বামী ধর্মপাদের কাহিনীটা শোনার পর এটা খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। কিন্তু আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করিনা আমি। বলি, চলুন জলদি।

—কোথায়? নাগপতিবাবু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন মনে হলো।

—প্রথমে হোটেল, তারপর মেঘনাদকে সঙ্গে নিয়ে পুরনো রাজগীরের জঙ্গলে।

থতমত নাগপতিবাবুকে আব কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় হ্যাঁচকা মেরেই টাঙ্গায় তুলে ফেললাম।

টাঙ্গা ছুটে চললো হোটেলের দিকে।

॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসীর বীভৎস মৃতদেহ

মেঘনাদ আর নাগপতিবাবুকে নিয়ে যখন রাজগীর জঙ্গলে সন্ন্যাসীগুহার কাছাকাছি এলাম ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে। গুহাটা রাজা বিম্বিসারের স্বর্ণভাণ্ডার থেকে খুব বেশী দূরে নয়। একটা ছোট্ট পাহাড়ী টিলার গায়ে বহু প্রাচীন সেই ভগ্ন গুহা। সংসারত্যাগী বৃদ্ধ প্রফেসব বসু ওরফে স্বামী ধর্মপাদ এখানেই নিঃসঙ্গ বাস করতেন।

গুহার বাইরে দেখলাম ইতিমধ্যেই জনাকয়েক কৌতূহলী মানুষ এসে ভীড় করেছে। বেশীর ভাগই ট্যুরিস্ট কিংবা স্থানীয় টাঙ্গাওলা। এই সংরক্ষিত এলাকায় মানুষজন কেউ বাস করে না। পুলিসও এসে গেছে খবর পেয়ে। তদন্তকারী অফিসারদের মধ্যে চোখে পড়লো ইন্সপেক্টর পাণ্ডেকে। বছর পাঁচেক আগে ধানবাদে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আর মেঘনাদের আলাপ হয়েছিল। তখন উনি ছিলেন ওই থানা-এলাকার সেকেণ্ড অফিসার।

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে আমাদের দেখে নিজেই এগিয়ে এলেন। আমাদের এ সময়ে এখানে দেখে বিলক্ষণ অবাক হয়েছেন বোঝা গেল। মেঘনাদ যখন জানাল স্রেফ ছুটি কাটাতেই সে এখানে এসেছে, ইন্সপেক্টর পাণ্ডে একটু হেসে বললেন,—কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। রাজগীর থানায়

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে বদলী হয়ে এসেছেন বছর খানেক হলো।

নাগপতিবাবুর সঙ্গেও ইনস্পেক্টর পাণ্ডের পরিচয় করিয়ে দিলো মেঘনাদ।

নাগপতিবাবু বিচলিত হেসে নিজের পরিচয় দিলেন,—চেঞ্জার। কলকাতায় অধমের সোডা-ওয়াটার ফ্যাকট্রি আছে।

নাগপতিবাবুর কথার ধরনে ইন্সপেক্টর পাণ্ডের ভ্রূ দুটো স্পষ্টই কৌতুকে নেচে উঠলো। বললেন,—তা আপনাকে দেখেই মালুম হয়।

নাগপতিবাবুর ভ্রূ দুটোও কুঁচকে উঠলো, কিন্তু ওঁকে আর ক্ষুণ্ন হয়ে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমরা ওঁকে নিয়ে পা বাড়িয়ে দিলাম গুহার ভেতরে।

কী নৃশংস হত্যা!

ভাঙা-চোরা গুহার মেঝেতে স্বামী ধর্মপাদের অশীতিপর নিষ্পাপ দেহটা পড়ে রয়েছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গুহার পাথুরে মেঝেতে জমাট বাঁধা। এখন তা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর পাণ্ডে বললেন,—এ খুন গলা টিপে করা হয়েছে।

ওই বীভৎস মৃতদেহ দেখে নাগপতিবাবুর ইতিমধ্যেই মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। আমিও কম বিচলিত হইনি। কতটা হৃদয়হীন পিশাচ হলে তবেই ওই অশীতিপর বৃদ্ধ অসহায় মানুষটাকে এভাবে খুন করা যায়। খুনী কি মানুষ?

মেঘনাদ ইতিমধ্যেই গুহার ভেতরটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। বিশেষ কিছু অবশ্য দেখার নেই। এর আগের দিন এসে যা দেখে গেছি তাই রয়েছে—

তবে মাটির তৈজসপত্তর আর ঝোলার সামান্য জিনিসগুলো, চারদিকে ছড়ানো। কেউ যেন সেগুলো তছনছ করে গেছে।

—আমি তো মশাই এই জঙ্গলের গুহায় একজন থুরথুরে বুড়ো সন্ন্যাসীকে খুন করে কার কী লাভ সেটাই এখনও বুঝতে পারছি না। ইন্সপেক্টর পাণ্ডের কথায় চমক ভাঙলো।

মেঘনাদ গুহার ভেতরটা একই ভবে চোখ বুলোতে বুলোতে বললো,—সরল পাটিগণিতের হিসেবে কি সব হিসেব মেলে ইন্সপেক্টর?

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে কয়েক সেকেণ্ড মেঘনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—এ কথাটা তো খুব সরল হিসেবে বললেন না মেঘনাদবাবু?

এ সময় গুহার বাইরে সগর্জনে একটা জীপ এসে থামলো। দেখেই বোঝা গেল জীপটা সরকারী বন বিভাগের।

জীপ থেকে এক ভদ্রলোক নামলেন। চেহারাটা কিসের সঙ্গে তুলনা করবো—বরং সরাসরি চর্বির বস্তা বলাই ভালো। বছর ৪৪ বয়স, এক মাথা টাক, মুখটা বুলডগের মতো। ভদ্রলোক জীপ থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন সন্ন্যাসী-গুহার মধ্যে। তারপর একবারও দম না ফেলে ইন্সপেক্টর পাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন,—আরে ইন্সপেক্টর পাণ্ডে, আমি তো খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছি, হাউ হরিব্‌ল্‌!—শেষ কথাটা অবশ্য স্বামী ধর্মপাদের মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে বললেন।

ইন্সপেক্টর প্রথমেই ওঁর উত্তেজনায় কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন—আসুন, আগে ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ, একজন সাংবাদিক, উনি ওঁর বন্ধু অর্ণব সেন আর নাগপতিবাবুকে দেখিয়ে গোঁফের হাসি চেপে বললেন, ইনি মিঃ নাগপতি নাগ, চেঞ্জার।

আর আপনি তো মিঃ ভোঁস, কেন্দ্রীয় বন বিভাগের স্থানীয় সহ-অধিকর্তা?

মেঘনাদ দুম করে ওর পরিচয়টা বলে দিতে বেশ অবাক হলাম। আমি তো ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখিনি বলতে পারি। ইন্সপেক্টর পাণ্ডেও বিস্মিত হয়েছেন বোঝা গেল। বললেন—তাজ্জব, আগে থেকেই আপনাদের পরিচয় আছে বলতে হয়।

— কই, আমার তো মনে পড়ছে না কবে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছেন মিঃ ভরদ্বাজ। মিঃ ভোঁসের কথায় আমার বিস্ময় আরও বাড়লো, তাইতো! মেঘনাদ ওঁকে চিনলো কি করে!

কিন্তু পরিস্থিতিটা তরল করে দিলেন নাগপতিবাবু। একগাল হেসে বললেন—আরে মশাই, মেঘনাদবাবু পেশায় হলেন গিয়ে সাংবাদিক, মানুষ দেখলেই তার শরীরে কটা আঁচিল আছে তাও বলে দিতে পারেন।

—আঃ নাগপতিবাবু!

নাগপতিবাবু কিন্তু মেঘনাদের চাপা বিরক্তিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে বললেন,—দয়া করে বাধা দেবেন না, টকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ মশাই।

—ইন্সপেক্টর পাণ্ডে,—মিঃ ভোঁস সরাসরি প্রসঙ্গ পাল্‌টে বললেন,—আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না এমন কী কারণ থাকতে পারে যাতে এ এলাকায় এক নিঃস্ব গুহাবাসী সন্ন্যাসী খুন হন?

—সন্ন্যাসী হলেও উনি যে নিঃস্ব ছিলেন, এ কথাটা কি আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন মিঃ ভোঁস?

এবার মিঃ ভোঁস ওঁর ভারী শরীরটা নিয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়ান মেঘনাদের দিকে, তারপর তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন,—আপনি কি বলতে চাইছেন মিঃ ভরদ্বাজ?

মেঘনাদ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয় না, খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে,—সেটা না হয় ক্রমশ প্রকাশ্যই রইলো।

—আই সী!—মিঃ ভোঁস ভেতরে ভেতরে যে রাগে ফুঁসছেন তা বেশ বোঝা গেল, কয়েক মুহূর্ত মেঘনাদের ওপর দৃষ্টিটা রেখে তারপর ইন্সপেক্টর পাণ্ডের দিকে ফিরে বললেন,—আপনি কি আমার সঙ্গে একটু গুহার বাইরে আসতে পারবেন ইন্সপেক্টর পাণ্ডে?

ইন্সপেক্টর একটু বিব্রতভাবে মেঘনাদের দিকে তাকাতেই মেঘনাদ বললো,—মিঃ পাণ্ডে আমার মনে হয় মিঃ ভোঁস আপনাকে বিশেষ জরুরী

কিছু বলতে চাইছেন এবং সেটা বোধহয় সকলের সামনে বলাটা ঠিক হবে না।

উত্তরে মিঃ ভোঁস শুধু নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করলেন।

এরপর ওরা দুজনে গুহার বাইরে যেতেই মেঘনাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললো,—মিঃ ভোঁস ইন্সপেক্টর পাণ্ডেকে কী বলতে গুহার বাইরে নিয়ে গেলেন অনুমান করতে পারিস অর্ণব?

—না। ঘাড় নাড়লাম। তুই পারিস?

—হ্যাঁ পারি। কিন্তু সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। মেঘনাদের গলার স্বর এবারও হেঁয়ালি বলেই মনে হলো আমার।

॥ ৬ ॥

সন্দেহের তালিকা

ইতিমধ্যে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, কিন্তু এখনও স্বামী ধর্মপাদের হত্যা-রহস্যের মীমাংসার পথে বিন্দুমাত্র এগুনো গেছে বলে তো মনে হয় না। বরং কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার যেন জড়িয়ে গিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটাই ধোঁয়াটে করে তুলেছে। এমন কি মেঘনাদের চালচলনও আজ পর্যন্ত কখনও এত রহস্যময় মনে হয়নি আমার। এবার রাজগীরে আসার পরের মুহূর্ত থেকেই ও আমার কাছে কেমন যেন দূরের মানুষ হয়ে গেছে। ও বলেছে স্বামী ধর্মপাদের অনুরোধেই নাকি রাজগীরে এসেছে। কারণ এখানকার প্রাচীন রত্নগুহার কিংবদন্তি, সেই সঙ্গে স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর বসু নামধারী অসহায় বৃদ্ধ মানুষটির ডাক উপেক্ষা করতে পারেনি....! কিন্তু আমার তো মনে হয়েছে, স্বামী ধর্মপাদের কাছ থেকে রত্নগুহায় প্রবেশের সংকেতের অর্থটা পাওয়ার ব্যাপারে ওর আগ্রহও কম ছিল না। আমি যখন বলেছিলাম—মেঘনাদ, তুই কিন্তু লোভের ফাঁদে পা দিচ্ছিস। ও আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাহলে স্বামী ধর্মপাদের মৃত্যুর পর সন্দেহের তালিকায় ও এল কেন? ইন্সপেক্টর পাণ্ডে গতকালই সন্ধ্যেবেলা মেঘনাদকে থানায় ডেকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন আগামী কয়েকটা দিন যেন তাঁর অনুমতি না নিয়ে ও রাজগীর ছেড়ে না যায়। এর অর্থ কি?

জটিলতা আরও আছে। আজ সকালে অন্য দিনের মতোই যখন নাগপতিবাবুর সঙ্গে কুণ্ড থেকে ফিরছি পথে মিঃ ভোঁসের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক জীপ থামিয়ে নিজেই আলাপ করলেন। কথায় কথায় যা শোনালেন তা শুনবো আশা করিনি। সন্ন্যাসী ধর্মপাদকে যে রাতে হত্যা করা হয়, মেঘনাদ নাকি সে রাতে সেই গুহায় ঢুকেছিল। মিঃ ভোঁস নিজে দেখেছেন।

শুনেই ব্যাপারটা নিজের মনে মিলিয়ে নিয়েছি। সে রাতে সত্যিই মেঘনাদ একা একা বাইরে বেরিয়ে অনেক রাতে হোটেলে ফিরেছে। প্রশ্ন করেও কোন

সদুত্তর পাইনি তখন। কিন্তু কথাটা শুনেই আমি মিঃ ভোঁসকে জিজ্ঞেস করলাম, অত রাতে উনিই বা সেখানে ছিলেন কেন?

মিঃ ভোঁস আচমকা আমার কাছ থেকে বোধহয় প্রশ্নটা আশা করেননি, তাই একটু ঢোঁক গিলে জবাব দিলেন তিনি নাকি গিয়েছিলেন বন-বিভাগের জরুরী তদারকে। কিন্তু সে তদারকের প্রয়োজন কী গভীর রাতেই পড়েছিল?

—অর্ণব, তুই আমায় সন্দেহ করিস?

ডাইরীর পাতা থেকে চমকে মুখ তুলে দেখি মেঘনাদ আমার পেছনে কখন এক সময় এসে দাঁড়িয়েছে। ডাইরী লেখায় এত ব্যস্ত ছিলাম বিন্দুমাত্র টের পাইনি।

—জবাব দিচ্ছিস না যে?

মেঘনাদের মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে এবার আমতা আমতা করি,—ইন্সপেক্টর পাণ্ডে কিন্তু তোকে রীতিমতই সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

—হ্যাঁ জানি। মিঃ ভোঁসই ওঁর মনে সে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

—কিন্তু সন্দেহটা কি নেহাতই অমূলক?

কথাটা বলতেই মেঘনাদ এবার কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বললো,—কী বলতে চাস?

—দুর্ঘটনার রাতে তুই সন্ন্যাসীগুহায় প্রবেশ করেছিলি, একথা কি মিথ্যে? এবার আর আমি কোন রাখ-ঢাক করি না।

—না, মিথ্যে নয়।

—তাহলে একথা তুই আগে আমায় জানাস নি কেন?

—কারণ, প্রয়োজন হয়নি। মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে এতটুকু পরিবর্তন নেই।

—কিন্তু সেটা আমার জানা প্রয়োজন। নিজেকে যতদূর সম্ভব শক্ত করে আমি বলার চেষ্টা করি,—ভুলে যাসনি মেঘনাদ, এখানে তোর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্মানও জড়িয়ে আছে........। কিন্তু আরো কিছু বলতে গিয়েও মেঘনাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন গুটিয়ে গেলাম মনে মনে। ওর দুচোখে যেন আগুন লেগেছে। কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো ও, তারপর ধীরে ধীরে বললো—অর্ণব, ইন্সপেক্টর পাণ্ডে আমায় রাজগীর ছেড়ে যেতে বারণ করলেও তোর ওপর হুকুম জারী করেন নি। ইচ্ছে করলে তুই আগামীকালই নিজের ব্যক্তিগত সম্মান নিয়ে রাজগীর ছেড়ে ফিরে যেতে পারিস।

বলেই আর দাঁড়াল না। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি শুধু বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। মেঘনাদ যে ভেতরে ভেতরে এত কঠিন, এ পরিচয় এমন ভাবে আগে কখনো পাইনি।

এ গুণটা মেঘনাদের বরাবরই আছে। খুব রেগে গেলেও শেষপর্যন্ত সংযম হারায় না। এক্ষেত্রেও তাই হলো।

এদিন রাতেই খাওয়া দাওয়ার পর হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে মেঘনাদ

অসমাপ্ত প্রসঙ্গটি তুলে তার গোপন বার্তাটি আমার কাছে প্রকাশ করলো।

মেঘনাদ জানালো, যে রাতে স্বামী ধর্মপাদ মারা যান, সেদিন সকালেই তিনি মেঘনাদকে বলেছিলেন তার পরের দিন তিনি মেঘনাদকে রত্নগুহার প্রবেশের সংকেতের অর্থ-লিপিটা দেবেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যে থেকেই নানা কারণে মেঘনাদের মনে হয়েছিল ও রাতটা প্রফেসর বসুর পক্ষে ভালো যাবে না। নেকড়ে আর হায়নার দল যে ইতিমধ্যেই ওঁর চারপাশে ঘুরতে শুরু করেছে সে ইঙ্গিত মেঘনাদ আগেই পেয়েছিল। ওদিন রাতে মেঘনাদ একা সন্ন্যাসী-গুহায় গিয়েছিল স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর বসুকে সাবধান করতে কিংবা সম্ভব হলে ওঁকে গুহা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজী করাতে।

এই পর্যন্ত শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম,—তাহলে তুই যখন যাস প্রফেসর বসু জীবিত ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—সংকেত-লিপিটা কি ওই সময় তোকে দিয়েছিলেন? প্রশ্নটা খুব দুরু দুরু বুকে ছুঁড়ে দিই।

—হ্যাঁ, দিয়েছিলেন।

মেঘনাদ উত্তরটা খুব নির্বিকার ভাবে দিলেও আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম।

—তার মানে সেই আলিবাবার গুপ্তধন অর্থাৎ রাজা বিম্বিসারের রত্নভাণ্ডারে প্রবেশের সংকেত-লিপি এখন তোর কাছে?

—হ্যাঁ।

আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিঁ ঝিঁর ডাক শুরু হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে বললাম,—কিন্তু সংকেত-লিপি যদি তুই আগেই পেয়ে থাকিস্, তবে তিনি খুন হলেন কেন?

—এর উত্তরের জন্যে আরও কটা দিন অপেক্ষা কর অর্ণব....বলতে বলতে হঠাৎ মেঘনাদ ঘরের ভেজান দরজাটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—কে? কে ওখানে? দাঁড়াও বলছি।

আমি কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এলাম। কই কেউ তো নেই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডাররা যে যার ঘরে ঢুকে পড়েছে। এমনকি কোন হোটেল-বয়কেও দেখা যাচ্ছে না। একটা অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে সিঁড়ির কাছটাতে। তবে মনে হলো সামনের সিঁড়িটা দিয়ে কে যেন দ্রুত ওপর তলায় উঠে গেল।

কেউ কি আমাদের দরজায় এসে আড়ি পেতেছিল? কে সে?

ঘরে ঢুকে দেখি মেঘনাদ নির্বিকার ভঙ্গিতে খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে রয়েছে। একটু আগের উত্তেজনা কিছুমাত্র ওর মধ্যে নেই। আমি কিছু বলার আগেই ছোট পার্সটা থেকে দুটো টিকিট বার করে অপ্রত্যাশিতভাবে বললো,—নালন্দা ট্যুরিস্ট বাসের দুটো টিকিট কেটেছি। আগামীকাল সকাল

দশটায় বাস ছাড়বে, তৈরী থাকিস।

আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও বললো—এখানে এসে অবধি তো বিশেষ কোথাও ঘোরা হয় নি, তাই......

সত্যিই কি শুধু তাই? মেঘনাদকে বুঝে ওঠা সত্যিই বড় মুশকিল। তবু বললাম,—দুটো টিকিট কেন? নাগপতিবাবু যাবেন না আমাদের সঙ্গে? আসলে উনি না থাকলে কোন যাত্রাই ঠিক যেন জমে না।

—জিজ্ঞেস করেছিলাম। মেঘনাদ হাই তুললো,—উনি বললেন, নালন্দা থেকে বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছেন। তবে আগামীকাল ওই সময় উনি যাচ্ছেন অন্য বাসে—গয়া, বুদ্ধগয়া দেখতে।

বললাম, কিন্তু যাবার আগে ইন্সপেক্টর পাণ্ডের অনুমতি নিয়েছিস তো?

ততক্ষণে মেঘনাদের নাসিকা-গর্জন শুরু হয়ে গেছে।

॥ ৭ ॥

নাগপতিবাবুর মুড

পরদিন সকালে বাস-গুমটিতে এসে যখন হাজির হলাম বেলা দশটা বাজতে তখনও আধঘণ্টা দেরী আছে। ইতিমধ্যেই স্থানটা জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। সার সার ট্যুরিস্ট বাসগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক একটার গন্তব্য এক এক জায়গায়, কোনটা যাবে নালন্দা, কোনটা গয়া, কোনটা বা পাটনা।

মেঘনাদ বললো, হাতে কিছুটা সময় রয়েছে, চল, বরং এক রাউণ্ড চা খাওয়া যাক।

চায়ের স্টলটার দিকে এগুতেই নাগপতিবাবুর সঙ্গে দেখা। উনিও আজ চলেছেন—গয়া, বুদ্ধগয়া দর্শনে। আমাদের দেখেই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন,—হ্যাল্লো মিঃ যুগলবন্দী!

হেসে বললাম—ব্যাপার কি, আমাদের অমন বিদ্‌ঘুটে নামে ডাকতে শুরু করলেন কেন?

উনি বললেন—দেখুন, সঠিক উপমা সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করায় আমার প্রজ্ঞার পরিচয় তো আপানারা আগেও পেয়েছেন?

—সঠিক ভাবেই স্বীকার করছি, কিন্তু......

—কিন্তু নয় মশাই, আপনাদের দুটিকে দেখে আমার সেই কথাই মনে হয়, যেন রবিশঙ্করের সেতার আর আলি আকবরের সরোদ।

বাহবা! বাহবা!—এবার মেঘনাদ আর আমি দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। মেঘনাদ হাসতে হাসতেই বললো,—নাগপতিবাবু আজ খুব মুডে আছেন দেখছি।

—আমি মশাই সব সময়ই মুডে থাকি—বলেই নিজের পেটে হাত রেখে বললেন,—যদি অবশ্য পেটটা না ট্রাবল দেয়।

—তা এবারে আপনার এখানে থাকার টার্গেট শেষ হতে আর কদিন বাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আর দিন তিন-চার। ওদিকে সোডা-ওয়াটার ফ্যাকট্রির কথাটাও তো ভাবতে হবে।—তবে মশাই এবারে কুণ্ডের জলটা বেশ কাজ দিয়েছে, গত ক'দিন যাবৎ চোঁয়া ঢেঁকুর, বদহজম, পেট কামড়ানি—নাথিং। সত্যিই মিরাকেল্ মশাই।

—সে তো আপনিই প্রমাণ করে ছাড়লেন। মেঘনাদ বললো,—তা আপনার বাস কোনটি?

—ওই যে 'খুকুমণি'। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লাক্সারী বাস দেখিয়ে দিলেন নাগপতিবাবু। তারপর হঠাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে মেঘনাদের আর একটু কাছ ঘেঁসে এসে বললেন,—আপনার সঙ্গে একটা সিরিয়াস কথা আছে মেঘনাদবাবু!

মেঘনাদ না হেসে পারলো না। বললো,—বলেন কি, একেবারে সিরিয়াস কথা? তবে তো আগেই শুনতে হয়। তাবপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো।— অর্ণব, তুই বরং স্টলটায় গিয়ে চট করে তিন ভাঁড় চা এখানেই দিয়ে যেতে বল্।

চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে দেখলাম মেঘনাদ আর নাগপতিবাবু একটা বড় গাছের নীচে একটা বড় পাথরের ওপব দিব্যি জমিয়ে বসেছেন।

নাগপতিবাবু বলছিলেন,—কথাটা হলো গিয়ে এখানকার বন-বিভাগের সহ-অধিকর্তা মিঃ ভোঁস সম্পর্কে।

—কি করেছেন তিনি?

নাগপতিবাবু মেঘনাদের আব একটু কাছাকাছি সরে এসে বললেন,— আপনার সঙ্গে কি ওঁর কোন মত-বিরোধ বা এ ধরনের কিছু ঘটেছে নাকি?

—কেন বলুন তো?

—ভদ্রলোক তো ক'দিন যাবৎ নানাভাবে আপনার সম্পর্কে খবরাখবর জেনে বেড়াচ্ছেন, মানে আপনি কখন হোটেল থেকে বেরোন, কোথায় যান,....বলতে বলতে নাগপতিবাবুর কণ্ঠস্বর কেমন রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগলো।—গতকাল সন্ধ্যেবেলা হোটেলের এক ছোকরাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন দেখলাম। অন্ধকারে আমি যে পাশেই ছিলাম, বোধহয় টের পাননি।

শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, একেই বলে সঙ্গদোষ। নাগপতিবাবুকে পর্যন্ত মেঘনাদ গোয়েন্দা না করে ছাড়লো না। মেঘনাদ কিন্তু বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই কিছুক্ষণ ভাবনার ভান করলো, তারপর বললো,—এমনও তো হতে পারে মিঃ ভোঁসের আমাকে হঠাৎ ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছে। আমায় অবিবাহিত জেনে ওঁর বোনের সঙ্গে বিবাহ দেবার কথা ভেবেই.....

নাগপতিবাবুর বিমূঢ় মুখটার দিকে তাকিয়ে মেঘনাদ আর বাকিটা শেষ করলো না। নাগপুতবাবু ওই ভাবেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর মেঘনাদের 'কৌতুকটা হজম করে বললেন, —আপনার মশাই জবাব নেই। তা পাত্র হিসাবে শ্যালকটির পরিচয় জানাও তো আপনার দরকার।

—তাঁর পরিচয়টা কী শুনবেন? মেঘনাদ এবার নাগপতিবাবুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল,—মিঃ ভোঁসের প্রকৃত নাম নগেন বসু। বোস টাইটেলটা উনি যে কোন কারণেই হোক বিকৃত করে 'ভোঁস' করেছেন, যেমন রায় থেকে 'রে', মিত্র থেকে 'মিটার'।

আমি লক্ষ্য করলাম নাগপতিবাবুর চোখদুটো ততক্ষণে বিস্ময়ে রসগোল্লার আকার ধারণ করতে শুরু করেছে।

মেঘনাদ বলে চলে, —আর এও নিশ্চয়ই জেনেছেন মিঃ ভোঁস এখানে বদলী হয়ে গেছেন মাত্র দু'মাস হলো এবং......এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থমকে গেল মেঘনাদ, তারপর যেন নিজেকে শুনিয়েই বললো, —না, আপাতত এর বেশী কিছু বলা যাবে না।

নাগপতিবাবু শুনতে শুনতে ততক্ষণে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মেঘনাদের কথা শেষ হলে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, —মশাই, আপনি কি জ্যোতিষচর্চা করেন!

—না পরচর্চা! বলেই নাগপতিবাবুর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মেঘনাদ বললো, —পেশা আমার সাংবাদিকতা, অর্থাৎ পরের হাঁড়ির খবর রাখাই আমার কাজ।

এদিকে চা এসে গেছে, ওদিকে নাগপতিবাবুর —খুকুমণি'-ও হাঁক-ডাক শুরু করে দিয়েছে, সুতরাং আর অপেক্ষা না করে ভাঁড় হাতেই বাসের দিকে দৌড়োলেন উনি।

আমরাও চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসের দিকে।

॥ ৮ ॥

হায়নার টোপ

বাসে যেতে যেতে মেঘনাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিঃ ভোঁস সম্পর্কে এত তথ্য ও সংগ্রহ করলো কখন! মেঘনাদ হেসে জবাব দিয়েছে, —চোখ আর মনটা খোলা রাখলে যে কোন ব্যাপারই জানা অসম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছি, —মিঃ ভোঁস, যার আসল নাম নাকি নগেন বসু, তার সঙ্গে কি স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর সদাশিব বসুর কোন রক্ত-সম্পর্ক আছে?

মেঘনাদ সংক্ষেপে শুধু বলেছে, —সে রকমই তো জেনেছি।

নালন্দা দেখে আমাদের ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গেল। বাস হোটেলের

সামনেই নামিয়ে দিয়ে গেল আমাদের।

সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। বেশ ক্লান্ত পদক্ষেপেই হোটেলে পা দিলাম।

কিন্তু ঘরের সামনে এসেই চমকে উঠলাম।

ঘরের তালা খোলা।

দৌড়ে ভেতরে ঢুকলাম। একি! সারা ঘর লণ্ডভণ্ড। স্যুটকেসের তালা ভাঙা। ভেতর থেকে জামা, প্যান্ট, কাগজ-পত্তর সব বাইরে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিছানা-বালিশও ওলট-পালট।

মেঘনাদ বললে, —কোন মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটেছিল। তার পরেই তালা খোলা স্যুটকেসটার মধ্যে কী যেন খুঁজে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,—যা ভেবেছি, একটা জিনিসই শুধু খোয়া গেছে।

—কি সেটা?

—রাজা বিম্বিসারের রত্নগুহায় প্রবেশের সংকেত-লিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটা।

—কি সর্বনাশ! শুনেই আমার মাথাটা ঘুরে গেল।

—হ্যাঁ। মেঘনাদ কিন্তু খুব সহজ ভাবেই বললো, —এটাই আমি আশা করেছিলাম।

—আশা করেছিলাম মানে! তুই জানতিস চুরি হবে?

—জানতাম। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর একই পর্দায় বাঁধা।

—তা সত্ত্বেও তুই ওই সংকেত-লিপিটা এভাবে এখানে রেখে গিয়েছিলি? —আর আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না।

আশ্চর্য! মেঘনাদের দু'চোখে চকচক করছে কৌতুক। একটু বাদে ধীরে ধীরে বলে, —জঙ্গলে বাঘ-শিকারের সময় শিকারী মাচার নীচে আস্ত ছাগল বেঁধে রাখে জানিস তো? বলতে বলতেই হঠাৎ মেঝে থেকে কী একটা কুড়িয়ে নেয় মেঘনাদ, —এটা এখানে এল কি করে।

আধপোড়া চুরুটের টুকরো। দামী হাভানা ব্র্যাণ্ড।

এ চুরুট এ হোটেলের একজনকেই খেতে দেখছি। কিন্তু ওপর তলার সেই রিটায়ার্ড ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকটি তো গত দু'দিনের মধ্যে এ ঘরে পা দেননি আর চুরুটের টুকরোটা যে এ ঘরে আজ সকালেও ছিল না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

বললাম,—মেঘনাদ আমার মনে হয় হোটেলের ম্যানেজারকে একবার খবর দেওয়া দরকার।

—না, দরকার নেই।

—কি বলছিস তুই, —ঘরের মধ্যে থেকে ওই অমূল্য জিনিসটা চুরি হয়ে গেল......বলতে বলতে মেঘনাদের চোখের ওপর চোখ পড়তে থমকে যাই।

ও দৃষ্টি আমার চেনা। মেঘনাদ ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলে—হায়নায় টোপ গিলেছে অর্ণব।

—টোপ!

হ্যাঁ, টোপ। যেটা ঘরে রেখে গিয়েছিলাম, সেটা আসল নয়—আমারই তৈরী একটা জাল সংকেত-লিপি। ঝুটো কাগজ।

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে মেঘনাদ এবার আমায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—চল, এক্ষুনি যেতে হবে।

—কোথায়?

—থানায়।

॥ ৯ ॥

স্রেফ টেলিপ্যাথি

থানায় ঢুকে অবাক হলাম।

আমাদের হোটেলের ওপর তলার ঘরের সেই রিটায়ার্ড ট্যুরিষ্ট ভদ্রলোকটিকে এখানে ইন্সপেক্টর পাণ্ডের টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখবো মোটেই আশা করিনি। মেঘনাদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম—ওর মনের ভাব আমার থেকে খুব একটা পৃথক নয়।

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে আমাদের সরবেই অভ্যর্থনা জানালেন, —আসুন আসুন মেঘনাদবাবু, অর্ণববাবু, নমস্তে। আমার মনে হচ্ছিল খুব জলদি এ কোতোয়ালিতে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়বে।

—এ রকম মনে হওয়ার কারণ? —মেঘনাদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বললো।

—স্রেফ টেলিপ্যাথি মশাই! —ইন্সপেক্টর পাণ্ডেকে দেখে মনে হলো ওঁর ভেতরে কী একটা চাপা রহস্য খেলা করছে।

—আপনার টেলিপ্যাথির জোর আছে স্বীকার করছি। তা রুস্তমজীবকেও কি স্পেফ টেলিপ্যাথিতেই এখানে টেনে এনেছেন নাকি? মেঘনাদ কেমন যেন তির্যক কৌতুকে কথাটা ছুঁড়ে দেয়।

ইন্সপেক্টর বলেন—হ্যাঁ, ইনি তো আপনাদের একই হোটেলের প্রতিবেশী।

—তা রুস্তমজী এখানে কী মনে করে? —মেঘনাদ একটা সিগারেট ধরায়।

—থানায় লোকে আর কী কারণে আসে বলুন? উত্তরটা ইন্সপেক্টর পাণ্ডে দিলেন,—আজ দুপুরের দিকে কে বা কারা ওঁর ঘরে তালা ভেঙে ঢুকে ঘর তছনছ করে গেছে।

আশ্চর্য! এমন তো হবার কথা নয়। আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো।

—রুস্তমজী, সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন? প্রশ্নটা মেঘনাদের।

রুস্তমজী একটু ইতস্তত করে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন—মানে, টাঙ্গায় চড়ে একটু গিয়েছিলাম ওল্ড রাজগীর ফরেস্টে।

—জায়গাটা আপনাকে রোজই টানে দেখছি। মেঘনাদ নিবিষ্ট মনে সদ্য ছাড়া সিগারেটের ধোঁয়াব রিং পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললো।

—হ্যাঁ....মানে, মাইথোলজিক্যাল অ্যাণ্ড হিস্টোরিক্যাল ইন্টারেস্টটা আমার একটু বেশীই আছে.....এই রাজগীরেই তো ফোর টাইমস্ এলাম। রুস্তমজী আরও কিছুটা আমতা আমতা করে বললেন।

—ফোর টাইমাস্। মেঘনাদ মনে মনে পুনরাবৃত্তি করলেও আমার কান এড়াল না। তারপরই মেঘনাদ রুস্তমজীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—আপনি কি দেখেছেন, আপনার ঘর থেকে কী খোয়া গেছে?

—সেটাই তো আশ্চর্য মশাই, ইন্সপেক্টর পাণ্ডেই উত্তরটা দিলেন,—চোর এসে ঘর লণ্ডভণ্ড করে গেল, অথচ কী চুরি হল তা উনি টের পেলেন না।

রুস্তমজী কাঁচুমাচু ভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাব আগেই মেঘনাদ বললো, —রুস্তমজী, আমি বলতে পাবি আপনার কী খোয়া গেছে। এক প্যাকেট হাভানা চুরুট।

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, —স্রেফ চুরুট!

রুস্তমজী তখনও ইতস্তত করছেন দেখে মেঘনাদ এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললো. —ঠিক বলেছি কিনা?

–ইয়েস, ইয়েস মেঘনাদবাবু। রুস্তমজী এবার ঘাড় নাড়েন। —আপনি ঠিকই বলেছেন। চুরুটের প্যাকেটটা আমার আজ বিকেল থেকে মিসিং। ওটা তো ঘরেই ছিল।

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রুস্তমজীর দিকে। স্বাভাবতই এ ধরনের চুরিব কথা উনি আগে কখনও শোনেননি।

কিন্তু এর মধ্যে কোন চাল নেই তো? মানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেবার প্রচেষ্টা? অর্থাৎ আমাদেব ঘরে অসাবধানে হাভানা চুরুট ফেলে যাওয়ার ব্যাপারটা ম্যানেজ করতেই... !

মেঘনাদ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইন্সপেক্টরকে ও বললো, —রুস্তমজীর ডাইরী নেওযা কি আপনার শেষ হয়েছে?

—কেন বলুন তো?

—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

—মনে হচ্ছে কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়?

—কী করে বুঝলেন?

—টেলিপ্যাথি।

মেঘনাদ ঠোঁট চেপে হেসে বললো. —ঠিকই বলেছেন। তারপর রুস্তমজীর দিকে তেরচা ভাবে তাকিয়ে বললো, —তবে সময় বেশী নেব না কারণ আমি জানি রুস্তমজীর বক্তব্য এখনও কিছু বাকী থেকে গেছে।

—সেটা আপনি কী করে জানলেন?

ইন্সপেক্টর পাণ্ডের কথাটা শেষ হবার আগেই মেঘনাদ ইন্সপেক্টরের কথার ভঙ্গিতেই তাঁর কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো—ওই যে, টেলিপ্যাথি!

এবার আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম—শুধু রুস্তমজী ছাড়া!

॥ ১০ ॥

নাগপতিবাবুর মহা-নিষ্ক্রমণ

নাগপতিবাবু কলকাতায় ফিরছেন।

ওঁকে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছি আমি আর মেঘনাদ। ভদ্রলোক ক'দিন আমাদের পাশে থেকে বেশ জমিয়ে দিয়ে গেলেন। বিশেষত উনি না থাকলে আমার সময়টা তো খুবই খারাপ যেত। কারণ মেঘনাদের সঙ্গী হয়ে এবার রাজগীরে এসেছিলাম বটে কিন্তু এসে অবধি তো সন্ন্যাসী-গুহার রহস্য নিয়েই বেশীরভাগ সময়টা ও মেতে থেকেছে, এ সময় নাগপতিবাবুই যা সঙ্গ দিয়েছেন। আর মানুষটা এমনিতে যত বাতিকগ্রস্তই হোন না কেন মানুষকে যে কোন সময়ে মাতিয়ে রাখার যে বিশেষ ক্ষমতা রাখেন, তা তো এই ক'দিনেই টের পেয়েছি।

নাগপতিবাবুর ফেরাটাও রীতিমত একটা নাটক। এই সাত সকালে শরীরে পোশাক যা চাপিয়েছেন, মনে হচ্ছে এভারেস্ট না হোক তার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে যাত্রা করেছেন। ওভারকোট, মাফলার, হনুমান টুপি, মোজা, বুটজুতো কিছুই বাকী নেই। একা মানুষটার জন্যে গোটা সাতেক লটবহর। তার মধ্যে গোটা তিনেক কুঁজো। গোটা চারেক কুলীর মাথায় মালপত্তর তুলে রীতিমত কলরব করতে করতে উনি স্টেশনে ঢুকলেন। কুলীদের কড়া গলায় হুকুম দিলেন, —'ট্রেন কিন্তু স্টেশনে যেমনি আয়গা, অমনি এসে এক সাথ্ মালপত্তর তুলে দেগা। বুঝা হ্যায়?' কুলীরা তো মুচকি হেসে 'হাঁ বাবু' বলতে বলতে মাথা নেড়ে চলে গেল।

নাগপতিবাবুর হিন্দির দৌড় দেখে অতি বড় হিন্দী বিশারদও লজ্জা পাবে।

নাগপতিবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনের একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসে বললেন—উঃ, সব মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে যাবার ঝামেলা কি কম? তারপর কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে বললেন, —আঃ, এতক্ষণে প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো।

মেঘনাদ বললো, —আপনি কি ওই তিনটে কলসীতে এখানকার কুণ্ডের জল ভরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

—এ তো আমি প্রতি বছরই নিয়ে যাই মেঘনাদবাবু। বিশেষ প্রক্রিয়ায় রেখে সারা বছর অন্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাই। নাগপতিবাবু মাফলারের ফাঁসটা একটু আলগা করতে করতে বললেন।

আমি হেসে বললাম, —আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সোডা-ওয়াটার ফ্যাকট্রিতে সোডা ওয়াটারের বদলে ওই জলই সাপ্লাই করতে চাইছেন।

নাগপতিবাবু হা হা করে হেসে বললেন, —তা করলেও খদ্দের ঠকবে না, এ আপনাকে বাজি রেখে বলতে পারি অর্ণববাবু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল। ধীর গতিতে ট্রেনটা ঢুকতে শুরু করেছে স্টেশনের মধ্যে।

স্টেশনের লোকজনের ব্যস্ততাও বেড়ে গেছে চকিতের মধ্যে। এর মাঝে যেন নাগপতিবাবুর হাঁকডাকটাই শোনা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী। চারজন কুলী এসে মাল ধবে টানাটানি করে মাথায় তোলে। নাগপতিবাবু ট্রেনের দিকে পা বাড়াবার আগে আব একবার পিছু ফিবে বললেন, —অর্ণববাবু, মেঘনাদবাবু, কলকাতায় ফিরে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে ভুলবেন না।

বললাম, —ভাবেন না, এমনি না যাই, পেটের গণ্ডগোল তো কোন না কোনদিন হবেই তখন না হয়......

নাগপতিবাবু আমার কথা শেষ হবার আগেই হেসে উঠলেন। তারপব কুলীদের তাড়া লাগিয়ে ট্রেনটার দিকে এগিযে গেলেন।

কিন্তু নাগপতিবাবুব ট্রেনে চড়া হলো না।

তার আগেই জনাকয়েক লোক এসে ঘিবে ধরলো ওঁকে। সকলেরই পরণে সাধাবণ পোশাক। ওদের মধ্যে ইন্সপেক্টর পাণ্ডেও রয়েছেন। তবে কি ওবা সবাই সাদা পোশাকে পুলিশের লোক? কিন্তু এ সময়ে পুলিশ কেন?

ইন্সপেক্টব পাণ্ডে নাগপতিবাবুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গম্ভীব গলায় বললেন, —দাঁড়ান। এ ট্রেনে আপনার যাওয়া হবে না।

এটা কি কোন রসিকতা নাকি

নাগপতিবাবুও দাঁড়িযে পড়েছেন। খুব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, --যাওয়া হবে না? কেন?

—কারণ আপনাব খেলা শেষ হযে গেছে। ইউ আব আণ্ডার অ্যাবেস্ট।

আমার চোখেব সামনে হঠাৎ যেন একটা বাজ পড়লো। কয়েক সেকেণ্ড থমকে থেকে চেঁচিযে উঠলাম, —ইন্সপেক্টব পাণ্ডে এসব কী বলছেন আপনি? মেঘনাদ তুই কিছু বল।

আমার পাশে দাঁড়িযে মেঘনাদ খুব শান্ত কণ্ঠে বললো—ইন্সপেক্টব পাণ্ডেকে ওঁর কর্তব্য কবতে দে অর্ণব।

—তার মানে?

—তার মানে, সে রাতে সন্ন্যাসী গুহায় স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর সদাশির বসুকে নৃশংসভাবে যিনি খুন করেছিলেন তিনি আমাদের এই পরম বসিক বন্ধু শ্রীমান নাগপতি নাগ।

আমি ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিয়ে রইলাম।

আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না।

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে হেসে বললেন, —হ্যাঁ, রসিক নাগপতিবাবু। কিন্তু ওঁর এ রসিকতা বড় নির্মম।

নাগপতিবাবুর মুখ চোখের চেহারা ততক্ষণে বদলে গেছে। আমাদের পরিচিত মানুষটা যেন আর নেই। মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে ক্রোধ, দু'চোখে হিংসা। সাপের মতো হিস্ হিস্ কণ্ঠে উনি গর্জন করে উঠলেন, — এ চক্রান্ত! আমি দেখে নেব।

আর সেই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা হুইসিল দিয়ে চলতে শুরু করতেই নাগপতিবাবু হঠাৎ ইন্সপেক্টর পাণ্ডেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রস্তুত ছিল মেঘনাদ। পেছন থেকে জুডোর এক প্যাঁচে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই শুইয়ে দিল নাগপতিবাবুকে।

এরপর নাগপতিবাবু আর কিছু করার আগেই ইন্সপেক্টরের হুকুমে জমাদাব সুন্দরলাল ঝট্পট নাগপতিবাবুর হাত দুটোতে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।

॥ ১১ ॥

রহস্য-ভেদের ইতিবৃত্ত

এখন কাহিনীর যেটুকু বাকী রইলো—হত্যাকাণ্ডের কারণ, কৌশল এবং আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় সম্পর্কে জানা।

আলোচনা চলছিল থানায় বসে ইন্সপেক্টর পাণ্ডের ঘরে।

বক্তা মূলত মেঘনাদ, শ্রোতাদের মধ্যে আমি আর ইন্সপেক্টর পাণ্ডে ছাড়াও আছেন রুস্তমজী ও মিঃ ভোঁস।

রুস্তমজী তাঁর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, —নাগপতিবাবু ইজ এ জিনিয়াস অ্যাকটর, কিন্তু উনি হঠাৎ সাধুজীকে মার্ডার করতে চাইলেন কেন?

—এজন্য হয়তো আমি নিজেও কিছুটা দায়ী রুস্তমজী।

মেঘনাদের কথায় ইন্সপেক্টর পাণ্ডেও চমকে উঠনেল—আপনি দায়ী!

—হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর পাণ্ডে। মেঘনাদের কণ্ঠে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। রাজগীরে রাজা বিম্বিসার-রত্নগুহা সম্পর্কে কিংবদন্তি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর সদাশিব বসুর জীবন-কাহিনী, তাঁর সংকেত-লিপির অর্থ উদ্ধারের কথা—এ সবই আগে থেকে জানতেন নাগপতিবাবু। শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছর যাবৎ উনি প্রায়ই রাজগীরে এসে প্রফেসর বসুর সঙ্গে দেখা করতেন ওই সংকেত-লিপিটা হাতানোর উদ্দেশ্যে.....কিন্তু যে কোন কারণেই হোক প্রফেসর বসু যখন আমাকে সে সংকেত-লিপি দেবার মনোভাব প্রকাশ করলেন, নাগপতিবাবু তা জানার পর থেকে ভেতরে ভেতরে হিংস্র হয়ে উঠলেন....।

—এবং বলতে চান, সেই রাতেই গুহায় ঢুকে প্রফেসর বসুকে খুন করলেন। ইন্সপেক্টর পাণ্ডে মেঘনাদের অসম্পূর্ণ কথাটা সম্পূর্ণ করলেন।

—ব্যাপারটা সে রকমই। মেঘনাদ বললো।

—কিন্তু মেঘনাদ, নাগপতিবাবুই যে হত্যাকারী এ তথ্য তুই জানলি কি করে? অনেকক্ষণ ধরেই আমার মনে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মেঘনাদ নড়ে চড়ে বসলো, বললো, —হ্যাঁ, এটাই আজকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হত্যার দিন রাত্রে তিন ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে সন্ন্যাসী গুহায় প্রবেশ করেছিল। একজন হত্যাকারী, দ্বিতীয় জন আমি আর তৃতীয় জন....বলতে বলতে মেঘনাদ থমকে ঘরের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো —সেটা বরং আমার এই যন্ত্রটা থেকেই শুনুন।

পাশে রাখা ব্যাগটা থেকে মেঘনাদ একটা ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার বার করে সামনের টেবিলটার ওপর রাখে। তারপর আবার বলতে শুরু করেঃ সে রাতে সন্ন্যাসী-গুহায় আমিই সবার আগে যাই। সন্ন্যাসী স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর বসু তখনও জীবিত ছিলেন। আমার মন বলছিল সে রাতটা প্রফেসর বসুর পক্ষে ভাল যাবে না। আমি চেয়েছিলাম প্রফেসরকে অন্তত তখনকার মতো কোন নিরাপদস্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু উনি রাজী হলেন না। —অবশেষে গুহা ছেড়ে আসার সময় এই টেপ-রেকর্ডারটা সচল অবস্থায় রেখে আসি ভাঙা গুহার ভেতরে এক বড় পাথরের আড়ালে এবং পরদিন সকলের অলক্ষ্যে গোপনে সেটা নিয়ে এসেছিলাম।

সবাই তাজ্জব হয়ে শুনছিল মেঘনাদের অসাধারণ তৎপরতার কাহিনী। বিপুলদেহী মিঃ ভোঁস শুধুমাত্র কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন মনে হলো।

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে বললেন—টেপ-রেকর্ডারটা চালু করুন মেঘনাদবাবু।

—তথাস্তু। দারোগার হুকুম অমান্যি করার সাহস রহস্যভেদীরও নেই। মেঘনাদ চাপা কৌতুকে কথাটা উচ্চারণ করে টেপ-রেকর্ডার চালু করে দিল।

শুনতে পাওয়া গেল সে রাতে গুহায় প্রবেশকারী সেই ব্যক্তির সঙ্গে স্বামী ধর্মপাদের কথোপকথন ঃ

"ঠাকুরদা!

—(জরাগ্রস্ত কণ্ঠে) কে! ও নগেন?

—হ্যাঁ, তুমি আসতে বারণ করলেও আবার এলাম। বলতে পারো, তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি আমি?

—অপরাধ! (দীর্ঘশ্বাস) না, সব অপরাধ আমার!

—ঠাকুরদা, জানি বাবা তোমায় একদিন অপমান করেছে। তোমার সারাজীবনের সাধনাকে অপমান করে সবটাই তোমার পাগলামি মনে করেছে। কিন্তু সেজন্যে কি আমি দায়ী? আমি তখন নিতান্তই ছোট।

—আঃ নগেন, ও সব কথা আমার আর শুনতে ভাল লাগছে না।

—কিন্তু ঠাকুরদা, আমি তোমার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

—উত্তরাধিকারী! (হেসে ওঠেন) এতক্ষণে তোমার উদ্দেশ্যটা জাহির করে ফেললে দাদুভাই.... (হঠাৎ উত্তেজিত) নাঃ, আমি কাউকে স্বীকার করি না! যাদের সঙ্গে একদিন সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছি, তাদের আর আমার কাছে কোন দাবী থাকতে পারে না।

—(হতাশ ভাবে) বেশ, চলে যাচ্ছি.....কিন্তু আমি আবার আসব.....।

—অঃ—যা ও—যা ও! (হাঁফাতে থাকে)

মেঘনাদ টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে।

কেউ কোন কথা বলে না। মেঘনাদ খুব ধীর কণ্ঠে বলে, —আশা করি কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তিকে আপনারা সবাই চিনতে পারছেন?

—একজন তো স্বামী ধর্মাপাদ, কিন্তু অন্য জন.....

—অন্যজন মিঃ নগেন বসু। স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর সদাশিব বসুর নাতি। যাকে আমরা চিনি মিঃ ভোঁস পরিচয়ে! মেঘনাদই মিঃ পাণ্ডের অসম্পূর্ণ ব্যক্যটি সম্পূর্ণ করলো।

মিঃ ভোঁস আমতা আমতা করে একটা কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মেঘনাদ তার আগেই বললো, —আপনার উতলা হবার কারণ নেই মিঃ ভোঁস। সে রাতে অন্য যে উদ্দেশ্যেই গুহায় প্রবেশ করে থাকুন, টেপ-রেকর্ডার অন্তত একথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে প্রফেসর বসুর হত্যাকারী আপনি নন—বলতে বলতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে মেঘনাদ বললো, —ইন্সপেক্টর পাণ্ডে, আশা করি এবার বুঝতে পারছেন সে রাতে গুহায় আমার উপস্থিতির কথা মিঃ ভোঁস কী ভাবে জেনেছিলেন?

—হুম! ইন্সপেক্টর পাণ্ডে আপনমনেই গোঁফ চুমরলেন।

—তাহলে এবার মিঃ ভোঁস গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার পর যে তৃতীয় ব্যক্তি সেই গুহায় ঢুকেছিল, তার সংলাপ শুনুন!

মেঘনাদ অবার টেপ-রেকর্ডার চালু করে :

—কে?

—আমি নাগপতি।

—(বিরক্ত হয়ে) তুমি আবার এসেছ! আঃ! আমি তো বহুবার বলেছি, রত্নগুহার সংকেত-লিপি আমি তোমায় দেবো না।

—কিন্তু ওটা যে আমার চাই-ই প্রফেসর!

—কোন্ অধিকারে?

—যদি বলি, যে অধিকারে মেঘনাদ ভরদ্বাজ আপনার কাছ থেকে ওটা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

—ওঃ তবে সব খবরই রাখো! কিন্তু এ কথাও জেনে রাখ একমাত্র সে-ই এ জিনিস পাবার যোগ্য অধিকারী।

—নাঃ। বছরের পর বছর ধরে বারবার আমি আপনার কাছে এসেছি

শুধু এই একটি কারণে।

—তুমি লোভী, প্রতারক।

—আর আপনি বেড়াল-তপস্বী!

—নাগপতি!

যদি বলি, সংসারের প্রতি হতাশায় বাধ্য হয়ে আপনি সর্বত্যাগীর ভেক ধরেছেন! আমি আপনার ইতিহাস সব জানি প্রফেসর বোস!

—তুমি দূর হয়ে যাও।

—সংকেত-লিপি না নিয়ে নয়।

—আমি দেব না।

—দিতে বাধ্য হবেন।

—কী করবে তুমি? আমায় খুন করতে চাও?

—যদি দরকার হয়।

—আমায় তুমি বৃথা ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ মুর্খ!

—(অধৈর্য হয়ে) আঃ। আমি জানতে চাই কোথায় রেখেছেন সেটা?

(জিনিসপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি, ছোঁড়াছুঁড়ির শব্দ)

—পাবে না, কিছুতেই পাবে না....খুঁজে যাও সারা রাত! (উদ্দাম হাসি)

—(হিংস্রকণ্ঠে) প্রফেসর বোস, এই শেষ বার বলছি—

—নাগপতি, তুমি মরবে। লোভের আগুন আর অভিশাপে। পালাও, পালিয়ে যাও!

—হ্যাঁ, যাব... কিন্তু তার আগে তোমাকেও পাঠিয়ে দিয়ে যাই তোমার তথাগতের কাছে!

—আঃ—আহ......আ (কয়েক সেকেণ্ড গোঙানি, ঝটাপটির শব্দ, তারপর চুপচাপ। একটু বাদে, দুমদাম পায়ের শব্দ ছুটে চলে যায়।)" মেঘনাদ টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে। উপস্থিত কারুর মুখে কোন কথা নেই।

আমিই প্রথম নীরবতা ভাঙি, —হ্যাঁরে মেঘনাদ, নাগপতিবাবুকে হত্যাকারী হিসেবে তো অনেক আগেই গ্রেফ্‌তার করা যেত।

দাবার শেষ কিস্তির চালটা কি সময়ের আগে দেওয়া যায় বন্ধু? মেঘনাদ বিষণ্ণ হাসি হাসলো—তাছাড়া এ হত্যাকাণ্ডের আরও কিছু প্রমাণ-সূত্র এবং অন্য কারুর কোন ভূমিকা ছিল কিনা, সেটাও তো বুঝে নেবার দরকার ছিল।

—ঠিক বাত! ইন্সপেক্টর পাণ্ডে ঘাড় নাড়লেন।

—নাগপতিবাবু অবশ্য কয়েকদিন যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন সমস্ত সন্দেহটা যাতে রুস্তমজী কিংবা মিঃ ভোঁসের ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়। এমনকি সংকেত-লিপি আমার কাছে আছে জেনে সেদিন গয়া বেড়াতে যাবার নাম করে ট্যুরিস্ট বাসে মাঝপথে নেমে ফিরে এসে আমাদের ঘর লণ্ডভণ্ড করে যাবার সময় চুরুটের পোড়া টুকরোটাও কায়দা করে ফেলতে ভোলেন নি।

কিন্তু এত করেও আসল সংকেত-লিপি উনি পেলেন না। আসল ভেবে যেটা নিয়ে গেলেন সেটা আমারই তৈরী এক জাল-লিপি।

—আচ্ছা মেঘনাদবাবু, সেই আসল সংকেত-লিপিটা তাহলে তো এখন আপনার কাছে? মিঃ ভোঁস এতক্ষণ যে কথাটা জানার জন্যে হাঁস-ফাঁস করছিলেন এবার তা বলে ফেললেন।

—হ্যাঁ মিঃ ভোঁস। মেঘনাদ এবার মিঃ ভোঁসের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, —কিন্তু আমি দুঃখিত, আপনার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মোক্ষম দাবীটাও বোধ হয় আমার কাজে লাগবে না।

বলতে বলতে একটা ভাঁজ-করা কাগজ ব্যাগ থেকে বার করে মিঃ ভোঁসের দিকে এগিয়ে দিতেই মিঃ ভোঁস সেটা প্রায় ছোঁ মেরে হাতে নিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তারপরই অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন, —একি! এ তো অস্পষ্ট কয়েকটা কালির আঁচড়টানা বহু পুরনো একটা কাগজের টুকরো মাত্র।

—হ্যাঁ আজ শুধু তাই। কিন্তু বিশ বছর আগে প্রফেসর বসু এই কাগজের মধ্যেই নিজের হাতে লিখে রেখেছিলেন—তাঁর পাঠোদ্ধার করা রাজা বিম্বিসার-রত্নগুহায় প্রবেশের সংকেতের অর্থ।

চরম হতাশায় মিঃ ভোঁসের বিপুল দেহটা সামনের টেবিলের ওপর যেন ধ্বসে পড়ে যায়।

॥ ১২ ॥

রইলো শুধু ভাবনা

ট্রেন ফিরে চলেছে রাজগীর ছেড়ে।

জানলার ধারে মুখোমুখি বসেছিলাম আমি আর মেঘনাদ।

মেঘনাদ বলছিল, —এ কাহিনীর সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি কি জানিস অর্ণব, গত দশ বছর যাবৎ স্বামী ধর্মপাদ ওরফে প্রফেসর সদাশিব বসু চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। তাই মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারেন নি যে গত বিশ বছর ধরে যক্ষের ধনের মতো যা তিনি আগলে রেখেছিলেন, তা নোনা পাথর আর কালের নিষ্ঠুরতায় কবে একটু একটু করে জীর্ণ হয়ে গেছে!

আমি তখন ভাবছিলাম—এই এক টুকরো বাতিল কাগজ, যার জন্যে স্বামী ধর্মপাদ সর্বত্যাগী হয়েও জীবনের শেষ বেলায় নিষ্ঠুর অততায়ীর হাত থেকে রেহাই পেলেন না! বোধ হয় জীবনকে উনি অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন

বলেই. জীবন এমনিভাবে ওঁর ওপর প্রতিশোধ নিল।

মেঘনাদের শেষ, মন্তব্যটা কানে এল : কে জানে আজও সত্যিই কোন গুপ্তধন-ভাণ্ডার ওখানে আছে কিনা, তবে বহুযুগ আগে পুত্র অজাতশত্রুর হাতে কারারুদ্ধ রাজা বিম্বিসার পুত্রের লোভ আর লালসার প্রতি যে অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন আজও বোধ হয় তা ওই রত্নগুহার বাতাসে জমাট বেঁধে আছে— আর সে অভিশাপ মাথায় নিয়েই জীবনটা কাটাতে হলো প্রফেসর বসুকে, নাগপতিবাবুও রেহাই পেলেন না।

আমি কোন কথা বলছিলাম না। চুপচাপ তাকিয়ে ছিলাম ট্রেনের জানলা দিয়ে দূরে। নিভে আসছে দিনের আলো। জমাট বাঁধছে কুয়াশা। ফেলে আসা রাজগীরের ধূম্র-পাহাড়ের রেখা এখন ক্রমশই অস্পষ্ট অস্পষ্টতর!

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের ভেতর থেকে!

ছিন্নমস্তার খাঁড়া

॥ এক ॥

রহস্যের হাতছানি

ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের কথার দাম আছে।

তেজপুর এয়ারপোর্টের বাইরে পা দিয়ে মেঘনাদ আর আমি যখন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোক বেশ সুপুরুষ। পরণে সার্জের স্যুট। মাথায় রেশমের টুপি। সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই রহস্যভেদী মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ, আর মিঃ অর্ণব সেন! আমি ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে।

আমরা পরস্পর করমর্দন করলাম।

তারপর কিছু বলার আগেই ডঃ পাণ্ডে বললেন, আপনাদের আসার টেলিগ্রামটা গতকালই পেয়েছি। আসুন জিপ অপেক্ষা করছে।

একটা ধুলিধূসর জিপগাড়ি এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে উঠতেই ডঃ পাণ্ডে নিজেই ড্রাইভিং সীটে বসে জিপে স্টার্ট দিলেন। জিপ ছুটে চললো গহন অরণ্যপথ অতিক্রম করে।

ব্যাপারটা একটু গোড়া থেকে বলতে হয়।

দিন চারেক আগেই সকালের দিকে মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে আমি আর মেঘনাদ যখন বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, ঠিক এ সময়েই চিঠিটা এল।

সুদূর অরুণাচল রাজ্য থেকে মেঘনাদের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছেন কোনো এক ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকেছে মেঘনাদ। এ নামের কাউকে সে চেনে বলে মনে পড়ছে না। তবু এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

ইংরাজিতে লেখা। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় এরকম :

মাননীয় মেঘনাদবাবু,

আমার মতো এক অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে এ চিঠি পেয়ে আপনি অবাক হবেন না এ আশা রাখি। কারণ আপনার মতো একজন প্রখ্যাত রহস্যভেদীর কাছে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রয়োজনে মানুষ শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, এটা আমার বিশ্বাস। আমাকে তাঁদেরই একজন মনে করবেন।

বুঝতেই পারছেন আমি এ চিঠি লিখছি ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্য অরুণাচল থেকে। গত তিন মাস যাবৎ আমি এখানে বমডিলার নিকটবর্তী একটা গ্রামে বাস করছি। আসলে আমায় একজন শখের প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলতে

পারেন। এই সূত্রে সারা ভারতের বিভিন্ন পাহাড় আর অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে হয় দুষ্প্রাপ্য গাছের সন্ধানে। অরুণাচলেও এসেছি এই কারণেই। জায়গাটা খুবই সুন্দর। পাহাড় আর অরণ্য ঘেরা।

এবার যে কারণে এ চিঠি লিখছি তাই বলি।

এখানে একটা প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে আছে ফুট তিনেক দৈর্ঘ্যের কষ্টিপাথরের ছিন্নমস্তার মূর্তি। স্থানীয় বিশ্বাস দেবী অত্যন্ত জাগ্রত, কিন্তু দিন কয়েক আগে দেবীর হাতের লোহার খাঁড়াটি চুরি হয়ে গেছে।

স্থানীয় সরল পাহাড়ী লোকেরা এ ঘটনায় অত্যন্ত ভীত এবং উদ্বিগ্নবোধ করছে। মন্দিরের পুরোহিত একজন বাঙালী—দীননাথ ভট্টাচার্য। এ মন্দির তাঁরই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত। তিনি অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন এবং এ চুরি তারই কোনো পাপের ফল বলে মনে করছেন।

এখানকার বর্তমান বাসিন্দা হিসাবে এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে আমিও উদ্বেগবোধ করছি। আমার মনে হয়েছে খাঁড়াটি উদ্ধার না করা পর্যন্ত এ সরল পাহাড়ী গ্রামের অশান্তি দূর হবে না। আর সে কারণেই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখানে আসেন এবং খাঁড়াটি উদ্ধার করে স্থানীয মানুষদের উদ্বেগ দূর করতে পারেন, আমি আন্তরিকভাবে আনন্দিত হব।

আশা করি আপনি অরাজী হবেন না। এখানে আপনার সব দায়িত্ব আমার। আপনাকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারেও আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম।

আপনার টেলিগ্রামের আশায় থাকবো।

নমস্কারন্তে

ভবদীয়

ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে।

চিঠির শেষে জায়গাটায় যাওয়ার পথ-বিবরণী।

পড়া শেষ করে মেঘনাদের দিকে তাকাই। সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না মেঘনাদ।

কারণ ? মেঘনাদ চোখ বুজিয়ে থেকে বলেছে।

ভেবে দেখ, কষ্টিপাথরের দামী মূর্তিটা চুরি না হয়ে চুরি হলো একটা লোহার খাঁড়া। যার বাজারদর এমন কিছু নয়, এক্ষেত্রে—

হুঁ! মেঘনাদ আমার কথায় বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বললো, ব্যাপারটার মধ্যে অন্য একটা গন্ধও পাচ্ছি। তবে আপাতত সে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে বরং টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দেয়া যাক যাতে আগামী সোমবার সকালে তেজপুর এয়ারপোর্টে ডঃ পাণ্ডে আমাদের রিসিভ করেন। আশা করি আমরা ওঁকে না চিনলেও উনি আমাদের চিনে নেবেন।

সেই মতো ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের সঙ্গে আজ আমাদের মোলাকাৎ।

॥ দুই ॥

দুর্গমপথে যাত্রা

জিপ ছুটে চলেছে। স্টিয়ারিং ডঃ পাণ্ডের হাতে। আমি আর মেঘনাদ পেছনের সীটে মুখোমুখি বসে।

বাইরের দৃশ্য নয়নাভিরাম। কখনও অতলস্পর্শী খাদ, কোথাও বা খরস্রোতা নদী। যত উঁচুতে উঠছি, আকাশের মেঘেরা যেন নেমে আসছে ধরার বুকে। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ভালুকপং-এ পৌঁছে আমাদের ইনার লাইন পারমিট দেখাতে হলো। বর্তমানে অরুণাচলে পৌঁছবার জন্য এই সরকারী পারমিট আবশ্যিক। সব ব্যবস্থা অবশ্য ডঃ পাণ্ডেই করে রেখেছিলেন।

এরপর আবার যাত্রা শুরু করে আমরা বমডিলায় পৌঁছলাম দুপুর বারোটা নাগাদ। মনোরম পাহাড়ী শহর এই বমডিলা। দুপুরের খাওয়াটা আমরা এখানেই সারলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু।

এবার আমাদের গন্তব্য ১৫ কিলোমিটার দূরে রাহুং গ্রাম পার হয়ে আরও কয়েক মাইল চড়াই-উৎরাই পথ। থেবং-এর কাছাকাছি একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম। সেখানেই আছে প্রাচীন ছিন্নমস্তার মন্দিব।

বমডিলার পর থেকে সারা পথটাই যেন জঙ্গলে ঢাকা। খুবই দুর্গম।

ডঃ পাণ্ডে, এখানে আপনি কোন প্রজাতির গাছের সন্ধানে এসেছেন ? মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভেঙেছে।

আমার প্রিয় অর্কিড। ডঃ পাণ্ডে একটু হেসে বললেন, ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে নানা বিচিত্র প্রজাতির অর্কিডের সন্ধান মেলে। এখানে আমি এমন কিছু অর্কিডের সন্ধান পেয়েছি যা অত্যন্ত বিরল প্রজাতির বলা চলে।

কথা বলতে বলতে কখন আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি টের পাইনি। চমক ভাঙলো দূরে একটা কোলাহল শুনে।

॥ তিন ॥

খুন না অভিশাপ

আমাদের জিপটা এসে পৌঁছেছে একটা পাহাড়ী গ্রামের কাছাকাছি। এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটি নানা আকারের কুটির। বোঝাই যায় ওখানে এলাকার লোকেরা থাকে।

একদিকে একটা ঢালু পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট ভাঙা মন্দির চোখে

পড়লো। কিছু লোক ওখানেই জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে।

আমরা কিছু জিগ্যেস করার আগেই ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে উদ্বিগ্নভাবে বললেন, ছিন্নমস্তাদেবীর মন্দিরে আবার কিছু ঘটনা ঘটেছে মনে হচ্ছে।

জিপ থেকে নেমে এবার আমরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে।

আরও কিছুটা এগুতেই ওখানকার দৃশ্যটা স্পষ্ট হলো।

সবচেয়ে আগে চোখে পড়লো মন্দিরের সামনে জটলার মধ্যে একজন পাহাড়ী বৃদ্ধা বুক চাপড়ে কাঁদছেন আব তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধের চেহারা কিন্তু স্থানীয় পাহাড়ীদের মতো নয়। আমার মন বললো উনিই দীননাথ ভট্টাচার্য—এই মন্দিরের পুরোহিত। স্থানীয় একজন পুলিশ অফিসার আর দু'জন সেপাইও চোখে পড়লো।

মেঘনাদের অস্ফুট কণ্ঠস্বব কানে এল, মনে হচ্ছে ওখানে একটা খুন হয়েছে।

বলেন কি, খুন! মেঘনাদের কথাটা কানে যেতে প্রায় আঁতকে উঠলেন ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে।

আমরা ততক্ষণে মন্দিরটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এবং মেঘনাদ যা অনুমান করেছে সেটাই সত্যি।

ভাঙা মন্দির-গর্ভে ছিন্নমস্তাদেবীর পায়ের কাছে একটি বছর ২৫/২৬ বয়সী যুবক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। দেখেই বোঝা যায় দেহে প্রাণ নেই।

ডঃ পাণ্ডে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কি ! এ যে নুরান !

ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের কণ্ঠস্বরেই বোধ করি বৃদ্ধ মানুষটি ফিরে তাকালেন, তারপর দু' পা এগিয়ে এসে বললেন, ডঃ পাণ্ডে, আমার ছেলেকে যে এভাবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ভাবতে পারিনি।

অর্থাৎ, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যদি মন্দিরেব পুরোহিত দীননাথ ভট্টাচার্য হন, তবে মৃত যুবকটি ওঁরই ছেলে।

এতক্ষণে পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরেছে। আমরা নতুন আগন্তুক দেখে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপব কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন, আপনাদের তো চিনলাম না। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

আমাদের পরিচয়টা দিলেন ডঃ পাণ্ডে, ইনি প্রখ্যাত রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ আর ইনি ওঁর বন্ধু অর্ণব সেন। ছিন্নমস্তার খাঁড়া চুরির রহস্য উদ্ধারের জন্য আমিই এঁদের কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ করে এনেছি। এঁরা এইমাত্র এসে পৌঁছলেন।

ডঃ পাণ্ডের কথাগুলো যেন ম্যাজিকের কাজ করলো। পুলিশ অফিসার

ভদ্রলোক লম্বা একটা স্যালুট ঠুকে বললেন, আমি স্যার ইনসপেক্টর ওয়াং। আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার রহস্যভেদের বিবরণ পড়েছি। আমাকে আপনার একজন ফ্যান বলতে পারেন।

মেঘনাদ একটু হেসে বললো, ধন্যবাদ। এখন এই ডেথ কেসের ব্যাপারে কি বুঝলেন বলুন ?

ব্যাপারটা তো স্যার এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ইনসপেকটর ওয়াং একবার নাকটা চুলকে বললেন, আজ সকালে থানায় জনা কয়েক স্থানীয় লোক গিয়ে খবরটা দেয়। আমি তখন অন্য একটা এনকোয়ারিতে বেরিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে খবর পেয়ে একটু আগেই এসে পৌঁছেছি।

ডেডবডি পরীক্ষা করেছেন ? মেঘনাদ প্রশ্ন করলো।

মনে হচ্ছে এটা একটা খুন। তবে কিভাবে হয়েছে এখনো বুঝতে পারিনি।

ইনসপেক্টর ওয়াং যখন বলছিলেন, মেঘনাদ ততক্ষণে মন্দিরে ঢুকে মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ ভালভাবে দেখেশুনে বললো, একে অন্য কোথাও খুন করে এখানে এনে ফেলে রাখা হয়েছে।

অভিশাপ ! দেবীর অভিশাপ ! এ আমার পাপের ফল। মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগেই আর্তকণ্ঠে আবার বিলাপ করে উঠলেন দীননাথ ভট্টাচার্য। ওঁর বৃদ্ধা স্ত্রী তখনও একইভাবে বিলাপ করে চলেছেন।

মেঘনাদ ধীরে ধীরে দীননাথ পুরোহিতের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পরম মমতায় ওঁর একটা হাত ছুঁয়ে বললো, এভাবে আপনার ছেলের মৃত্যু হওয়াটা খুবই দুঃখের, কিন্তু এ আপনাব নিজের পাপ মনে কবছেন কেন ঠাকুরমশাই?

বৃদ্ধ দীননাথ ভট্টাচার্য মেঘনাদের কথা শুনে হঠাৎ যেন থমকে গেলেন। তারপর আর কোনো কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো উনি একটা কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

মেঘনাদ কয়েক মুহূর্ত দীননাথ ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ফেরাল ইনসপেক্টর ওয়াং-এর দিকে। তারপর বললো, মিঃ ওয়াং, আপনার যা দেখার যদি দেখা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তাহলেই মৃত্যুর আসল রহস্য জানা যাবে।

ও, সিওর। আমি এক্ষুণি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। ইনসপেক্টর ওয়াং ব্যস্তভাবে মেঘনাদের পরামর্শমতো কাজ করার উদ্যোগ শুরু করেন।

॥ চার ॥

আলোচনা

মেঘনাদ, তুই এখানে এসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা খুন হয়ে গেল। কথাটা আচমকাই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

মেঘনাদ দেখলাম বেশ সিরিয়াস। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, আমার কিন্তু এ খুনকে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে হচ্ছে না।

অর্থাৎ আপনি বলতে চান ছিন্নমস্তাদেবীর খাঁড়া চুরির সঙ্গে এ খুনের যোগ আছে? প্রশ্নটা করলেন ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে।

সেটাই মনে হচ্ছে।

সময় সন্ধ্যা। কিন্তু এরই মধ্যে চতুর্দিক যেন নিশুতি হয়ে গেছে। আমরা কথা বলছিলাম ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের লজের ঘরে বসে।

ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই স্বল্প আলোয় ঘরের পরিবেশ কেমন যেন রহস্যময়।

এর আগে মেঘনাদ দফায় দফায় এখানকার স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছে। একটা জিনিস বোঝা গেছে—এই নিরুত্তাপ পাহাড়ী গ্রামে ছিন্নমস্তাদেবীর খাঁড়া চুরির ব্যাপারটাতে এখানকার সবাই সত্যিই উদ্বিগ্ন। এমনকি এই মৃত্যুটাকেও কেউ স্বাভাবিক মনে করছে না। সরল পাহাড়ী মানুষগুলো ভাবতে শুরু কবেছে, দেবী নিজেই চোরের শাস্তি দিয়েছেন। অর্থাৎ নুরানই খাঁড়া চুরিব নায়ক, তাই দেবী ছিন্নমস্তা নিজে তাকে হত্যা করে ফেলে বেখেছেন পায়ের তলায়।

দুপুরবেলা দীননাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়েছিলাম। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট কাঠেব বাড়ি। ওঁর মুখে জানা গেল অন্তত দুশো বছর আগে ওঁর এক পূর্বপুরুষ বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে এক তন্ত্রপীঠ আর ছিন্নমস্তার মন্দির প্রতিষ্ঠা কবেন। তারপব থেকে পুরুষানুক্রমে ওঁরাই এ মন্দিরের পুরোহিত। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস দেবী খুবই জাগ্রত। তবে এতদিন কোনো সমস্যা ঘটেনি। বিপত্তিটা ঘটলো দিন পনের আগে। ছিন্নমস্তাদেবীর হাতের খাঁড়াটা চুরি হয়ে গেল। আর তাব কিছুদিনের মধ্যেই মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গেল পুরোহিত দীননাথ ভট্টাচার্যের একমাত্র পুত্র নুরানের মৃতদেহ।

দীননাথ ভট্টাচার্য বাববাব একই কথা বলছিলেন, এ আমারই পাপ মেঘনাদবাবু। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমার ছেলেকে করতে হলো।

কিন্তু মেঘনাদ যখন ওঁব অপরাধটা কি জানতে চেয়েছে, উনি আর জবাব দেননি। কথা ঘুবিয়ে বলেছেন, আমার অপরাধ না ঘটলে আমারই গৃহদেবতার মন্দিরে ছেলেটার মৃতদেহ কেন পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

দীননাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রীও শোকে মুহ্যমান। ওঁর কাছ থেকে কিছু জানা গেল না।

ওখান থেকে ফেরার পথে মেঘনাদ বলেছে, দীননাথ পুরোহিত এমন একটা কিছু লুকোতে চাইছেন যা না জানা পর্যন্ত এ রহস্যের মীমাংসা হওয়া মুশকিল। বলতে বলতে ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের দিকে তাকিয়েছে মেঘনাদ, আচ্ছা ডঃ পাণ্ডে, নুরান তো আপনার কাছেই কাজ করতো, তাই না?

হ্যাঁ, আমার একজন লোকাল গাইড দরকার ছিল, যে এখানকার জঙ্গলে গাছপালা খুঁজতে আমায় সাহায্য করতে পারবে। এ ব্যাপারে ছেলেটাকে চালাক-চতুর মনে হয়েছিল।

আপনার কি কখনও মনে হয়েছে নুরানের পক্ষে খাঁড়া চুরির দুষ্কর্ম করা সম্ভব ?

না, এতটা ভাবতে পারিনি। তবে ছেলেটাকে বরাবরই একটু উগ্র প্রকৃতির মনে হয়েছে। ওর বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও বিশেষ ভাল ছিল না। একবার তো হাতেনাতে ওর একটা অপরাধ ধরেছিলাম।

অপরাধ ?

হ্যাঁ, আমার অর্কিড হাউস থেকে গোটা কয়েক বিরল জাতের অর্কিড চারা বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল।

হুঁ ! মেঘনাদ এর বেশি আর কিছু বললো না।

রাত বেড়ে চলেছে। সেদিনের মতো আমাদের আলোচনা শেষ হলো।

॥ পাঁচ ॥

ধাঁধা

এ কোথায় এসে হাজির হলাম ! এক রুক্ষ পাহাড়ী প্রান্তর। স্থানে স্থানে ক্যাকটাস আর অর্কিডের ঝোপ। পাহাড় পিছলে নেমে আসছে অন্ধকার।

এখানে কে আনলো আমায় ? আশপাশে কোনো মানুষজন তো চোখে পড়ছে না। মেঘনাদই বা কোথায় গেল ?

ঢং..........ঢং.............ঢং.............ঢং............ ...

কোথায় এক নাগাড়ে ঘণ্টা বেজে চলেছে। ঘণ্টা ধ্বনি অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম পাহাড়ের চড়াই ভেঙে।

পাহাড়-প্রাচীরের ওধারে একটা প্রাচীন মন্দির। মন্দির মধ্যে ছিন্নমস্তার ভীষণ মূর্তি। মূর্তি যেন জীবন্ত। মুণ্ডহীন ধড় থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সে রক্ত পান করছে দেবীর হাতে নিজেরই কাটা মুণ্ড।

কে যেন অট্টহাসি করে উঠলো—হাঃ......হাঃ.. ......হাঃ.........হাঃ . .....

তাকিয়ে দেখি মন্দিরের সামনে রক্ত-বস্ত্র পরিহিত তান্ত্রিক পুরোহিত দীননাথ ভট্টাচার্য। তাঁর হাতে ছিন্নমস্তার শাণিত খাঁড়া।

কিন্তু ও কি দৃশ্য ! মন্দিরের সামনে একটা রক্তাক্ত হাঁড়িকাঠ। সেই হাঁড়িকাঠের পাশে এক ছিন্নশির যুবক। শিউরে উঠলাম যুবকটিকে দেখে—ও তো নুরান ! দীননাথ ভট্টাচার্যের একমাত্র ছেলে। কিন্তু পিতা হয়েও কি তিনি পুত্রকে বলি দিলেন !

পাপের শাস্তি ! এ ওর পাপের শাস্তি। চিৎকার করে উঠলেন তান্ত্রিক

পুরোহিত....

আর তক্ষুণি ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি বাইরে নিথর রাত। এই ঠাণ্ডার মধ্যেও সারা শরীর ঘামে জব-জব করছে।

ধীরে ধীরে মন স্বাভাবিক হলো। ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের লজের ঘরে শুয়ে আছি। কিন্তু পাশের বিছানায় তো মেঘনাদ নেই !...ওই তো মেঘনাদ। কাচের বন্ধ জানলার পাশে হ্যারিকেনের আলোয় মেঘনাদ কি যেন নিবিষ্ট মনে দেখছে।

আমি বিছানায় উঠে বসতে মেঘনাদ চোখ না ফিরিয়েই বললো, দুঃস্বপ্ন দেখছিলি বোধহয় ? ঘুমের মধ্যে গোঙানির যা আওয়াজ ছাড়ছিলি। অন্য কেউ ঘরে থাকলে নির্ঘাৎ ভয় পেত।

মেঘনাদের কথায় রাগই হলো। বললাম, আমি না হয় দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। তুই-ই বা রাতদুপুরে বসে কি পণ্ডিতি করছিস শুনি ?

পণ্ডিতই বলতে পারিস অর্ণব। একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজছি।

ধাঁধা! কোথায় পেলি ?

তুই তখন শুয়ে পড়েছিস। ডঃ পাণ্ডে এসে কাগজটা দিয়ে গেলেন। গত সন্ধ্যায় ওঁর অর্কিড হাউসে নুরানের হাতে লেখা এই কাগজের টুকরোটা উনি পেয়েছেন। কিছু না বুঝতে পেরে আমায় দিয়েছেন। এই তো দেখ না।

বিছানা ছেড়ে উঠে মেঘনাদের সামনে গিয়ে কাগজটা নিলাম। ওতে বাংলায় একটা ছড়া লেখা রয়েছে মনে হলো।

আমি বললাম, নুরান কি বাংলা জানতো ?

ভুলে যাসনি অর্ণব, ওর মা পাহাড়ী মেয়ে হলেও বাবা বাঙালী।

এটা কি তোর কোনো ধাঁধা মনে হচ্ছে ?

তার চেয়েও বেশি। এটা একটা সংকেত।

সংকেত। কিসের ?

সেটা জানার জন্যেই তো ধাঁধার উত্তরটা উদ্ধার করা দরকার।

হ্যারিকেনের কাঁপা আলোয় ছ' লাইনের ছড়াটা পড়লাম।

ভট্‌চাজের গাছ
ঈশান কোণে পাঁচ
আরও ছয় ছেড়ে
রয়েছে সে ধন গেড়ে।
পায়ের শেষে শূন্য
তবেই আশা পূর্ণ।।

বার কয়েক পড়েও এ ছড়ার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না। জিগ্যেস করলাম, এর মানে তুই কিছু বুঝেছিস ?

মেঘনাদ কেমন যেন হেঁয়ালি ঝরা হাসি হেসে বললো, ও কথা পরে আসছে। তার আগে যা বলি শোন। আগামীকাল খুব ভোরে ডঃ পাণ্ডের জিপটা নিয়ে আমায় একা একটু বেরুতে হবে। কয়েকটা কাজ সেরে আশা করছি সন্ধ্যের আগেই ফিরবো।

কিন্তু আমি... ?

মেঘনাদ আমার পিঠে হাত রেখে সেই হেঁয়ালির হাসিটা হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, ভাবিয়া দেখ মন/খোলা রেখো ত্রিনয়ন...তারপরই আর কিছু না বলে বিছানায় লম্বা হলো।

আমার কিন্তু বাকি রাতটায় কিছুতেই চোখে ঘুম নামলো না। চোখ বুজতেই সেই ছড়া-ধাঁধার কয়েক পংক্তি আর ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা বারবার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসতে লাগলো।

সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মেঘনাদেরই বা হঠাৎ একা একা কোথায় যাবার দরকার পড়লো কে জানে !

॥ ছয় ॥

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

মেঘনাদ ফিরলো পরদিন সন্ধ্যে উতরে যাবার পর।

আমার এদিনটা কেটেছে আশপাশের পাহাড়ী প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে।

বেড়াবার মতোই এখানকার প্রকৃতি। কলকাতায় যখন দুর্দান্ত গরম, এ সময়ে এখানকার আবহাওয়া সুশীতল, মনোরম। এখানকার অকৃত্রিম সৌন্দর্যের মোহময়তা, মেঘ ও রোদের খেলা মনকে ভুলিয়ে দেয়। পাহাড়ী উপত্যকায় কতরকম গাছ, ফুলের মেলা। এদের মধ্যে মোটা গুঁড়িওলা গাছ তো আছেই, আছে ওক, পাইন, চেস্টনাট। এ ছাড়া রংবেরঙের অর্কিডও চোখে পড়লো।

স্থানীয় মানুষেরাও যেমন সরল, তেমনি সাহসী। এখানে এমন কোনো দুষ্কর্ম ঘটতে পারে তা যেন ভাবতেই পারা যায় না।

ডঃ পাণ্ডে সারাদিন আমায় সঙ্গ দিলেন। তাঁর লজের নার্সারী হাউসে অর্কিডের বিশাল সংগ্রহ দেখালেন। আমি অবশ্য তেমন গাছপালা চিনি না। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে তাঁর সংগ্রহের অনেক গাছই বিরল প্রজাতির।

মেঘনাদ যখন ফিরলো, তার একটু আগেই আমার সঙ্গে বসে চা খেয়ে ডঃ পাণ্ডে তাঁর নার্সারী হাউসে গিয়ে ঢুকেছেন। আমি লজের বারান্দায় একটা গার্ডেন চেয়ারে একা বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম।

মেঘনাদকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। জিগ্যেস করলাম, ব্যাপার কি বল তো, সারাদিন কোথায় ছিলি ? আচ্ছা বোস, আগে তোর জন্যে চায়ের ব্যবস্থা দেখি।

মেঘনাদ বাধা দিয়ে বললো, দরকার নেই বন্ধু। একটু আগেই দীননাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে নুন-চা খেয়ে আসছি।

নুন-চা !

হ্যাঁ। স্থানীয় পানীয়। মুখে দিয়ে মন্দ লাগলো না। তাছাড়া দীননাথ পুরোহিতের স্ত্রী খুবই অতিথিবৎসল। নিজের হাতে যত্ন করে চা বানিয়ে দিলেন।

অবাক হয়ে বলি, তা আজ যে আবার দীননাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে গেলি? তা কি শুধু নুন-চা পানের জন্যে ?

মেঘনাদ চোখ নাচিয়ে আবার সেই হেঁয়ালিটা করলো, ভাবিয়া দেখ মন/খোলা রেখো ত্রিনয়ন !

তার মানে ? মনে হচ্ছে কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়েছিস ?

শুধু রহস্য নয় বন্ধু, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। আমার প্রথম দিন থেকেই মনে খটকা লেগেছিল—প্রাচীন মূর্তির হাত থেকে নিছক একটা খাঁড়া চুরি হলো কেন ? রহস্যটা উদ্ধার হলো দীননাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলে।

কি বলেছেন উনি ?

নিরাপত্তার কারণে সে খাঁড়ায় কালো রঙ করে লোহা বলে চালানো হলেও আসলে সেটি ছিল খাঁটি সোনার তৈরি, যার বর্তমান বাজারদর অন্তত লাখ টাকা।

বলিস কি ? একথা দীননাথ পুরোহিত ছাড়া আর কেউ জানতো ?

এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অর্ণব। যা জেনেছি, তা হলো পুরুষানুক্রমে ছিন্নমস্তা মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে এ গোপন তথ্যটা দীননাথ ভট্টাচার্যই একমাত্র জানতেন। কিন্তু মাসখানেক হলো এটা কোনোভাবে জেনে ফেলেছিল নুরান।

মেঘনাদের শেষ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো সম্ভাবনাই মনে এল। কেন জানি না মাথার মধ্যে হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠলো গতরাতের সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা।

মেঘনাদ তখনও বলে চলেছে, নুরান সম্পর্কে আরও কয়েকটা কথা জানলাম, ছেলেটা নাকি এক সময়ে ভালই ছিল। দীননাথ ভট্টাচার্য ছেলেকে শিলং-এ পাঠিয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে। কিন্তু পুরোহিতের মনের আশা পূর্ণ হয়নি। শিলং-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নুরানকে তাড়িয়ে দিয়েছিল নানা অপরাধমূলক কাজ করার অভিযোগে।

এবার মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগেই উত্তেজিতভাবে বললাম, তাহলে কি ছিন্নমস্তার খাঁড়া নুরানই চুরি করে কোথাও পাচার করে দিয়েছে ? কিন্তু ও মরলো কেন ?

মেঘনাদ কেমন যেন আনমনাভাবে বললো, এর উত্তরটা আপাতত আমারও জানা নেই। তারপরই সোজা হয়ে বসে বললো, তবে আজ বমডিলা

থানায় গিয়ে ইনসপেক্টর ওয়াং-এর কাছ থেকে নুরানের ডেডবডির পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পেয়েছি।

কি আছে রিপোর্টে ?

যা ভেবেছিলাম। ওকে অন্য কোনো জায়গায় বিষপ্রয়োগে খুন করে দেহটা মন্দিরের মধ্যে ফেলে যাওয়া হয়েছিল।

মাথাটা আমার বোঁ করে ঘুরে গেল।

॥ সাত ॥

ধাঁধার অর্থ ধাঁধা

সে রাতে খাওযাব টেবিলে বসে মেঘনাদ ডঃ পাণ্ডেকে বললো, আপনার দেওয়া ছড়াব অর্থ আমি উদ্ধার করেছি।

তাই নাকি ? কি লেখা আছে ওতে ? ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে এক টুকরো চিকেন মুখে পুরে কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

আসলে ওটা একটা সংকেত। ধাঁধাব আকাবে এক গুপ্ত জিনিসেব নিশানা লিখে রাখা হযেছে।

বলেন কি ?

মেঘনাদ খেতে খেতেই বাঁ পকেট থেকে কাগজেব টুকরোটা বাব করে ছড়াটা আর একবাব পড়লো—ভট্‌চাজের গাছ/ঈশান কোণে পাঁচ/আরও ছয ছেড়ে/রয়েছে সে ধন গেড়ে/পাযের শেষে শূন্য/তবেই আশা পূর্ণ।

অর্থাৎ এর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে ভট্‌চাজ মশাইয়ের বাড়ির কাছে যে গাছটা আছে সেখান থেকে ঈশান কোণ বরাবর পাঁচ পা যেতে হবে, তারপব আরও ছ' পা এগিযে সে 'ধন'-এর সন্ধান কবতে হবে। তবে এই পর্যন্ত বোঝা মোটেই শক্ত নয়। ব্যাপারটা জটিল কবে তুলেছে শেষ দুটি লাইন—'পায়ের শেষে শূন্য/ তবেই আশা পূর্ণ'.. চিন্তা কবে এর অর্থটাও বার করেছি ডঃ পাণ্ডে।

কি অর্থ ?

এর অর্থ প্রতিটি পায়ের শেষে শূন্য। অর্থাৎ ৫ এবং ৬ পা না হয়ে ওটা হবে ৫০ এবং ৬০ পদক্ষেপ।

বলেন কি? ছেলেটা দারুণ চালাকি করেছে তো মেঘনাদবাবু, ডঃ পাণ্ডে খাওয়া ফেলে হাঁ কবে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, কিন্তু নুরান এই ছড়ার সংকেতেব মধ্যে কোন 'ধন' লুকিযে রেখেছে মেঘনাদ? ছিন্নমস্তার খাঁড়া নয় তো?

মেঘানাদ গুন গুন করে সেই হেঁযালিটা আওড়াল, ভাবিয়া দেখো মন/খোলা রেখো ত্রিনযন...এরপরই ডঃ পাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললো, আগামীকাল বিকেলটা কিন্তু আমায় একটু ছুটি দিতে হবে ডঃ পাণ্ডে।

কোনো বিশেষ প্ল্যান আছে মনে হচ্ছে? ডঃ পাণ্ডে আবার খাওয়ায় মনোনিবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। আগামীকাল এখানকার এক বিখ্যাত অনুষ্ঠানে হাজির হবার জন্যে আমায় আর অর্ণবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ইনসপেক্টর ওয়াং। সেটা মিস্ করা ঠিক হবে না।

কি অনুষ্ঠান?

'ইয়াক ডান্স'। আগামীকাল এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে রূপায় এই নাচের আসর বসবে। এই আশ্চর্য লোকনৃত্য দেখা সহজে নাকি ভাগ্যে মেলে না, মেঘনাদ বললো।

ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে খাওয়া শেষ করে প্লেটটা সরিয়ে রেখে বললেন, এখানকার এই চামরীনৃত্য বা 'ইয়াক ডান্স'-এর কথা আমিও শুনেছি। দেখার সুযোগ হয়নি। আমি আপনাদের যাত্রাসঙ্গী হলে কি আপত্তি হবে মেঘনাদবাবু?

মোটেই না। আমরা তিনজনই বরং আগামীকাল বিকেলের মধ্যেই জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। ইনস্পেক্টর ওয়াং রূপাতেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন কথা আছে। মেঘনাদ উৎসাহিত কণ্ঠে বললো।

শেষ পর্যন্ত সেটাই ঠিক হলো।

আমি কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না—হঠাৎ সবকিছু ছেড়ে মেঘনাদ 'ইয়াক ডান্স' দেখতে এত উৎসুক হলো কেন? আমি জানি এখন এ প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পাব না।

॥ আট ॥

ইয়াক ডান্স

ডঃ পাণ্ডেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল না। দুপুরে খাওযা-দাওয়ার পর আমরা যখন একটু বিশ্রাম করছি, হঠাৎ এক ভদ্রলোক জিপ নিয়ে এসে হাজির। উনি নিজের পরিচয় দিলেন মিঃ থ্রিমে। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার। এসেছেন এখানকাব বিখ্যাত সরকারী নার্সারী 'গ্লাস হাউস' থেকে। সেখানকার অধিকর্তা নাকি ডঃ পাণ্ডেকে ডেকে পাঠিয়েছেন নতুন সন্ধান পাওয়া এক বিরল প্রজাতির অর্কিড সম্পর্কে আলোচনার জন্যে। সুতরাং ডঃ পাণ্ডের কাছে 'ইয়াক ডান্সে'র আকর্ষণ ম্লান হয়ে গেল। উনি চলে গেলেন মিঃ থ্রিমের সঙ্গে। অবশ্য যাবার সময় বলে গেলেন বিকেলের মধ্যেই ফিরবেন। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলেও ডঃ পাণ্ডে ফিরলেন না। এর মধ্যে ইনসপেক্টর ওয়াং পুলিশ-জিপ নিয়ে হাজির হলেন। মেঘনাদের ফ্যান এই অরুনাচলি পুলিশ অফিসারটি নিজের রাজ্যের বিখ্যাত 'ইযাক ডান্স' না দেখিয়ে ছাড়বেন না মনে হচ্ছে।

অগত্যা আমরা আর দেরি করলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ-জিপের

সওয়ারি হয়ে হাজির হলাম কয়েক মাইল দূরে রূপা গ্রামে।

সেখানে সত্যিই এক আশ্চর্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

আমরা শহুরে মানুষ, সেই পাহাড়ী উপজাতি নৃত্যের জাঁকজমক কল্পনাও করতে পারবো না।

রূপা গ্রামের এক প্রাচীন বৌদ্ধ গুম্ফার সামনে নাচের আয়োজন করা হয়েছে। চারদিকে আলোর রোশনাই। আশপাশের গ্রামগুলি থেকে অনেক দর্শক এসে ভিড় করেছে। এ নাচ বেশ অভিনব। নাচের জন্য চামরী গায়ের অনুরূপ কাপড়ের খোলস তৈরি করে ওরা। তার মধ্যে দুজন করে ঢুকে নাচে। তখন তাদের দু'জোড়া পা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। চামরী গাইয়ের মুখোস লাগিয়ে ওরা যখন এক তালে নাচে তখন আসল ইয়াক বা চামরী গাইয়ের সঙ্গে তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমরা যখন পৌঁছলাম, নাচ শুরু হয়ে গেছে। একই সঙ্গে কয়েক জোড়া মানুষ ইয়াক ডান্স করছে। সঙ্গে বাজছে ঢাক আর মাটি পর্যন্ত লম্বা শিঙা। সমস্ত পরিবেশটা দারুণ উপভোগ্য।

নাচ দেখতে দেখতে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মেঘনাদের হাতের ধাক্কায় চমক ভাঙলো।

অর্ণব! চল। এক্ষুণি ফিরতে হবে। ফিরে দেখলাম মেঘনাদের পাশে ইনসপেক্টর ওয়াংও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওদের চোখ-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সবে এখন নাচ জমে উঠেছে, এ সময়ে এমন কি ঘটলো? হাতঘড়িতে চোখ রাখলাম। সবে রাত আটটা।

মেঘনাদ বললো, এখন বেশি কথার সময় নেই। চল।

আমায় প্রায় টেনে নিয়ে জিপে উঠলো মেঘনাদ। ইনসপেক্টর ওয়াং আগেই চালকের আসনে উঠে বসেছেন।

হেডলাইটের তীব্র আলো জ্বেলে পাহাড়ী পথে জিপ ছুটে চললো।

॥ নয় ॥

কেন কাঁদে

রাত এমন কিছু বেশি না হলেও এরই মধ্যে অরুণাচলের প্রকৃতিতে গভীর রাতের সুষুপ্তি নেমে এসেছে। পাহাড়ী গ্রামটায় যখন এসে পৌঁছলাম, চারদিক স্তব্ধ। কোনো কোনো কুঁড়েঘরের ভেতরে জ্বলছে শুধু প্রদীপের মিটমিটে আলো।

কিন্তু জিপ থেকে নেমে কোথায় চলেছে মেঘনাদ আর ইনসপেক্টর ওয়াং? এ পর্যন্ত ওরা একটা কথাও বলেনি। বুঝতে পারছিলাম কোনো কারণে ওরা ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। মেঘনাদের এ ভঙ্গি আমার চেনা। রহস্যভেদের শেষ পর্যায়ে ওর ভাবভঙ্গির মধ্যে এ ধরনের একটা পরিবর্তন ঘটে থাকে।

তার মানে কি...

সামনের বাড়িটা ছিন্নমস্তা মন্দিরের বাঙালী পুরোহিত দীননাথ ভট্টাচার্যের। ওঁর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই একটা কান্নার শব্দ কানে এল।

দীননাথ পুরোহিতের স্ত্রী কাঁদছেন। মনে হচ্ছে একটু দেরি করে ফেলেছি আমরা।

মেঘনাদের এ কথাটাও আমার কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হলো।

আমরা ততক্ষণে দীননাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি।

সামনের দাওয়ায় একটা মিটমিটে লণ্ঠন জ্বলছে। তাব সামনে বসে কাঁদছেন দীননাথ পুরোহিতের স্ত্রী।

ওঁর কাছে গিয়ে অনেক চেষ্টা কবেও ওঁর কান্নাব সঠিক কারণটা জানা গেল না, শুধু বোঝা গেল ওঁর মনের আশঙ্কা পুত্র নুরানের মতো আজ স্বামীও বুঝি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

মেঘনাদ আর দাঁড়াল না। ইনসপেক্টর ওয়াংকে বললো, আসুন আমাব সঙ্গে। অর্ণব, তুইও আয়।

সামনের দিকে না গিয়ে ও গেল বাড়ির পেছনে। ভট্টাচার্য বাড়ির ঠিক গায়েই একটা প্রাচীন ওক গাছ। মেঘনাদ সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আপন মনে বাব কয়েক বিড়বিড় কবে উচ্চারণ করলো—'ভট্‌গাছের গাছ/ ঈশান কোণে পাঁচ/ আরও ছয় ছেড়ে/ রয়েছে সে ধন গেড়ে/ পায়ের শেষে শূন্য/ তবেই আশা পূর্ণ।'

তারপর হাতের পাঁচ-ব্যাটাবির টর্চটা জ্বেলে আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বললো, এগিয়ে চল আমার সঙ্গে।

প্রথমে বাড়ির নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করে পঞ্চাশ পা, এরপর আরও ষাট, মোট একশো দশ পা হেঁটে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, টর্চের আলোয় দেখা গেল সামনেই একটা প্রায় তিন ফুট ব্যাসার্ধের গর্ত। দেখেই বোঝা যায় সত্য খোঁড়া। মেঘনাদ গর্তের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে বললো, ইস্‌, হিসেবে একটু ভুল করে ফেলাম ইনসপেক্টর ওয়াং।

ইনসপেক্টর ওয়াং উত্তেজিতভাবে বললেন, তবে কি বামাল পাচার হয়ে গেল?

মেঘনাদ বললো, চলুন মন্দিরটা দেখি।

প্রায় ছুটেই আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছুলাম। মন্দিরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার। মেঘনাদ টর্চের আলো ফেললো।

আশ্চর্য! বেদী ফাঁকা! তিন ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তি মন্দিরে নেই।

ও মাই গড! ইনসপেক্টর ওয়াং চেঁচিয়ে উঠলেন।

আঃ! এখন বিলাপ করার সময় নয়। তাকিয়ে দেখি অন্ধকারের মধ্যেও মেঘনাদের দু'চোখ যেন জ্বলছে, চলুন শীগগির।

প্রায় চিতাবাঘের মতোই লাফ দিয়ে মেঘনাদ ছুটে চললো পাহাড়ী উপত্যকার পথে।

॥ দশ ॥

চালাকি খতম

ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডের লজের সামনে যখন এসে পৌঁছলাম, পথশ্রান্তিতে তিনজনই রীতিমতো হাঁফাচ্ছি। উপত্যকার বুকে যেন একটা কালো ভালুকের মতো অন্ধকারের চাদর জড়িয়ে বসে রয়েছে লজটা। এতটুকু আলোব ইঙ্গিত নেই কোথাও। কিন্তু এখানে এভাবে কেন ছুটে এল মেঘনাদ?

আমি কিছু জিগেস করার আগেই মেঘনাদ ফিসফিস করে বললো, অর্ণব, আমি না বলা পর্যন্ত এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

ততক্ষণে ইনসপেক্টর ওয়াং সারা লজটাকে বাইরে থেকে একটা চক্কব মেবে এসেছেন। মেঘনাদেব সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মিঃ ভরদ্বাজ, জিপটা রয়েছে। শুনেই তৎপব হয়ে উঠলো মেঘনাদ, থ্যাঙ্ক গড। তাহলে এক্ষুণি আমাদের লজে ঢুকতে হবে।

মেঘনাদেব কথা শেষ হলো না। লজের মেইন গেটে 'ক্যাচ' কবে একটা শব্দ হলো। চকিতে মেঘনাদ আমাব হাত ধরে পাশেব মোটা গুঁড়িওলা গাছটাব পাশে লুকিয়ে পড়লো।

লজেব ভেতব থেকে বেবিয়ে আসছে এক ছায়ামূর্তি। হালকা চাঁদেব আলোয় তাব মুখ দেখা যায় না। পরনে ভাবী স্যুট। মাথায় টুপি। পিঠে মস্ত এক ঝোলা।

কে ওই মূর্তি?

মূর্তি দু পা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বাতাসে কি আমাদেব উপস্থিতি টের পেয়েছে?

কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক তাকিয়ে মূর্তি হঠাৎ লজেব পেছন দিকে হাঁটতে শুরু কবলো। আর ঠিক তক্ষুণি আমার পাশ থেকে যেন একটা ক্ষিপ্র চিতা লাফিয়ে তাব পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের বিভলবাবের নলটা ছায়ামূর্তির পিঠে ঠেকিয়ে গম্ভীব কণ্ঠে বললো, ডঃ পাণ্ডে ওবফে নিশাব হোসেন, তোমার চালাকির খেলা শেষ হয়েছে। ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

রিভলবাবধারী মেঘনাদ ভরদ্বাজ ছাড়া আব কে!

॥ এগার ॥

রহস্য অপসারিত

রহস্য অপসারিত হয়েছে। এখন সব কিছু জলের মতো পরিষ্কাব।

সেদিন শ্যামলাল পাণ্ডের সেই ঢাউস ঝোলা থেকে শুধু তিন ফুট দৈর্ঘ্যের

প্রাচীন কষ্টিপাথরের মূর্তিটাই নয়, সেই সঙ্গে চুরি যাওয়া সোনার খাঁড়াটাও উদ্ধার করা হয়েছে। দীননাথ পুরোহিতকে পাওয়া গেছে লজের 'অর্কিড হাউসের' মধ্যে। ওঁকে সেখানে হাত-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল।

দীননাথ ভট্টাচার্যের ঘরের দাওয়ায় বসে মেঘনাদের মুখ থেকে ওর রহস্যভেদের কথা শুনছিলাম।

মেঘনাদ বলছিল, নিশার হোসেন ওরফে ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে আসলে দেশের প্রত্নবস্তুর চোরাকারবারীদের এক এজেন্ট। সম্প্রতি এরকম একটি চক্র সারা দেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শনগুলি অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ মারফৎ বিদেশে পাচার করে চলেছে। এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘৃণ্য শত্রু। এদেরই এক এজেন্ট নিশার হোসেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর ভোল নিয়ে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল অরুণাচলের এই প্রাচীন ছিন্নমস্তাদেবীর মন্দিরেব কাছে। এখানেই সে পেয়ে যায় দীননাথ পুরোহিতের বখে যাওয়া ছেলে নুরানকে। তাব কাছে জানতে পারে ছিন্নমস্তার হাতের খাঁড়ার আসল রহস্য। তখনই সে ঠিক করে খাঁড়া সমেত পুরো মূর্তিটাই সে চুরি করবে। এ ব্যাপারে নুরান অর্থের লোভে নিশার হোসেনকে সাহায্য করতে রাজী হয়।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল আর একটা ঘটনা।

মন্দিরের পুরোহিত দীননাথ ভট্টাচার্য কোনোভাবে ছদ্মবেশী নিশার হোসেনের খাঁড়া চুরির মতলবটা টের পেয়ে যান। তখন আর উপায় না দেখে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেই খাঁড়াটা দেবীমূর্তির হাত থেকে নিয়ে লুকিয়ে রাখেন বাড়ির পেছনে। পরে যাতে জায়গাটা চিনতে অসুবিধে না হয়, সে জন্য একটা সংকেত ছড়াও লিখে রাখেন। তাই তো ঠাকুরমশাই?

সামনে উপবিষ্ট দীননাথ ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে মেঘনাদ প্রশ্নটা করতে উনি বললেন, তবু তো সর্বনাশ ঠেকাতে পরলাম না মেঘনাদবাবু। আমার ছেলের ওপর শয়তান ভর করেছিল। আমি নিজেই টের পাইনি. নুরান আমার সংকেত লিপিটা কবে চুরি করে শয়তানটার হাতে তুলে দিয়েছে।

কিন্তু সেটাই নুরানের কাল হলো।

মেঘনাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, নিশার হোসেন এবার অন্য মতলব ভাঁজলো। সে নিজে সেই ছড়ার অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে ডেকে আনলো আমায়। আর আগের দিন সে নিজেই দুষ্কর্মের ভাগীদার নুরানকে খুন করে

সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করলো।

তাহলে নুরানকে খুন করেছে নিশার হোসেন ওরফে ডঃ শ্যামলাল পাণ্ডে? মেঘনাদের কথার মধ্যে আমি বললাম।

এক্সজ্যাক্টলি। এবার ইনসপেক্টর ওয়াং জবাব দিলেন, পোস্টমর্টেমে যে বিষ নুরানের পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে, সেই বিষের শিশি মিলেছে নিশার হোসেনের অর্কিড হাউসের ভেতরে।

ইনসপেক্টর ওয়াং-এর কথা শেষ হলো না। নিজের মাথা চাপড়ে বিলাপ করে উঠলেন দীননাথ ভট্টাচার্য, এ অভিশাপ। জাগ্রতা দেবী ছিন্নমস্তার অভিশাপ। কয়েকশো বছর ধরে মা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে এসেছেন। আমার নুরানও তার পাপের ফল ভোগ করেছে.....পাপের ফল......!

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে চলে গেলেন দীননাথ পুরোহিত। দূর থেকে ওঁর কান্নাঝরা কণ্ঠস্বর শীতের ঝরাপাতার মতো যেন একরাশ দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিল প্রকৃতিতে!

আমরা শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম ওঁর গমনপথের দিকে। এই বৃদ্ধ ধর্মভীরু মানুষটাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা সত্যিই আমাদের নেই!

॥ বারো ॥

শুধু স্মৃতি

কুখ্যাত প্রত্নতত্ত্বের চোরাকারবারী নিশার হোসেনের সমস্ত দুষ্কর্মের চার্জশীট তৈরি করে ইনসপেক্টব ওয়াংকে বুঝিয়ে দিল মেঘনাদ। এরপর ফেরার পালা। তেজপুর বিমানবন্দরে ইনসপেক্টর ওয়াং নিজে এসে আমাদের বিদায় জানিয়ে গেলেন।

অরুণাচলের পাহাড়ী প্রকৃতিকে পেছনে ফেলে আমরা ফিরে চললাম সমতলেব দেশে। কিন্তু যাত্রাপথে সাবাক্ষণ মন জুড়ে রইলো গত কয়েক দিনের সে ভয়ানক অ্যাডভেঞ্চারের স্মৃতি আর গত কয়েক রাত আগে আমার দেখা আশ্চর্য স্বপ্ন-দৃশ্যটা!

দেবী ছিন্নমস্তার খাঁড়া চুরি-রহস্যের সঙ্গে এ স্বপ্নের সত্যিই কোনো যোগসূত্র আছে কিনা জানি না।

আতঙ্কের দ্বীপ

॥ এক ॥

নিশীথ রাতের কুহেলী

আকাশে শুক্লপক্ষের ভরন্ত চাঁদটা মেঘের কোলে লুকোচুরি খেলছে।

এখন অনেক রাত।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নিথর প্রকৃতি। কিন্তু নিঃশব্দ নয়। এ অরণ্য-পাহাড়ের মধ্যে যে সব ছোটখাট জলাশয় আছে সেগুলো থেকে শুরু হয়েছে ব্যাঙেদের ডাক—গ্যাঙর গ্যাঙ.......গ্যাঙর গ্যাঙ.......

অরণ্য পাহাড়ের চূড়ায় আলো-অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে মুখ লুকিয়ে আছে এক কাঠের বাংলো। এ বাংলারে হদিস কেউ রাখে না। রাখাব মতো মানুষই বা আশপাশে কোথায়।

হঠাৎ ও কি শব্দ!

আসুরিক শক্তি প্রয়োগে একটার পর একটা কাঠের দেয়াল, পার্টিশন সবকিছু চুরমার করতে করতে বাংলোব ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কি এক অতিকায় প্রাণী! নেমে আসতে লাগলো অরণ্য ভেদ করে!

সেই মুহূর্তে আকাশের চাঁদটা ঢাকা পড়েছে এক বিশাল মেঘের আড়ালে। তার ছায়ায় হারিয়ে গেছে জ্যোৎস্নার আলো। সেই গভীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতিকায় জীবটা থপ্ থপ্ শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে সামনের নদীটার দিকে।

একসময় সেই বিশাল দেহটা ঝাঁপিযে পড়লো নদীব জলে।

আর ঠিক তখনই পাহাড়-চূড়াব বাংলো থেকে ভেসে এল বৃদ্ধকণ্ঠেব এক কাতর আহ্বান--ওরে বাচ্চা, ফিবে আয়, ফিরে আয় বাচ্চা....!

সে ডাক শুনে সেই অতিকায় প্রাণীটা বোধহয় একবার শুধু মুখ তুললো আর ঠিক সেই মুহূর্তে চাঁদটা বেরিয়ে এল মেঘেব আড়াল থেকে। চকিত দেখা গেল বিশাল হেডলাইটের মতো জ্বলন্ত দুটি চোখ আর বিকট জলহস্তীর মতো মাথাটা।

এরপরই তুমুল আলোড়ন তুলে নদীতে ডুব দিল জীবটা। নদীর নাম পেরিয়া।

ওদিকে ভাঙা বাংলোর ভেতরে থেকে তখনও শোনা যাচ্ছে করুণ কণ্ঠস্বর—ওরে ফিরে আয়.....ফিরে আয় বাচ্চা....।

কিন্তু প্রকৃতিতে তখন স্তব্ধতা নেমে এসেছে। এমনকি ব্যাঙেদের ডাক পর্যন্ত থেমে গেছে অকস্মাৎ এই বিভীষিকার তাড়নায়।

পাহাড়-চূড়ার বাংলো থেকে বেরিয়ে এল-- কে ওই ভযঙ্কর?

কে ডাকে ওই অতিকায় দানবকে 'বাচ্চা' সম্বোধনে? নিশীথ রাতে এ কি কোনো কুহেলী মায়া!

॥ দুই ॥

ক্যাপটেন সিং-এর আমন্ত্রণ

মেঘনাদ বললো—ক্যাপটেন সিংকে তোর মনে আছে অর্ণব?

ছুটির দিন সকালে রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের বেলতলার ফ্ল্যাটে এসেছিলাম সকালটা একটু জমিয়ে আড্ডা দেব বলে, মেঘনাদ আমায় দেখে আজ প্রথমেই এই কথাটা ছুঁড়ে দিল।

সোফায় বসতে বসতে বললাম—কোন ক্যাপটেন সিং-এর কথা বলছিস, যিনি গত কয়েক বছর আগে হিমালয়ের শিনকি গিরি উপত্যকায় 'ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য' উদ্ধারে আমাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন?

মেঘনাদ বলো, —হ্যাঁ বন্ধু, এবারও উনি ডাক দিয়েছেন আর এক ভয়াবহ রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের সাহায্য চেয়ে। তবে উনি এখন আর সেনাবাহিনীতে নেই। অবসর নিয়ে দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু রাজ্য সীমানায় নতুন গড়ে ওঠা এক পর্যটক আবাসের উনি অধিকর্তা।

—রহস্যটা কি সেখানেই?

—হ্যাঁ। গত পনের দিন যাবৎ ওখানে বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গোটাকয়েক খুনও হয়েছে অথচ অপরাধীর আসল পরিচয় জানা যাচ্ছে না।

শুনে কেমন আগ্রহ অনুভব করলাম। বললাম—ব্যাপারটা একটু খুলে বলবি?

মেঘনাদ বললো—ক্যাপটেন সিং চিঠিতে যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকুই বলতে পারি। তার বেশি আমার অজানা।

বললাম—বেশ, তাই বল।

মেঘনাদ বলতে শুরু করলো ৽

জায়গাটা হলো কেরল আর তামিলনাড়ু সীমানার মাঝামাঝি। জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা।

ওখানে একটা নদী আছে। নদীর নাম পেরিয়া। মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দ্বীপেই বন্য জন্তুজানোয়ারের বাস। হিংস্র জন্তু খুব বেশি না থাকলেও হাতি, হরিণ, বুনো শুয়োর, বুনো মোষ তো আছেই।

মেঘনাদের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললাম,—ভারতের অন্যতম রিজার্ভ ফরেস্ট আছে ওখানে, তাই তো?

—ঠিক বলেছিস। মেঘনাদ বললো, তবে এ এলাকায় নদীটা আরও চওড়া। আগেই বলেছি, নদীটা এক একটা দুর্গম অরণ্য এলাকার চারপাশে বেড় দিয়ে বয়ে গেছে। এমন একটা দ্বীপের বুকেই আতঙ্কের সূত্রপাত। স্থানীয় লোকে বলে পেরিয়ার দ্বীপ।

আমি বললাম,—ক্যাপটেন সিং কি সেই দ্বীপেরই কোনো পর্যটক আবাসের অধিকর্তা?

—ঠিক তাই। ওই দ্বীপেই গড়ে তোলা হয়েছে একটা ট্যুরিস্ট লজ। অবশ্য ট্যুরিস্ট বলতে এখানে বেশির ভাগ বিদেশীরাই এসে ওঠে। এই অরণ্য পাহাড় প্রকৃতির মধ্যে দিনকয়েক কাটিয়ে যায়। মাইল কয়েক দূরে আছে 'ক্যু-ভ্যালি' নামে একটা জায়গা। কিছু কিছু ট্যুরিস্ট সেখান থেকেও এই পেরিয়ার দ্বীপে এসে এক চক্কর ঘুরে যায়। ক্যু-ভ্যালির পর্যটন পরিবহনের সে ব্যবস্থা আছে।

এবার না বলে পারলাম না—যা শুনছি তাতে জায়গাটায় যাবার খুব লোভ হচ্ছে বটে কিন্তু আতঙ্কের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

মেঘনাদ বললো—পটভূমিকা জানিয়ে এবার সে প্রসঙ্গেই আসছি।

মেঘনাদ খেই ধরলো ঃ

ব্যাপারটা যখন শুরু হয়েছিল প্রথমটা কেউ অস্বাভাবিক মনে করেনি।

আগেই বলেছি, সে এলাকায় দ্বীপটার মধ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বলতে তেমন কিছু নেই। তবু একদিন গভীর রাতে লজের কাছাকাছি নদীর ধার থেকে এক বুনো শুয়োরের ভীষণ মরণ-আর্তনাদ শোনা গেল।

পরদিন সকালে সেটার দেহটাও খুঁজে পাওয়া গেল। যেন এক ভারী 'রোলার'-এর নিচে চাপা পড়ে তার শরীরটা থেঁতলে গেছে। সেই সঙ্গে মৃত পশুটার আশপাশে পাওয়া গেল এক অদ্ভুত পদচিহ্ন!

-- অদ্ভুত কেন?

—কারণ তেমন কোনো জন্তুর পায়ের ছাপ কেউ কখনও দেখেনি! এমনকি স্থানীয় লোকজনেরাও নয়। হাতির চেয়ে বড় অথচ হাতির মতো নয়। পায়ের ছাপ উঠে এসেছে নদী থেকে, ফিরেও গেছে নদীতে।

— আশ্চর্য!

—আশ্চর্য তো বটেই। এমন কি জানোযার ভূ-ভারতে আছে যা গভীব রাতে নদীব ভেতর থেকে উঠে এসে বুনো শুয়োরের মতো জন্তুকেও এভাবে হত্যা করে নদীতেই ফিরে যায়?

রহস্যটা অমীমাংসিতই থেকে গেল।

কিন্তু ঘটনা থেমে রইলো না।

এরপর এক রাতে একটা হরিণ আর এক রাতে একটা মোষ মারা পড়লো। যথারীতি রাতের বেলা, একই ভাবে জন্তুদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল।

সব শেষ ঘটনাটা ঘটেছে দিনকয়েক আগে। সেই ঘটনাই মারাত্মক।

ট্যুরিস্ট লজের এক কর্মচারীর সেদিন বাড়ির ফেরার তাড়া ছিল। তার বাড়ি ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ক্যু-ভ্যালিতে। কিন্তু সেদিন সারা বিকেল বৃষ্টি হওয়ায় সে লজ ছেড়ে বেরুতে পারেনি। তারপর রাত আটটা নাগাদ বৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে পড়লো লজ ছেড়ে। নদীর ধারে সব সময় বাঁধা থাকে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো। লোকটা বোধহয় ভেবেছিল ওইটুকু নৌকো সে একাই বেয়ে নদী পার হয়ে যাবে। এসব এলাকার স্থানীয় লোক নৌকা

চালনায় পটুই হয়—তাই ব্যাপারটা অসম্ভব মোটেই নয়।

কিন্তু সেদিন নদীর ঘাট পর্যন্ত আর তার পৌঁছনো হয়নি।

সে রাতে লজ থেকেই শোনা গিয়েছিল তার দুঃসহ মরণ-আর্তনাদ। শুনে লজসুদ্ধ লোক ঠকঠক করে কেঁপেছে। কারুর সাহস হয়নি সেই মুহূর্তে লজ ছেড়ে বেরুবার।

কিন্তু ক্যাপটেন সিং খুব বেশি দেরি করেননি। মিলিটারি মানুষ। সাহসের অভাব নেই। জনাকয়েক সঙ্গী নিয়ে পৌঁছলেন ঘটনাস্থলে। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। লজের কর্মচারীটির বীভৎস থেঁতলানো দেহ পড়ে রয়েছে নদীর ধারে। তার পাশে যথারীতি সেই হাতির মতো অদ্ভুত পায়ের ছাপ। চলে গেছে নদীর দিকে।

বলতে বলতে মেঘনদা একটু থেমে বললো—স্থানীয় সবকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্য তদন্ত শুরু করেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই অজ্ঞাত আততায়ী প্রাণীটির কোনো সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় ক্যাপটেন সিং আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। গতকালই ওর চিঠি এসে পৌঁছেছে আমার ঠিকানায়।

॥ তিন ॥

পেরিয়ার দ্বীপে যাত্রা

পেরিয়ার দ্বীপের ট্যুরিস্ট লজটা সত্যিই খুব সুন্দর। জঙ্গল আর পাহাড়-ঘেরা দুর্গম দ্বীপের এক অংশে অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিলাসবহুল পর্যটননিবাস। চারদিকটায় নানা গাছ-গাছালি ফলফুলের বাগান।

ট্যুরিস্ট বেশিব ভাগই বিদেশী, এদেশে বেড়াতে এসে কেউ কেউ এই দ্বীপাবাসে দিনকয়েক কাটিয়ে একই সঙ্গে পাহাড় অরণ্য আর নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করে যান।

ক্যু-ভ্যালি থেকে একটা জীপ নিয়ে পেরিয়া নদীর কাছে পৌঁছতেই একটা মোটর বোট আমাদের পৌঁছে দিল পেরিয়ার দ্বীপের উপকূল ভাগে।

আমরা যখন লজের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম তখন দুপুর।

একটা জিনিস কিন্তু এই দ্বীপে পা দেযার পর থেকেই অনুভব করতে শুরু করেছি, তা হলো, সারা দ্বীপটা বড় বেশি চুপচাপ। ফুটফুটে রোদ্দুরেও কেমন যেন ভয় ভয় ভাব।

লজের ভেতর সেটা আরও বেশি করে অনুভব করলাম। জনাকয়েক পুলিশ চোখে পড়লো—তাদের চোখে মুখেও চাঞ্চল্য।

একটা কি যেন হয়েছে। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চযই।

ইতিমধ্যে ক্যাপটেন সিং আমাদের আসার খবর পেয়েছেন। শশব্যস্তে এসে হাজির হলেন।

—মেঘনাদ ভাইয়া, অর্ণববাবু, আপনাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি। আপনাদের দেখে কী ভরসাই যে পেলুম।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ক্যাপটেন সিংয়ের দিকে। অন্ততঃপক্ষে বছর সাতেক বাদে দেখা তো বটেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ক্যাপটেন সিং-এর চেহারায় বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি—শুধু মাথা আর পাকান গোঁফের চুল আর কিছু পেকেছে।

মেঘনাদ বললো—আবার নতুন কিছু ঘটেছে নাকি ক্যাপটেন সিং?

—এবার যা ঘটেছে, মনে হচ্ছে, আর এ দ্বীপে আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। পর্যটক আবাস তুলে খুব শীগগির এই আতঙ্কের দ্বীপ থেকে আমাদের সকলকেই পালাতে হবে।

—আতঙ্কের দ্বীপ! কথাটা আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে এল।

—হ্যাঁ, অর্ণববাবু, আশপাশ এলাকার লোকজন এখন এই পেরিয়াব দ্বীপকে 'আতঙ্কের দ্বীপ' নামেই ডাকতে শুরু করেছে।

—নতুন করে কি ঘটলো? মেঘনাদ দাঁড়িয়ে পড়ে আসল কথাটা জানতে চাইলো।

—সে কথা এখুনি নয়। সবেমাত্র এলেন। ভেতরে চলুন। চা-টা খান, তারপর সব বলবো।

ক্যাপটেন সিং লজে আমাদের থাকার জন্যে আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন।

॥ চার ॥

বিভীষিকার কবলে

ক্যাপটেন সিং যা শোনালেন তা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর।

গতকাল সন্ধ্যেবেলা এই ট্যুরিস্ট লজের প্রায় কাছাকাছি এলাকার মধ্যে দুজন ট্যুরিস্টের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে সেই অজানা দানবটা।

একজন নিহত, অন্যজন মারাত্মকভাবে আহত। তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

আর সে কারণেই আজ দ্বীপে পা দিয়েই অমন থমথমে ভাব লক্ষ্য করেছিলাম আমি আর মেঘনাদ।

ক্যাপটেন সিং বললেন, গতকাল সকালেই ওই দুজন বিদেশী তরুণ পেরিয়ার দ্বীপের লজে এসে ওঠে। অন্যান্য টুরিস্টদের চেয়ে ওরা সব ব্যাপারেই একটু আলাদা। অনেক বেশি বেপরোয়া আর প্রাণচঞ্চল।

লজের কর্তৃপক্ষের বারণ সত্ত্বেও সন্ধ্যেবেলা কখন যে এক ফাঁকে ওরা লজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ লক্ষ্য করেনি। ওরা নদীর কাছাকাছি একটা বড় গাছের নিচে বসে টেপরেকর্ডার চালিয়ে নিজেরা গান গাইতে শুরু করেছিল।

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ কেটে গেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদটা টাঙান রয়েছে এক গোলাকার থালার মতো। আনন্দের উল্লাসে ওরা বোধহয় আত্মহারা হয়ে পড়েছিল তাই শুনতে পায়নি কিছু। বুঝতেও পারেনি নদীর দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছিল এক দানব।

ওরা যখন সচেতন হলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লো তরুণীটি। অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ফিরে তাকিয়েই আঁতকে উঠলো। তার সঙ্গী তরুণটি আটকে পড়েছে লকলকে এক বিশাল পিচ্ছিল জিভের প্যাঁচে।

শুধু এক পলকই সেই আক্রমণকারীর দিকে তাকাবার অবকাশ পেয়েছিল তরুণীটি। এমন ভয়াবহ কোনো জীব জীবনে সে কোনোদিন দেখেনি। বিরাট হেডলাইটের মতো দুটো চোখ, জলহস্তীর মতো বিকট মুখ।

এর বেশি আর দেখার সময় ছিল না। শরীরের যন্ত্রণা ভুলে সঙ্গীকে ওই অবস্থায় ফেলেই প্রাণরক্ষার তাগিদে দুদ্দাড়িয়ে ছুটে লজের সামনে এসে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে তরুণীটি।

লজের মধ্যেও তৎক্ষণে হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে, কারণ ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া গেছে সদ্য আগন্তুক তরুণ তরুণী দুজন সন্ধ্যের অন্ধকারে লজ ছেড়ে বেরিয়েছে, আর একটু আগেই শোনা গেছে মানুষের আর্তনাদ।

ক্যাপটেন সিং তাঁর কাহিনী শেষ করলে আমি বললাম—এ সব কথা নিশ্চয়ই আপনারা সেই আহত তরুণীটির মুখ থেকে শুনেছেন?

—হ্যাঁ। যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল, তার কাছ থেকে অতি কষ্টে এই বিবরণ আদায় করতে পেরেছিলেন ইন্সপেক্টর নায়ার।

—ইন্সপেক্টর নায়ার বুঝি এ ব্যাপারে সরকারী তদন্ত করছেন?—প্রশ্ন করি।

– হ্যাঁ। স্বভাবতই এই নির্জন শান্তিময় পেরিয়ার দ্বীপে কিছুদিন যাবৎ এই সব কাণ্ডকারখানায় সরকারের টনক নড়েছে। এর ওপর বিদেশী ট্যুরিস্ট নিহত হবার ঘটনায় সরকার তো রীতিমতো উদ্বিগ্ন। ইন্সপেক্টর নায়ার তাঁর পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসে আজ সারাদিন দ্বীপে তল্লাসী চালিয়েছেন, এমনকি নদীতে ডুবুরি নামাতেও বাকি রাখেননি। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। দানবটা যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে হঠাৎই জলের মধ্যে হারিয়ে যায়। তার এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ সময় আমরা কেউই কথা বললাম না। এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। তারপর মেঘনাদ হঠাৎ বললো—আচ্ছা ক্যাপটেন সিং, আপনি বলছেন মেয়েটি আর ছেলেটি যখন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল, সঙ্গে ছিল একটা টেপরেকর্ডার এবং সেটার রেকর্ডিং চালু করে ওরা গান গাইছিল। তার মানে ঘটনাটা যখন ঘটেছিল সে সময়ের সমস্ত শব্দ সেই টেপরেকর্ডারে রেকর্ডিং হবার কথা। সেটার কি কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে?

ক্যাপটেন সিং যেন লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজিত স্বরে বললেন—ঠিক

বলেছেন মেঘনাদ ভাইয়া। টেপরেকর্ডারটার কথা আমাদের কারুর মাথাতেই আসেনি, এমনকি ইন্সপেক্টর নায়ার-এর মাথাতেও না। গতকাল নদীর ধার থেকে আমরা সেই তরুণ-তরুণীর দুটি সাইড ব্যাগ এবং টেপরেকর্ডারটাও তুলে এনেছিলাম মনে আছে। এখন সেটা কোথায় আছে জানতে হবে। যাই হোক, আশা করছি আজ রাতের মধ্যেই ওটা আপনার কাছে পৌঁছে দেব—দেখুন যদি আপনার কোনো কাজে লাগে।

—সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস যদি সম্ভব হয়, মেঘনাদ সোফায় হেলান দিয়ে বললো—সেই অজানা জীবটার পায়ের থাবার একটা ফটোগ্রাফ। ইন্সপেক্টর নায়ারের কাছে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

একটু চিন্তা করলেন ক্যাপটেন সিং, তারপর বললেন—বেশ আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি। ইন্সপেক্টর নায়ারকে আমার আগে থেকেই আপনার কথা বলা আছে। উনি সহযোগিতা করবেন বলেছেন।

ইতিমধ্যে রাজু ঘরে ঢুকে পড়েছে, আমাদের জন্যে আর এক প্রস্থ গরম কফি আব কাজুর প্লেট নিয়ে।

সেই রাতেই ক্যাপটেন সিং দুটি জিনিস মেঘনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলেন—নিহত বিদেশী তরুণটির টেপ-রেকর্ডার আর সেই রহস্যময় ভয়াবহ জন্তুটার পায়ের ছাপের একটা ফটোগ্রাফ।

সৌভাগ্যের বিষয় টেপ-রেকর্ডারটা এত কাণ্ডের মধ্যেও মোটামুটি অক্ষত ছিল এবং তাতে সচল ক্যাসেটটি সেই ভয়ঙ্কর সময়ের আশপাশের সমস্ত শব্দই তুলে রেখেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত মেঘনাদকে দেখলাম সেই ক্যাসেটটা চালিয়ে কান পেতে থাকতে আর ওর সেই লাল ডায়েরিটায় কি সব নোট নিতে।

ওর পাশে বেশ কিছুক্ষণ বসে রেকর্ডিং করা ক্যাসেটের শব্দগুলো আমিও শুনেছি।

আর শোনার মতো অনেক কিছু আছেও তাতে—নিশাচর পাখির ডাক, তরুণ-তরুণীর নাচগানের উচ্ছ্বাস, তারই মধ্যে ভাল করে কান পাতলে শোনা যায় একটা ভারী কিছু লাফিয়ে আসার শব্দ-থপ্....থপ্......থপ্....

এই জান্তব পদশব্দটা বারবার ঘুবিয়ে ফিরিয়ে শুনছিল মেঘনাদ আর মাঝে মাঝেই এই জন্তুটার থাবার ফটোগ্রাফ আলোর ওপর রেখে কি যেন দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মেঘনাদের এই সব কাণ্ড দেখতে দেখতে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে!

॥ পাঁচ ॥

জঙ্গল পাহাড়ের পাগলা সাহেব

পরদিন সকালে এক আশ্চর্য বৃদ্ধের সঙ্গে মোলাকাত হলো।

মেঘনাদ আর আমি বেরিয়েছিলাম লজের আশপাশটা একটু ঘুরে দেখার

জন্যে। আমাদের সঙ্গে ছিল লজের ছোকরা বেয়ারা রাজু।

ক্যাপটেন সিং সকালবেলাতেই বেরিয়েছেন। বলে গেছেন হাসপাতালে সেই আহত বিদেশী তরুণীটিকে দেখে থানায় যাবেন ইন্সপেক্টর নায়ার-এর সঙ্গে কথা বলতে। যাবার আগে রাজুকে আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন। লজের সেই ছোকরা বেয়ারাটা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলে। হিন্দী জানলেও বলতে চায় না।

রাজুই আমাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছু দেখাচ্ছিল।

পেরিয়ার দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি যে সুন্দর তা তো আমরা গতকালই এখানে আসার পথে টের পেয়েছি। যদিও সময়টা বর্ষাকাল, তবু গতকাল থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় মাটি প্রায় শুকনোই বলা চলে। তাছাড়া পাহাড়ী বর্ষায় পাথুরে মাটিতে জল দাঁড়ায় না। রাজু আমাদের সেই গাছটার কাছে নিয়ে গেল— সেখানে দুদিন আগে ভয়ঙ্কর দানরের হাতে নিহত হয়েছে এক তরুণ আর মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে তার সঙ্গিনী।

একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রাজু বললো—এই সেই জায়গা স্যার।

মেঘনাদ যা খুঁজছিল তা পেল।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় মাটির ওপর যে সব ছাপ পড়েছিল তা এখনও প্রায় অবিকৃতই আছে।

সেই অজানা ভয়ঙ্কর জীবের থাবার যে ছাপ গতরাতে ফটোগ্রাফে দেখেছিলাম এখন দেখলাম সরাসরি মাটিতে।

সত্যিই বড় অদ্ভুত সে থাবার আকার।

দৈর্ঘ্য অন্ততঃ বার ইঞ্চি তো বটেই। মনে হয় সামনে এবং পেছনের মোট চার পায়ে দুরকম থাবা আছে। তাই কোনো কোনো থাবায় চার আঙুল, কোনো থাবায় পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়েছে। পাঁচ আঙুলে থাবাগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত মনে হয় এবং মাটির ওপর দাগ পড়েছে বেশ গভীর ভাবেই। অর্থাৎ ছাপের গভীরতা ও প্রকৃতি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না জন্তুটা বিশাল এবং রীতিমতো ভারী ওজনের।

দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম এমন কোনো ভয়ঙ্কর জীব থাকতে পারে কি যা এভাবে আঁধার রাতে নদীর ভেতর থেকে বিশাল চেহারা নিয়ে উঠে আসে, তারপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে একেবারে হারিয়ে যায় নদীর জলে!

মেঘনাদ ইতিমধ্যে গভীর অভিনিবেশ সহকারে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে সেই অজানা রহস্যময় থাবাগুলো দেখতে দেখতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল নদীর দিকে।

ঠিক তখনই এক অদ্ভুত হাসি শুনে ঘাড় ফেরালাম।

এক থুত্থুরে বুড়ো। পরণে একটা নোংরা প্যান্ট শার্ট, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, চোখে পুরনো ফ্রেমের নোংরা চশমা, তার একদিকের ডাঁটিটা ভেঙে গেছে, সে জায়গায় একটা দড়ি দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। পায়ে বিবর্ণ

ক্যাম্বিসের জুতো।

বুড়োটা একটু দূরে একটা পাথুরে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েই হাসছে—হিঃ....হিঃ....।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পরিষ্কার ইংরাজিতে বললো—বলি তোমরা বুঝি পুলিশের লোক, আমার দুষ্টু বাচ্চাটার পায়ের ছাপ ধরে তার তল্লাশী করছো? কিন্তু তাকে খুঁজে পাবে তোমাদের সে সাধ্য কি—হিঃ...হিঃ...হিঃ... হিঃ...।

রাজুর দিকে তাকাতে রাজু বললো—ও পাগলা সাহেব। জঙ্গলের ভেতরে পাহাড়ের ওপর একটা ভাঙা বাংলোয় একা একা থাকে। কারুর সঙ্গে মেশে না। কেউ ওর বাংলোর সামনে গেলেই একটা বাঘের মতো কুকুর আছে লেলিয়ে দেয়। তাই বাংলোর কাছেও কেউ ঘেঁষে না।

—হিঃ....হিঃ...হিঃ....হি....

বুড়ো আবার হেসে উঠলো, তারপর মাথা দুলিয়ে বললো—পারবি না রে, আমার বাচ্চাকে তোরা কেউ খুঁজে পাবি না। বাচ্চা আমার বড্ড অভিমানী। কিন্তু কেন আমার বাচ্চা দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে তা একমাত্র আমি বুঝি।

এসব কি বলছে ওই বৃদ্ধ! ও কি সত্যিই এক উন্মাদ?

এর মধ্যে মেঘনাদ কখন একসময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। চমক ভাঙলো ওর কন্ঠস্বর শুনে।

—আপনার বাচ্চার অভিমানের কারণটা কি প্রফেসর?

মেঘনাদের কথাবার্তাও কম হেঁয়ালিপূর্ণ নয়।

দেখলাম মেঘনাদের কথায় চমকে একবার ওর দিকে তাকালো বৃদ্ধ। ঝাপসা কাঁচের ভেতর ফুটে উঠলো দুটি অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি, তারপর আবার সে কি হাসির ঘটা!

মেঘনাদ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলো না, বললো—জানেন কি প্রফেসর, আপনার 'বাচ্চাটি' এখন মানুষের এক ভয়ঙ্কর শত্রু। ওকে আমরা খুঁজে বার করে শেষ করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত চিৎকার শোনা গেল বৃদ্ধের কণ্ঠে—থামো হে নির্বোধ। এ কথা বলতে লজ্জা করে না তোমাদের। আমার ওই বাচ্চার তোমাদের কতটুকু ক্ষতি করার সাধ্য—তার চেয়ে মানুষের অনেক বড় শত্রু তোমরাই, মানুষেরাই। হিরোসিমায় এ্যাটম বোমা ছুঁড়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে কে? আজও প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন সীমান্তগুলিতে যুদ্ধে মরছে শত শত মানুষ। কে মারছে তাদের? আর ঘরের পাশে ভূপালে এই তো সেদিন গ্যাস লিক করে মরলো, পঙ্গু হলো কত হাজার মানুষ—কাদের অপদার্থতা আর অমানুষিক লোভের পরিণামে? মহাকাশে যুদ্ধের মহড়া দিয়ে কারা অস্ত্র শানাচ্ছে মানুষ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে.....তোরা....তোরা.... মানুষেরাই আজ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

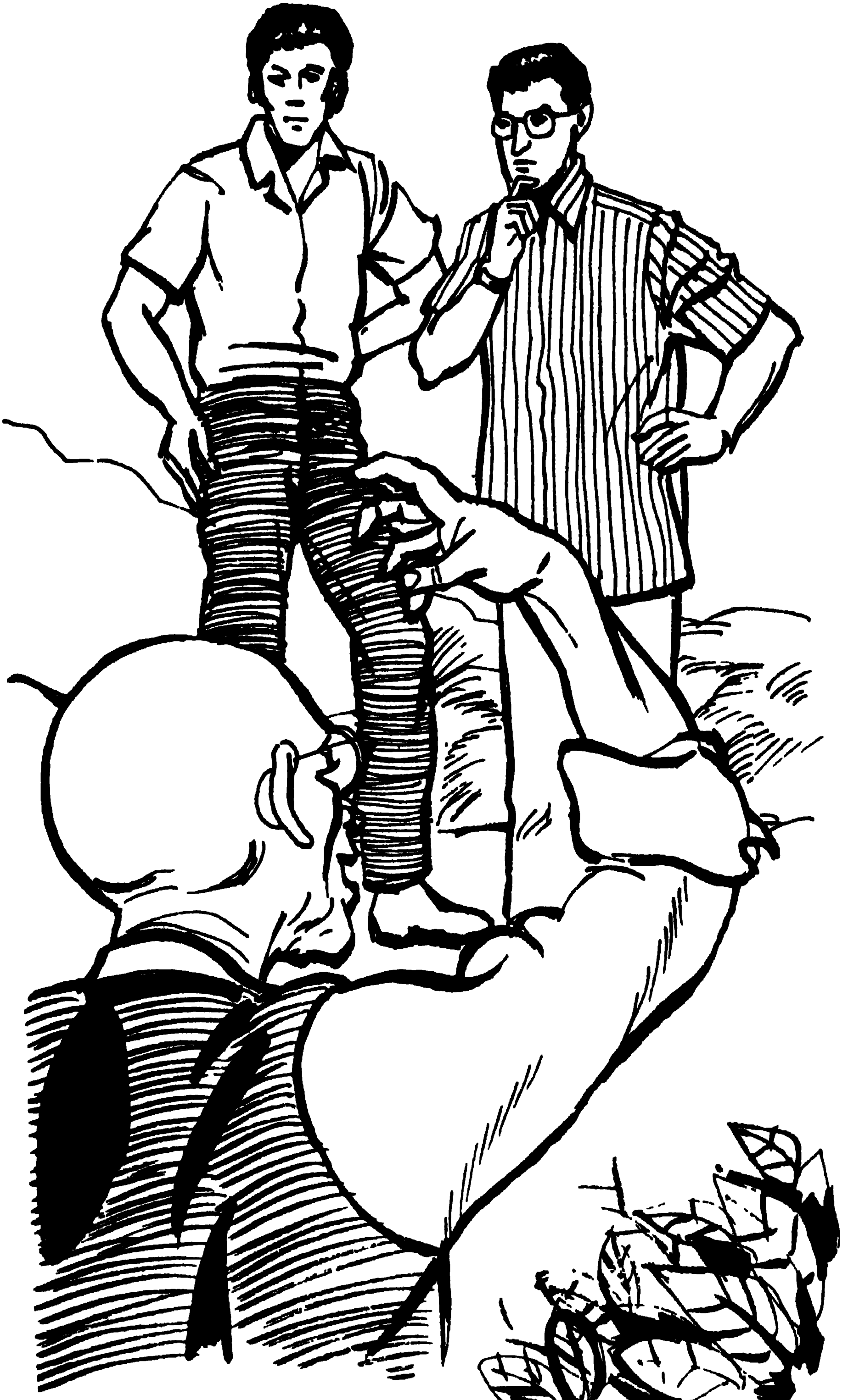

॥ ছয় ॥

আর এক নতুন রহস্য

বিকেলের দিকে ইন্সপেক্টার নায়ারকে সঙ্গে নিয়ে কাজে ফিরলেন ক্যাপটেন সিং।

ইন্সপেক্টর এসেছেন অমাদের সঙ্গে অলাপ করতে। ইন্সপেক্টর নায়ার মানুষটি ভালো। মেঘনাদের দু'হাত ঝাঁকিয়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন, আপনার কথা ক্যাপটেন সিং-এর কাছে আগেই শুনেছি মিঃ ভরদ্বাজ। আপনি যদি এ দ্বীপের অতঙ্ক মোচনে আমাদের সাহায্য করেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। কিছুক্ষণ এটা-ওটা কথার পর আমরা আসল প্রসঙ্গে এলাম।

ইন্সপেক্টর নায়ারের মুখে শুনলাম, লজের সেই বিদেশী তরুণীটি, যে সে রাতে অজানা দানবের থাবায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সারা শরীরে নাকি ঘা ছড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন তার শরীরে রেডিও এ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয় দূষণ পাওয়া যাচ্ছে। তাকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে।—

রেডিও এ্যাকটিভিটি! মেঘনাদ আপন মনেই বিড়বিড় করলো।

এর পর অমি আজ সকালে দেখা জঙ্গল পাহাড়ি বাংলোর সেই আশ্চর্য পাগলা সাহেবের প্রসঙ্গ তুললাম।

ক্যাপটেন সিং সাহেব সম্পর্কে যা বললেন তার মধ্যে নতুন কিছু শোনা গেল না। রাজুর মুখে আগেই শুনেছি, আসলে ওই সাহেবকে নিয়ে কখনও কারুর মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি।

ইন্সপেক্টর নায়ার কিন্তু সব শুনে একটা নতুন তথ্য জানালেন, সেটাও কম বিস্ময়কর নয়।

তিনি বললেন—অর্ণববাবু, আপনি বলছেন সেই পাগলা সাহেবের পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো ছিল। মনে হচ্ছে আজ একটা নতুন রহস্যের উদঘাটন হলো।

নতুন রহস্য!

—হ্যাঁ। রহস্যটা হলো, প্রায় যে কবারই সেই অজানা দানব হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ফিরে গেছে তার বিশাল থাবার ছাপের কাছাকাছি ক্যাম্বিসের জুতো পরা মানুষের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। এটার অর্থ এতদিন বুঝতে পারছিলাম না।

ক্যাপটেন সিং বললেন—এর মানে অপনি বলতে চান ওই পাগলা সাহেবই সেই অজানা ভয়ঙ্কর জীবটাকে মানুষ বা জীবজন্তুর ওপর লেলিয়ে দিচ্ছে।

কী ভয়ানক কথা!

আমি বললাম—অন্ততঃপক্ষে সেই দানবটার সঙ্গে সেই সাহেবের কোনো এক প্রকার সম্পর্ক যে অছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে, অমন একটা জানোয়ারকে

'বাচ্চা' সম্বোধন থেকে।

ইন্সপেক্টর নায়ার চোখ কপালে তুলে বললেন—কি জানি মশাই, এতকাল পুলিশ লাইনে চাকবি করছি এমন আজগুবি ব্যাপার স্যাপার চোখে দেখা তো দূরের কথা কানেই কখনও শুনিনি।

মেঘনাদ এতক্ষণ চুপচাপ বসে কি যেন ভাবছিল, এইবার নীরবতা ভেঙে বললো— এভাবে বসে বৃথা জল্পনা-কল্পনা করে লাভ অছে কি? তার চেয়ে আমরা আগামীকালই এই পেরিয়ার দ্বীপের জঙ্গল পাহাড়ের মাথায় পাগলা সাহেবের সেই রহস্যময় বাংলোয় হানা দেব। আমার ধারণা, সেখানে কিছু সূত্র মিলতে পারে।

॥ সাত ॥

মৃত্যু কী ভয়ঙ্কর

বেরুবার ব্যবস্থা আমাদের তখন সম্পূর্ণ। অমরা চারজন চারটে রিভলবার নিয়েছি। এ ছাড়া মেঘনাদের সেই বিখ্যাত কুক্‌রিটা তো আছেই। সুতরাং বাংলোতে ঢুকতে গেলে পাগলা সাহেব যদি ব্লাড হাউন্ড লেলিয়েও দেয় তবে মেঘনাদ শুধুমাত্র ওই কুক্‌রির সাহায্যেই মোকাবিলা করতে পারবে।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম রাজুর জন্যে। ভোরবেলা ও কি একটা কাজে বেবিয়েছে। এক্ষুণি ফিরে আসার কথা।

সকাল নটা নাগাদ হাঁপাতে হাঁপাতে রাজু এল। উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো যেন ফেটে বেরুচ্ছে।

—কি ব্যাপার রাজু? কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।

—হাঁ সাব। খবর সাংঘাতিক। এতকাল রাতে পাগলা সাহেব খুন হয়েছে। বাংলো পুড়ে ছাই। সেই বাঘের মতো কুকুরটা অর সাহেব দুজনেই মরে পড়ে রয়েছে বাংলোর পেছনে।

—সে কি! কে বললো তোমায় এ কথা?

—এক স্থানীয় কাঠুরে সাব। দিনের বেলা জঙ্গলে তো কোনো ভয় নেই তাই ঢুকেছিল কাঠ কাটতে। দূর থেকে জঙ্গল পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়া উড়তে দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায়—

মেঘনাদ ব্যস্তভাবে বললো—ব্যস, আর কোনো কথা নয়। আমরা এক্ষুণি একবার স্পটে যাবো। রাজু, তুমিও চল।

তক্ষুণি অমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গল পাহাড়ের সেই বাংলোর উদ্দেশ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেরিয়ার জঙ্গলে পাহাড়ের ওপর সেই বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

বাংলোটাকে এখন অবশ্য আর চেনার উপায় নেই। প্রায় গোটাটাই পুড়ে

গেছে।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে পোড়া কাঠ, টেবিল-চেয়ারের টুকরো, কিছু তৈজসপত্তর, সেই সঙ্গে কাঁচের টেস্টটিউব, ভাঙা জার, গবেষণার সরঞ্জাম আর সম্ভবতঃ গবেষণার প্রয়োজনেই রাখা খরগোশ, ব্যাঙ, গিনিপিগ, টিকটিকি ইত্যাদি প্রাণীর দেহাবশেষ ছড়িয়ে অছে পোড়া বাংলোর মধ্যে।

এসবের মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো—যাকে এ এলাকার সবাই পাগলা সাহেব বলে জানে। আসলে তিনি ছিলেন এক বিজ্ঞানী। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে কি গবেষণা চালাচ্ছিলেন তা বুঝি আর জানা গেল না।

তেমনই বোঝা যাচ্ছে না বাংলোটা হঠাৎ পুড়লো কি করে?

এর পর বাংলোর পেছনে পাহাড়টা যেখানে নদীর দিকে নেমে গেছে সেদিকে কিছুটা এগুতেই প্রথমে চোখে পড়লো সেই নিশীথ দানবের বিশাল পায়ের ছাপ।

ইন্সপেক্টর নায়ার বললেন—এই দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ, অজানা জন্তুটার পায়ের ছাপের কাছেই আর একটা ক্যাম্বিসের জুতো পরা পায়ের ছাপ রয়েছে।

ক্যাপটেন সিং বললেন—নিঃসন্দেহে ওই সাহেবের।

মেঘনাদ মাথা না তুলে বললো—এখানে অর একটা ছাপ রয়েছে লক্ষ্য করুন। কুকুরের পায়ের ছাপ। সাহেবের কুকুর।

কথা বলতে বলতে আরও কিছুটা পথ আমরা এগিয়ে এসেছি নদীর দিকে।

আর তখনই চোখে পড়লো বীভৎস দৃশ্যটা।

পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু জীবনে কোনোদিন দেখিনি।

ব্লাড হাউন্ডের মতো হিংস্র কুকুরকেও হত্যা করে শরীর থেকে মাংস খুবলে খেয়ে যেতে পারে যে জীব সে যে কী ভয়ঙ্কর দানব তা সহজেই অনুমেয়। কুকুরের কাছাকাছি সাহেবের দেহটাও পড়ে রয়েছে। তাকেও রেহাই দেয়নি ভার বাচ্চা—সেই দানব।

দেখতে দেখতে মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠলো।

হঠাৎ মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনলাম। মৃতদেহের পাশে হত্যাকারী দানবের পায়ের থাবার দাগ পরীক্ষা করতে করতে রাজুর উদ্দেশ্যে বললো, গতকাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছে, তাই না?

—হাঁ সাব। রাত দশটার পর থেকে টানা একঘণ্টার মতো বৃষ্টি হয়েছিল।

—হুঁ! মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেকটর নায়ারকে বললো—চলুন, ফেরার পথে পোড়া বাংলোটা আর একবার ঘুরে যাই।

পোড়া বাংলোর কাছে আমরা আর একবার ফিরে এলাম।

আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ও ঢুকলো বাংলোর সেই ধ্বংসস্তূপেব মধ্যে। ফিরে এল বেশ কিছুক্ষণ পর। ওর হাতে প্রায় দগ্ধ একটা ডায়েরি মতো রয়েছে।

জিগ্যেস করতে বললো পাগলা সাহেবের পোড়া ল্যাবরেটরির দগ্ধ জিনিসপত্তরের মধ্যে সেটা ও খুঁজে পেয়েছে। যদি কোনো কাজে লাগে সেই ভেবে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কি কাজে লাগবে কে জানে। পাগলা সাহেব সত্যিই যদি একজন বিজ্ঞানী হন তবে তাঁর ডায়েরি খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই—কিন্তু জিনিসটা প্রায় দগ্ধই মনে হচ্ছে—যে কটা পাতা আস্ত আছে তাও কালচে হয়ে গেছে।

তখনকার মতো এ সব নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। জানতাম লাভ হবে না।

ফেরার পথে মেঘনাদ ইন্সপেক্টর নায়ারকে বললো—আগেকার লাশগুলো কি করেছেন জানি না, কিন্তু এগুলো বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। আমার মনে হচ্ছে সেই আহত ট্যুরিস্ট মেয়েটির মতো এই দুটি মৃত শরীরেও তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে।

বলেন কি!

—এর বেশি অপাততঃ কিছু জানতে চাইবেন না।

॥ আট ॥

সূত্র

ইতিমধ্যেই আশপাশ এলাকায় গুজব এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। রাতারাতি ট্যুরিস্ট লজও প্রায় খালি হয়ে গেল। কে অর ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে এসে বিদেশ-বিভূঁইতে বেঘোরে প্রাণটা দিতে চায়। রিপোর্টারবা আসছে দলে দলে। ঘটনার চেয়েও তাদের বিবরণ আরও ভয়ঙ্কর।

পেরিয়াব দ্বীপে পর্যটন ব্যবসা বুঝি লাটে উঠলো।

আব সে কারণেই পর্যটক আবাসের অধিকর্তা ক্যাপটেন সিং এবং সেই সঙ্গে সরকারী শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক ইন্সপেক্টাব নায়ার রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঘুরে এসেছি এরনাকুলাম হাসপাতালে। নিশীথ দানবের আক্রমণে আহত সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটি সেখানে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে চলেছে। ইন্সপেক্টরের অনুরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মেঘনাদকে অনুমতি দিল মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। মেঘনাদ বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করলো এবং সমস্ত প্রশ্নোত্তর তুলে রাখলো সঙ্গের টেপরেকর্ডারে।

সেখানেই মেঘনাদের পরিচয় হলো প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে। এরনাকুলাম সায়েন্স ইন্সটিট্যুশানের জীবতত্ত্বের গবেষক। তিনি নিজেও বর্তমানের এই অদ্ভুত বিষয়টিতে আগ্রহী মনে হলো, সেই কারণেই হাসপাতালে এসেছিলেন ট্যুরিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বিশেষভাবে জানতে।

মেঘনাদের সঙ্গে প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির বেশ খানিকটা সময় অলোচনা হলো।

মেঘনাদের কাছে তখন সেই অদ্ভুত দানবের পায়ের ফটোগ্রাফ আর পোড়া বাংলোয় পাওয়া আধপোড়া ডায়েরিটাও ছিল।

ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু তখন আমার পক্ষেও জানা সম্ভব হলো না—কারণ সবটাই ছিল 'টপ্ সিক্রেট'।

এর পর থেকে দুদিন যাবৎ মেঘনাদকে দেখছি গম্ভীরভাবে সর্বক্ষণই কি যেন ভেবে চলেছে আর কখনও টেপরেকর্ডার চালিয়ে সেই অজানা দানবের পায়ের আওয়াজ শুনছে অথবা সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তার অংশগুলো নূতন করে বাজাচ্ছে। পোড়া ডায়েরিটা অবশ্য ওর কাছে দেখলাম না, একবার শুধু জিজ্ঞেস করতে জানিয়েছে, ওটা প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির জিম্মায় আছে।

তৃতীয় দিনে আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ওর পাশে বসে জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁরে, রহস্যভেদীব এ্যাসিসটেন্ট হিসেবেও কি তোর ভাবনার কোনো ভাগই এখন আমি পেতে পারি না?

মেঘনাদ আমার কথায় মুখ তুলে তাকিয়েছে। ওর দু'চোখের দৃষ্টিতে অপার রহস্যময়তা। বলেছে— বেশ, তাহলে বল তো বন্ধু, কোন জন্তু থপ্ থপ্ শব্দে লাফিয়ে চলে অর সন্ধ্যের পব বেরিয়ে লম্বা জিভ বার করে শিকার ধরে? কোন জন্তুর পাহাড়ের মতো দেহ, গরুর গাড়িব চাকাব মতো চোখ আর জলহস্তীব মতো মাথা?

আমি একটু ভাবনার ভান কবে বললাম—রামগড়ুরের ঠাকুর্দা?

মেঘনাদ বিরক্ত হয়ে বলেছে—তুই একটা রাম বুদ্ধু।

॥ নয় ॥

মেঘনাদের হেঁয়ালি

পরদিন সকালেই মেঘনাদ বেরিয়ে গেল। সঙ্গে এ্যাটাচির মধ্যে ভরে নিযে গেল টেপরেকর্ডারটা।

সেদিন আর ফিরলো না মেঘনাদ। ফিরে এল সন্ধ্যের পর। তারপর ক্যাপটেন সিংকে ডেকে বললো—আপনি আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই ইন্সপেক্টর ন্যায়ারকে ডেকে পাঠান। জরুরী আলোচনা আছে।

ক্যাপটেন সিং বললেন—মেঘনাদ ভাইয়া, আপনার মতলবটা কি তা তো কিছু বুঝতে পারছি না। পুরো একটা দিন কোথায় ঘুরে এলেন?

—প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে এবার দেখা করার দরকার ছিল। একটা বিশেষ জিনিসের অর্ডারও দিয়ে আসতে হলো। সেটা খুঁজে বার করতেই দেরি হলো। আশা করছি আগামীকাল সকালের মধ্যেই সেটা এসে পড়বে। তারপরই আমরা কাজ শুরু করতে পাববো।

—বিশেষ জিনিস ! কাজ ! এসবের অর্থ কি ? এবার আমি কৌতূহল প্রকাশ করি।

মেঘনাদ শুধু একটু হাসলো. তারপর ওর সেই হেঁয়ালি ভরা ছড়ায় জবাব দিল ঃ

গোকুল থেকে আসছে বাণ
মরবে দানব বাঁচবে প্রাণ /
এর বেশি যে শুনতে চান—
মগজটাকে শানিয়ে যান।

শুনতে শুনতে আমি মাথা চুলকোতে শুরু করলেও ক্যাপটেন সিং হেসে উঠে বললেন—সাবাস ভাইয়া। জব্বর বলেছেন।

॥ দশ ॥

বাণ নয়—বেলুন

পরদিন সকালেই একটা লোক এসে হাজির হলো পেরিয়ার দ্বীপের লজে। হাতে এক বড়সড় প্যাকেট। লোকটা মেঘনাদের হাতে প্যাকেট দিয়ে দাম আর বকশিস নিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

প্রশ্ন করলাম—এর মধ্যেই কি গোকুল থেকে আমদানি করা 'বাণ' আছে নাকি. কিন্তু প্যাকেটের আকার দেখে তো মনে হচ্ছে আছে বোমা।

মেঘনাদ বললো—বোমাও নয়—বেলুন।

—বেলুন! এবার আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ এ সময় বেলুনের দরকার হলো কেন মেঘনাদের ?

কিন্তু জানতাম এখন আর এসব কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। এক্ষুণি হয়তো নতুন হেঁয়ালির ছড়া শুনিয়ে দেবে। অতএব চুপ মেরেই রইলাম।

বিকেলের দিকে ইন্সপেক্টর নায়ার এলেন।

তারপর লজের অফিস ঘরে মন্ত্রণা বসলো।

আতঙ্ক-দ্বীপের আতঙ্ক মোচনে মেঘনাদের মতলব সম্পর্কে মন্ত্রণা!

কিন্তু মেঘনাদের পরিকল্পনার কথা শুনে আমরা সবাই তাজ্জব হলাম। এ কি সম্ভব! এমনকি ক্যাপটেন সিংও সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন—মেঘনাদ ভাইয়া, এভাবে কি সতিই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আপনার ধারণা ?

মেঘনাদ শুধু বললো-এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

বুঝলাম মেঘনাদ যখন গোঁ ধরেছে—সম্ভব বা অসম্ভব হোক সে কাজ ও করবেই!

॥ এগার ॥

মেঘনাদের পরিকল্পনা

কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে পেরিয়ার দ্বীপের প্রকৃতিতে। দূরে পর্যটন আবাসটা যেন স্বল্প আলোর অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা। আরও

কিছুদূরে পাহাড় আর জঙ্গল অন্ধকার-মাখা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাহাড়ী বৃষ্টি। পায়ের নিচে এখন আর জল দাঁড়িয়ে নেই। সব জল নেমে গেছে পেরিয়া নদীতে।

আশপাশের জলা আর নদীর ধার থেকে একনাগাড়ে শোনা যাচ্ছে অসংখ্য ব্যাঙের ডাক—গ্যাঙর গ্যাঙ...গ্যাঙর গ্যাঙ...

হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠলো নতুন এক গর্জন-গ্যা...ও...র...গ্যা...ঙ...গ্যা...ও...র...গ্যা...ও...ঙ... !

ও কার গর্জন ?

নিশীথ দানবের আবির্ভাব ঘটলো নাকি ! এ কি তারই চিৎকার !

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাছাড়া সে দানব নিঃশব্দে এসে হত্যা করে যায়। তার হুঙ্কার কেউ কখনও শোনেনি।

আসলে এই নিশীথ প্রকৃতিতে পেরিয়ার দ্বীপের বুকে আজ অভিনীত হতে চলেছে এক নতুন নাটক।

এ নাটকের প্রধান নির্দেশক মেঘনাদ ভরদ্বাজ আর প্রধান ভূমিকায় একটা ব্যাঙ।

হ্যাঁ ব্যাঙ। তবে সত্যিকার ব্যাঙ নয়। বিশাল বিচিত্র অন্ততঃপক্ষে বিশ ফুট উঁচু একটা রবারের ব্যাঙ। ব্যাঙ-বেলুনও বলা যায়।

বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

নিশীথ রাতে অজানা দানব নিধনের পরিকল্পনাটা আজই সকালে মেঘনাদ খুলে বলেছে।

সে পরিকল্পনা যেমন আশ্চর্য তেমনি অদ্ভুত !

ইন্সপেক্টর নায়ার এমনকি ক্যাপটেন সিং পর্যন্ত প্রথমে এ পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মেঘনাদ আত্মবিশ্বাসে অটল।

শেষ পর্যন্ত রাজী না হয়ে পারা যায়নি। এর মধ্যে বিশেষ করে ইন্সপেক্টর নায়ার-এর অবস্থাটা হলো সেই জলে ডোবা ব্যক্তির খড়কুটো ধরার মতো। পেরিয়ার দ্বীপের আতঙ্ক বুঝি তাঁর সারা জীবনের পুলিশি সুনামটাকে ভরাডুবি করতে বসেছে।

এরপর পরিকল্পনামাফিক কাজ করার পালা।

প্রথমে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা।

রাত ঘনিয়ে এলো এবং আটটা নাগাদ কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়লো।

তারপরই কাজ শুরু করলো মেঘনাদ।

প্রথমে আজ সকালে বিশেষ অর্ডারে আনা সেই প্যাকেট খুলে সেই বিচিত্র বেলুনটা বার করা হলো এবং পাম্প করে হাওয়া ভরতেই তার আয়তন বাড়তে বাড়তে আকার দাঁড়ালো বিশালাকৃতি এক ব্যাঙের মতো।

এইবার সেটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নদীর ধারে সেই গাছটার নিচে- যেখানে দিনকয়েক আগে বিদেশী ট্যুরিস্ট দুজন অজানা দানবের কবলে পড়েছিল।

এর পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর।

সেই গাছটার নিচে বিরাট বেলুন-ব্যাঙটা বসিয়ে রেখে তার পেছন থেকে চালু করা হলো টেপরেকর্ডারে একটা বিশেষ ক্যাসেট। সেই ক্যাসেট থেকে এ্যামপ্লিফায়ার মারফৎ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ ঃ

গ্যা...ও...ও...র...গ্যা...এ...ঙ...গ্যা...ও...ও...র...গ্যা...এ...এ...ঙ...!

আওয়াজটা ব্যাঙের 'গ্যাঙর-গ্যাঙ' ডাকের সঙ্গে মিললেও বহুগুণ বর্ধিত হয়ে তা এখন ভীষণ গর্জনের মতোই বোধ হচ্ছে।

এই মুহূর্তে এমন ভয়ঙ্কর গর্জন সৃষ্টির কারণ কি মেঘনাদ খুলে বলেনি।

কিন্তু কারণ যাই হোক ইতিমধ্যেই সেই হুঙ্কার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে দিগ্‌দিগন্তে।

এক ভীতিময় পরিবেশ। ভীত-স্তব্ধ হয়ে আশপাশের ব্যাঙগুলির ডাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে মেঘনাদের নির্দেশে আমরা তো বটেই ইন্সপেক্টর নায়ারের পুলিশ ফোর্সের সিপাইরাও সশস্ত্র। আমরা সবাই অপেক্ষা করতে শুরু করেছি নাটকের পরবর্তী দৃশ্যের জন্য।

মেঘনাদের ধারণা তার বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতীক্ষার অবসান হবে।

এক সময় সত্যিই প্রতীক্ষার অবসান হলো।

পেরিয়া নদীর বুকে আলোড়ন উঠলো। জল থেকে উঠে আসছে মূর্তিমান শয়তানের মতো বিশালাকৃতি এক জন্তু-দানব।

রাতের প্রকৃতি শিহরিত।

॥ বারো ॥

তুমুল লড়াই

নদীর ভেতর থেকে উঠে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে জন্তু-দানবটা।

ভরা জ্যোৎস্নার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মতো উঁচু তার দেহটা। চ্যাপটা ধরনের দেহ, মাথা আর ধড় দুই অংশে বিভক্ত। মাঝে মাঝে বিকট হাঁ করছে। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে লকলকে লম্বা জিভ। মাথার ওপর গরুর গাড়ির চাকার মতোই বিশাল দুটি চোখে যেন নরকের আগুন।

কি ধরনের জন্তু ওটা ! পৃথিবীতে এমন জন্তুর খোঁজ আগে কেউ কখনও পেয়েছে ?

থপ্ ... থপ্ ... থপ্ ... লাফিয়ে লাফিয়ে জন্তু-দানব ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

ওর লক্ষ্য গাছের নিচে ওই বেলুন-ব্যাঙটা—যেখান থেকে টেপরেকর্ডার মারফৎ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এক বিচিত্র গর্জন।

আতঙ্কে বায়ুপ্রবাহ পর্যন্ত যেন থেমে গেছে। গাছের পাতা নড়ছে না, দৈত্যের মতো পাহাড়, জঙ্গল আর জড়সড় ট্যুরিস্ট লজটাও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে—কি হয় ! কি হয় !

মেঘনাদের চিৎকার শোনা গেল—ইন্সপেক্টর নায়ার সবাইকে পোজিশান নিতে বলুন, সম্ভব হলে জন্তুটাকে বন্দী করতে হবে।

ইন্সপেক্টর নায়ারের নির্দেশ শোনা গেল—সিপাহীলোক, টেক পজিশান।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর নায়ারের সিপাহী ফোর্স।

আর তারপরই শুরু হলো কাণ্ডটা।

সেই ভয়ঙ্কর জন্তু-দানবটা খুব শীগগির বুঝতে পারলো তাকে ঠকিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়েছে, আর তারপরই সে ভীষণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো সিপাহীদের ওপর।

রাক্ষুসে লকলকে আঠাল জিভে জড়িয়ে নিয়ে মুখে তুলে আছড়ে ফেললো সামনের সিপাহীটিকে। তার ভারী দেহের ঝটকায় আর একজন ছিটকে পড়লো শক্ত পাথরের ওপর। ভেঙে গেল বুঝি হাড়গোড়।

সে এক মরণপণ লড়াই।

সিপাহীরা এবার একযোগে গুলি চালাতে শুরু করেছে। রক্ত ঝরছে দানবটার শরীর থেকে, কিন্তু তবু তাকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না। নতুন উদ্যমে তাড়া করছে আক্রমণকারীদের। এই সঙ্গে এক ধরনের বিষাক্ত তরল ছুঁড়ছে শরীরের গ্রন্থি থেকে। উঃ, কী উৎকট গন্ধ!

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন সিপাহী আহত। মারাও পড়েছে দুজন।

সিপাহীদের মনোবল আর বোধ হয় বজায় রাখা যাবে না। এবার বোধহয় ওরা পালাতে শুরু করবে এই বিভীষিকার কবল থেকে। কারণ শুধু মাত্র বন্দুকের গুলিতে ওকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

ঠিক এমনই মুহূর্তে এক বিস্ফোরণ ঘটলো। পাহাড়ের মতো দেহ নিয়ে সেই দানব হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটির ওপর। বার কয়েক কেঁপে শরীরটা তার স্থির হয়ে গেল। কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার শরীর থেকে। রক্ত ঝরছে গলগল করে।

প্রাক্তন মিলিটারী অধিনায়ক ক্যাপটেন সিং আর কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। বন্দুকের গুলি হজম করলেও গ্রেনেডের মতো বিস্ফোরকের সামনে টিকে থাকতে পারেনি দানব-জন্তুটা।

সত্যিই এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। মেঘনাদও নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছে।

ইতিমধ্যে সারা নদীর তীর আলোকিত করে জ্বলে উঠেছে তীব্র আলো। এ ব্যবস্থাও আগে থেকেই ছিল।

এর পর সবাই মিলে দানবটার কাছে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই মেঘনাদ হেঁকে উঠলো—হুঁশিয়ার। ওর একেবারে কাছে যাবেন না কেউ। ছোঁবেন না ওর শরীর। ও দেহ মারাত্মক তেজস্ক্রিয় !

আমরা সবাই থমকে দাঁড়ালাম।

একটু দূরেই পড়ে রয়েছে সেই প্রায় তিরিশ ফুট আকারের ছোটখাট একটা পাহাড়ের মতো সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত চেহারার দানবটা, সারা শরীর ওর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গ্রেনেডের বিস্ফোরণে উড়ে গেছে একটা থাবা এবং কাঁধের কিছুটা অংশ।

এখন ওটা মৃত। থেমে গেছে সমস্ত হিংস্রতা, শয়তানি !

মেঘনাদ বললো—ব্যবস্থা আমার আগে থেকেই করা আছে। আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই এরনাকুলাম সায়েন্স ইন্সটিট্যুশান থেকে প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি লোকজন নিয়ে আসবেন। ওঁরাই ওটাকে তুলে নিয়ে যাবেন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য।

॥ তেরো ॥

গ্যাঙর গ্যাঙ

মেঘনাদ হেঁয়ালি করলো ঃ

বদ্ধ ঘরের ব্যাঙ
ডাকলো গ্যাঙর গ্যাঙ,
বিজ্ঞানীর 'বাচ্চা শিশু'
গবেষণায় দানব পশু।
পেরিয়ারের আতঙ্ক—
মিললো কিনা অঙ্ক ?

আমি অধৈর্যভাবে বললাম—ওসব ছড়ার মিল-টিল এখন ভাল লাগছে না। আসল রহস্যটা বল, ওটা যে আসলে ব্যাঙ তুই বুঝলি কখন ?

কথা হচ্ছিল পেরিয়ার দ্বীপে ক্যাপটেন সিং-এর পর্যটন আবাসের অফিস ঘরে বসে। মেঘনাদই মূল বক্তা। আমরা শ্রোতা।

ইতিমধ্যে একটা দিন কেটে গেছে।

কথামতো আজ দুপুর নাগাদ জীবতত্ত্ব প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি নিজে এরনাকুলাম সায়েন্স ইন্সটিট্যুশানের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে এসেছিলেন। নদীর ধারে তখনও পড়েছিল গতরাতে যুদ্ধে নিহত সেই ভয়ঙ্কর জন্তু-দানব। মেঘনাদের পরামর্শ মতোই সেই তেজস্ক্রিয় পাহাড় প্রমাণ দেহটি অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায়

রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সে দেহে দ্রুত পচন ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে সামনে এগোয় কার সাধ্য ! প্রহরী দুজনের মধ্যে একজন তো গন্ধের ঠ্যালায় অসুস্থই হয়ে পড়েছে। অন্যজনের অবস্থাও ভাল নয়।

প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি বিশেষ কৌশলে সেটি তুলে নিয়ে গেলেন। উনি এটির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চান।

সন্ধ্যের পর আমরা সবাই লজের বাংলোর মুখোমুখি বসেছি এই আশ্চর্য রহস্যের মূল উৎসটা জানার অভিপ্রায়ে।

মেঘনাদ বললো—সব ব্যাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই খুলে বলি।

মেঘনাদ শুরু করলো ঃ

—আমার প্রথম সন্দেহ হয় যখন অজানা দানবের পায়ের ছাপ দেখি। হাতির চেয়েও বড় কিন্তু হাতির মতো পা নয়। উঠে আসে নদীর ভেতর থেকে, প্রতিবার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ফিরেও যায় নদীতে। এ কোন জাতের উভচর প্রাণী হতে পারে। পায়ের ছাপ নিয়ে অনেক দিক থেকে পর্যবেক্ষণ চালালাম-অবশেষে মিল পেলাম ব্যাঙের পায়ের পাতার সঙ্গে।

এই সূত্র ধরে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করলাম। দেখলাম, বৃষ্টি হওয়া এবং ব্যাঙেদের ডাকের সঙ্গেও কোথায় একটা যোগ আছে। জঙ্গল পাহাড়ের সেই রহস্যময় বিজ্ঞানীর হেঁয়ালি ভরা কথাবার্তার মধ্যেও পেলাম সূত্রের সন্ধান। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই সেই দানবের হাতে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু তাঁর পোড়ো বাংলোর ভাঙা জিনিসপত্রের মধ্যে পেলাম তাঁর ডায়েরির গোটাকয়েক পোড়া পৃষ্ঠা।

—কি ছিল সেই পৃষ্ঠায় ? ক্যাপটেন সিং কথার মধ্যেই প্রশ্ন করলেন।

—আমার পক্ষে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। জীববিজ্ঞানী প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির হাতে সেগুলো আমি তুলে দিয়েছি। সম্ভবতঃ তাতে গবেষণা সংক্রান্ত কিছু নোটস ছিল, যদিও আগুনে পুড়ে তা এখন আর বোঝার অবস্থায় নেই। কিন্তু আব কিছু না বুঝি, ওই ডায়েরির পাতায চোখে পড়েছিল কুনো ব্যাঙে. কয়েকটা নানা ধরনের ডায়াগ্রাম। আঁকার গুরুত্ব দেখে মনে হয়েছে ওই উভচর জীবটির ওপর বিশেষ কোনো পরীক্ষা চালান হচ্ছিল। ডায়েরিটা প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তিব হাতে তুলে দেবার সময় আমার অনুমানের কথাটাও ওঁকে জানালাম। আর তারপরই আমি আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হই।

মেঘনাদের কথার মধ্যে আবার বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না, একটা ছ'ইঞ্চি আকারের কুনো ব্যাঙ কোন আশ্চর্য জাদুতে তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের দানবে পরিণত হলো ? তুই কি মনে করিস মেঘনাদ যে ওকে দানব বানিয়ে সেই পাগলা বিজ্ঞানী কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল ?

মেঘনাদ বললো—তোর দ্বিতীয় প্রশ্নেব উত্তর আমার সঠিক জানা নেই। তবে বিজ্ঞানী তো জাদুকর নয়। সেই বিজ্ঞানী ব্যাঙটার ওপর নিশ্চয়ই পরীক্ষা-

নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। হয়তো তার দানব আকৃতি আর প্রকৃতির মূলে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া।

—তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া !

—আমার তাই বিশ্বাস। মেঘনাদ সোফায় হেলান দিয়ে বললো—যে কোনো বিজ্ঞান-গবেষণাতেই ব্যাঙের ওপর পরীক্ষা চালাতে পছন্দ করেন বিজ্ঞানীরা। তোরা তো জানিস শরীরবৃত্তিয় কারণে মানুষেব সঙ্গে ব্যাঙের প্রচুর মিল। আর এই ব্যাঙ হলো উভচর শ্রেণীর অন্তর্গত সেলিয়েনসিয়া বা অ্যানিউরা বর্গের প্রাণী। এরা জীবনের কিছু অংশ জলে এবং কিছু অংশ ডাঙায় কাটায়।

মেঘনাদ বলে চলে—আমার ধাবণা, মানুষ বা জন্তুর দেহের ওপর বিশেষ কোনো তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব জানার জন্যেই ব্যাঙটার ওপর সেই জংলা পাহাড়ের বিজ্ঞানী গবেষণা চালাতে শুরু করেন, যার পবিণতি হযতো তাঁরও জানা ছিল না। পরিণতি হলো দুর্ভাগ্যজনক। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে ব্যাঙটার দেহকোষের বিরাট পবিবর্তন হলো। আকার হয়ে গেল বিশাল এবং প্রকৃতি হিংস্র। রাক্ষুসে প্রতিহিংসায় তার স্রষ্টা বিজ্ঞানীকেও জীবন দিতে হলো...

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললাম না। সবটাই কেমন অদ্ভুত! বিস্ময়কর! কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু বিস্ময়ের হদিস আমরা আজ পর্যন্ত কবতে পেবেছি।

হঠাৎ ক্যাপটেন সিং নীববতা ভেঙে মাথা নাড়লেন—রেডিও এ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তাব প্রভাব মানুষের দেহে যে কী ভয়ানক হতে পারে তার নিদর্শন তো আমবা গত মহাযুদ্ধে হিবোসিমাতেই দেখেছি। এ্যাটম বোমাব আঘাতে সেদিন যে তেজস্ক্রিয়তা ছাড়য়ে পড়েছিল তাতে মবেছে হাজারে হাজারে, আর যারা বেঁচেছে, দেহ হয়েছে কুৎসিত, বিকৃত, বেঢপ। এখন তো শুনতে পাই এ্যাটম বোমার চেয়েও হাজার গুণ শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে মানুষ, তাব প্রতিক্রিযায় আরও কত কি না হতে পাবে—ব্যাঙের দানব হওয়া তো কোন ছার!

ইন্সপেক্টর নায়ার আর ধৈর্য রাখতে পারছিলেন না, বললেন—কিন্তু তাকে মারবার জন্যে অত নাটক কেন করা হলো তো বুঝলাম না।

প্রশ্নটা আমাদেব সকলের মনেই উঁকি দিচ্ছিল।

মেঘনাদ এ প্রশ্নের সহসা কোনো উত্তর দিল না। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানলাটার কাছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। আজ ওখানে নির্মল প্রকৃতি। আতঙ্কের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নদীর ধাবে আবার নিশ্চিন্তে বেড়াতে বেরিয়েছে ভ্রমণপিপাসুব দল। একটা স্টীম বোটে চেপে আসছে তিনজন বিদেশী পর্যটক দিনকয়েকের জন্য এই দ্বীপের অতিথি হতে।

মেঘনাদ এবাব ঘুবে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো ঃ

সেই ভয়ঙ্কর নিশীথ দানবের প্রকৃতি আর চরিত্রটা সম্পর্কে যে মুহূর্তে নিশ্চিত হলাম সেই মুহূর্তেই তাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনাটাও মাথায় খেলে গেল। এমন ফাঁদ না পাতলে সে হয়তো এত সহজে ধরা দিত না।

আমি বললাম—তার কোন প্রকৃতির কথা বলছিস মেঘনাদ ?

মেঘনাদ বললো—আকারে দানব হলেও ব্যাঙের আদিম প্রকৃতি তার নষ্ট হয়নি। ব্যাঙের স্বভাবই হলো সন্ধ্যের পর শিকার ধরতে বেরুন। এক্ষেত্রে তার আকার এবং আয়তন অনুপাতে শক্তির পরিমাণও আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বর্ষাকালে ব্যাঙের আর একটা প্রকৃতিগত অভ্যাস আছে—তা হলো, বৃষ্টির পর খাল বিলে গ্যাঙর গ্যাঙ শব্দে পুরুষ ব্যাঙ ডাকে। আর সে কারণেই প্রতি বর্ষার শেষে সেই দানব ব্যাঙটা বুঝতে পারত যে সে একান্তই নিঃসঙ্গ, আর তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে একের পর এক ধ্বংসকার্য চালাত এবং একই কারণে সে তার স্রষ্টা জংলা পাহাড়ের বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে রেহাই দেয়নি।

আবার খানিক স্তব্ধতা। এবার স্তব্ধতা ভেঙে আমি বললাম—বিশাল বেলুন-ব্যাঙ বানিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার প্ল্যানটা না হয় বুঝলাম কিন্তু টেপরেকর্ডার থেকে এ্যামপ্লিফায়ার মারফৎ ওই ভয়ঙ্কর ব্যাঙের ডাক—ওটাও কি একই কারণে বাজান হয়েছে ?

—ঠিক বলেছিস, মেঘনাদ আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো—ওটা না বাজালে হয়তো সে অত তাড়াতাড়ি নদীর ভেতর থেকে উঠে আসতো না।

মেঘনাদ চুপ করলো।

এইবার উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর নায়ার। মেঘনাদের কাছে এগিয়ে এসে গভীর আন্তরিকতায় ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললেন—অপূর্ব আপনার বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা মিঃ ভরদ্বাজ। সেদিন এত সব বুঝিনি বলেই আপনার পরিকল্পনাকে আজগুবি বলেছিলাম। এ জন্যে ক্ষমা করবেন।

মেঘনাদ কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই রাজু এসে ঘরে ঢুকলো। ওর হাতে ট্রে ভর্তি খাবার আর কফি।

আমার কানে তখনও বাজছে মেঘনাদের সেই ছড়াটা ঃ

“বদ্ধ ঘরের ব্যাঙ
ডাকলো গ্যাঙর গ্যাঙ,
বিজ্ঞানীর ‘বাচ্চা শিশু’
গবেষণায় দানব পশু।
পেরিয়ারের আতঙ্ক !
মিললো কিনা অঙ্ক ?”

হ্যাঁ, অঙ্ক মিলে গেছে !!

ভ্রাতৃপ্রতিম

শ্রীচঞ্চল চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য
দ্বিতীয় বিশ্বের অভিযাত্রী
চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা
রহস্যভেদী মেঘনাদ
তিব্বতী গুম্ফার রহস্য
বিভীষিকা দ্বীপে স্যার সত্যপ্রকাশ
কিশোর কল্পবিজ্ঞান
লুসাই পাহাড়ের ভয়ঙ্কর
সাহেব বাংলোর ভূত
ড: জীমূত বাহনের বিচিত্র জগৎ
সেদিন মহেঞ্জোদাড়ো
দানব পাহাড়ের হাতছানি
তুষার মানবের দেশে
ডাইনোসরের হারানো জগৎ
নিজেই করো গোয়েন্দাগিরি
সেরা অ্যাডভেঞ্চার
স্পাইরা পাশেই আছে
আতঙ্কের দ্বীপ
আবার ড্রাগন পাহাড়ে
পুরাণের চির নতুন গল্প

রহস্যভেদী মেঘনাদের গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার

আবার ড্রাগন পাহাড়ে

এই খণ্ডে যা আছে

আবার ড্রাগন পাহাড়ে
জল ছবির রহস্য
বাঘের থাবা
মেঘের আড়ালে মেঘনাদ

আবার ড্রাগন পাহাড়ে

এক

নিরুদ্দিষ্ট ভাইয়ের সন্ধানে

ঘরে ঢুকতেই মেঘনাদ বললো,—আয় অর্ণব, বোস। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মেজর গৌরীশঙ্কর বসু। গতকাল এর কথাই তোকে বলছিলাম।

তাকিয়ে দেখি সামনের সোফায় এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স প্রায় চল্লিশ। মাথায় টাক। স্বাস্থ্যটা ভালো।

নমস্কার-প্রতিনমস্কার এবং পরিচয়-পর্ব শেষ হলে আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম,—সামরিক বিভাগ থেকে আপনি কবে অবসর নিয়েছেন?

—বছর তিনেক হবে। এখন একটা বেসরকারী কোম্পানীতে সেলস্ ম্যানেজার হিসেবে রয়েছি।

দেখলাম মেজর বসুর স্বাস্থ্যটাই শুধু সুঠাম নয়, ওঁর কথাবার্তাও বেশ স্পষ্ট এবং কণ্ঠস্বর ভরাট।

মেঘনাদ গতকালই মেজর গৌরীশঙ্কর বসুর কথা আমায় বলেছে। উনি একটা সমস্যায় পড়েছেন। বরং সেই সমস্যার কথাটাই আগে বলে নিই।

গৌরীশঙ্কর বাবুরা দুই ভাই—গৌরীশঙ্কর এবং রামশঙ্কর। ওঁরা উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের মানুষ। পৈত্রিক সূত্রে বিষয়সম্পত্তি নেহাত কম নেই। বাবা মারা যাবার পর সে সবই দুই ভাই যৌথ অধিকারে পেয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হলো রামশঙ্করকে নিয়ে। গৌরীশঙ্কর বাবুর চেয়ে সে বছর দশেকের ছোট। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার মতিগতি আলাদা রকম। মানে সংসার-উদাসী স্বভাবের আধ্যাত্মিক ভাবনায় জড়িত। স্কুলে কলেজে ভাল ছাত্র ছিল রামশঙ্কর। এম.এস্.সি.-তে ভালো রেজাল্টও করেছিল। কিন্তু তার পর থেকে তাকে খুব একটা বাড়িতে পাওয়া যেত না। মাঝে মধ্যেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। কখনও রাজগীর, ভেট দ্বারকা, হরিদ্বার কিংবা কন্যাকুমারী। মেজর গৌরীশঙ্কর বসু সে সময়ে বেশীর ভাগই মিলিটারী ফ্রণ্টে কাটাতেন। অতএব তখন বাড়িতে মেজর বসুর স্ত্রী আর একটা ছেলেকে একাই থাকতে হতো। তবে বৌদি আর ভাইপোকে একা ফেলে খুব বেশীদিন একসঙ্গে বাইরে কাটাতো না রামশঙ্কর। এ ব্যাপারে তার বিচারবোধ ভালই ছিল। তারপর বছর তিনেক আগে মিলিটারী চাকরীর মেয়াদ শেষ করে মেজর গৌরীশঙ্কর বসু ঘরে ফেরার কদিন পরই রামশঙ্কর সেই যে বাড়ি ছাড়লো আর ফিরলো না। কোথায় গেছে তাও বলে যায় নি। সংসারে তার বন্ধু-বান্ধব বলতেও বেশী কেউ নেই। সুতরাং এ অবস্থায় তাকে খুঁজতে যাওয়াও বৃথা।

তার পর মাস দুয়েক আগে রামশঙ্করের একটা চিঠি পেলেন দাদা গৌরীশঙ্কর বসু। চিঠিটা অদ্ভুত। তাতে এইরকম লেখা ঃ

"শ্রীচরণকমলেষু

দাদা, শেষ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম সংসারে আর আমি ফিরবো না। চার দেয়ালের বাইরে খোলা আকাশের নীচে যে মুক্তির সন্ধান আমি পেয়েছি তার আনন্দে ঘরের বাঁধন আমার ছিঁড়ে গেছে। তোমাদের স্নেহ ভালবাসায় জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। আমার স্নেহ ভালবাসায় জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। আর ফিরে ডেকো না। আমার খোঁজ কোরো না। তুমি আর বৌদি আমায় আশীর্বাদ কোরো। টুকাইকে আমায় বুক ভরা স্নেহাশীষ দিলাম। বিদায়। ইতি—

তোমার স্নেহধন্য
রামশঙ্কর

পুনঃ — এই সঙ্গে একটা দানপত্র দলিল পাঠালাম। উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তির যে অংশে আমার অধিকার ছিল, তা পুরোপুরি তোমার নামেই রেজেস্ট্রি করে দিলাম। আজ থেকে সংসারের শেষ বন্ধনও ছিন্ন হলো।"

এই চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই গৌরীশঙ্করবাবু ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। ভাইকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। বলতে কি ছেলেবেলায় বাবা মা দুজনেই খুব অল্পদিনের মাথায় মারা যাবার পর থেকে উনিই ছোট ভাইটিকে প্রায় কোলে পিঠে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। দুই ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান তো খুব কম নয়—প্রায় দশ বছর। সেই রামশঙ্কর সংসার ছেড়ে সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, এটা কিছুতেই গৌরীশঙ্করবাবু মেনে নিতে পারছেন না।

আর সে কারণেই উনি আমাদের কাছে এসেছেন নিরুদ্দিষ্ট ভাইকে খুঁজে বার ক'রে সংসারে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা পাবার উদ্দেশ্যে।

গৌরীশঙ্করবাবু বলছিলেন,—এবার রামকে ফিরিয়ে এনে এক মাসের মধ্যে একটা ভাল মেয়ে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দেবো তারপর দেখবো সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে কি ভাবে ও পালাতে পারে।

—তা না হয় করবেন, কিন্তু রামশঙ্করকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ভেবেছেন? মেজর গৌরীশঙ্কর বসুর কথার মধ্যেই এবার আমি বললাম।

—সমস্যা তো সেটাই...গৌরীশঙ্করবাবু আমতা আমতা করলেন,—রাম তার চিঠিতে কোনো ঠিকানার কথাই লেখে নি।

—তবে একটা হদিশ বোধহয় পেতে পারি, মেঘনাদ গৌরীশঙ্করবাবুর কথার মধ্যে হঠাৎ রামশঙ্করের চিঠির খামটা এগিয়ে দিয়ে বললো,—দেখুন তো, এই খামের ওপর কোন্ পোস্ট-অফিসের ছাপ রয়েছে?

গৌরীশঙ্করবাবু খামটা হাতে নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও পোস্ট-অফিসের অস্পষ্ট দাগের মধ্যে নামটা পড়তে পারলেন না। আমিও ব্যর্থ হলাম। তখন মেঘনাদ ওর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার হাতে দিয়ে বললো,—এবার দ্যাখ্।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে ছাপটা রেখেও বেশ কষ্ট করে পড়লাম—'নারকান্দা'।

—নারকান্দা! এ কোন্ জায়গা? আমি মেঘনাদের দিকে তাকালাম,—এমন জায়গার নাম কি আগে শুনেছি?

—গত পরশু মেজর বসুর কাছ থেকে চিঠির খামটা নিয়ে পোষ্টাল স্ট্যাম্পের ওপর এই নামটা দেখে তোর মতো আমার মনেও কথাটা এসেছিল। তারপর একটু চিন্তা করতেই মনে পড়লো, এ জায়গা আমাদের চেনা।

—চেনা জায়গা?

—হ্যাঁ। প্রায় এক যুগ আগে তুই আমি দুজনেই গেছি ওখানে। ভেবে দেখ অর্ণব!—মেঘনাদের দুচোখে গভীর রহস্যময় দৃষ্টি।

—কী বলছিস মেঘনাদ! আমরা দুজনেই গেছি সেই জায়গায়? নারকান্দায়?

—হ্যাঁ, আজ তেকে প্রায় এক যুগ আগে। ভারতের উত্তরের হিবালয় অঞ্চলে গিয়েছিলাম.....

—'ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য' সন্ধানে, —মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগেই আমি লাফিয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা হয়ে সুদূর তিব্বত সীমান্তে শিনকি উপত্যকায় যাবার পথে ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম নারকান্দা। সেখানে জীপ থামিয়ে কিছু সময় আমরা বিশ্রাম করেছিলাম।

আমাদের সামনের সোফায় বসে মেজর গৌরীশঙ্কর বসু এতক্ষণ চোখ বড় বড় করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন, এবার আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললেন, —তাহলে কি আপনাদের ধারণা রাম বর্তমানে ওখানেই আছে?

—আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমার একটা কাজ করা দরকার। তা হলো, ভারতীয় ট্যুরিস্ট ব্যুরোর অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা প্রয়োজন যে নারকান্দা নামে আর অন্য কোন জায়গার অবস্থান ভারতে আছে কিনা,—বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ বললো,—গৌরীশঙ্করবাবু, আপনি বরং আগামীকাল সকাল ঠিক আটটার সময় আমায় ফোন করবেন।

দুই
অতীত অভিযানের স্মৃতি

কোন কাজেই মেঘনাদের আলসেমি নেই। এটাই ওর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ।

একটা দিনের মধ্যেই ও নারকান্দা সম্পর্কে সব সন্দেহ মোচন করে ফেললো। সারা ভারতবর্ষে এক নামে অনেক জায়গা থাকলেও দ্বিতীয় নারকান্দার খোঁজ মেলে নি।

আগেই বলেছি, এ জায়গা আমাদের পূর্ব-পরিচিত। প্রায় বারো বছর আগে ওই পথ ধরেই আমরা আরও উত্তরে অভিযান করেছিলাম ভয়াবহ ড্রাগন

পাহাড়ের রহস্য উদ্ধারে। রোমাঞ্চকর সে অভিযানের স্মৃতি আজও জমে আছে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে। সে এক রীতিমত রোমহর্ষক কাহিনী। *

মেঘনাদ তখন সবেমাত্র সামরিক বিভাগের চাকরি ছেড়ে পেশায় সাংবাদিক এবং নেশায় রহস্যভেদী হয়েছে।

সে সময়ই একদিন মেঘনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ওর পুরনো সহকর্মী ক্যাপটেন সিং। তিনি তখন তিব্বত সীমান্তের এক জায়গায় একটি টহলদারী বাহিনীর অধিনায়ক। সেখানে এক অদ্ভুত রহস্যের মুখোমুখি হয়েছেন উনি। সেখানকার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা নাকি ড্রাগন দেবতার পুজো করে। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে তারা সুস্থ সবল এক আদিবাসী যুবককে নিবেদন করে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশে। তাদের সেই জীবন্ত মানুষ-নৈবেদ্যকে ড্রাগন দেবতার বাহন নিজে এসে প্রতিবছর নিয়ে যায় ড্রাগন পাহাড়ের ওপারে।

এই আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের রহস্যাভেদ করতে আমি আর মেঘনাদ সেদিন গিয়েছিলাম শিনকি উপত্যকায় ড্রাগন পাহাড়ের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে একের পর এক মুখোমুখি হয়েছিলাম অবিশ্বাস্য সব রহস্যের।

এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা নিজের চোখে দেখেছিলাম প্রায় ছ'কোটি চল্লিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জুরাশিক যুগের ড্রাগন রূপী এক বিলুপ্ত সরীসৃপকে। সেই ভয়ঙ্কর সরীসৃপের দাপাদাপি আর আদিবাসী গোষ্ঠীর আশ্চর্য নৈবেদ্য-নিবেদন—সব কিছুর মূলে ছিল এক বাঙালী বিজ্ঞানীর অদ্ভুত গবেষণা—সেই বিজ্ঞানীর নাম ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী।

এ সব রহস্য সেদিন আমরা ভেদ করেছিলাম ড্রাগন পাহাড়ের গভীর গহনে গিয়ে। পদে পদে মৃত্যু ওৎ পেতে ছিল। তবু আমরা ভয় পাইনি। অবশ্য সকল কর্মকাণ্ডের মূল নায়ক সেই অরবিন্দ রায়চৌধুরীকে সেদিন গ্রেফতার করা যায় নি। তাঁর সেই গোপন ল্যাবরেটরী থেকে শেষ মুহূর্তে তিনি যেন উবে গিয়েছিলেন।

নারকান্দার কথা উঠতেই সেদিনের সেই সব ছবিগুলি একের পর এক মনের মধ্যে ভীড় করে আসছিল। মনে পড়ছিল সেই আশ্চর্য আদিবাসী গোষ্ঠীর ওঝাব ছদ্মবেশে ডঃ অরবিন্দ রায়াচৌধুরীর অ্যাসিসটেন্ট মিতালীর কথা, যাকে গাঁয়ের আদিবাসীরা 'দেবরানী' বলে ডাকতো। আদিবাসী সর্দার থিং ডনের একমাত্র ছেলে তাজু—যাকে বাঁচাতে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মেঘনাদ নিজে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে ড্রাগন বেদীতে নিজেকে নিবেদিত করেছিল। আরও মনে পড়ছিল ডঃ অরবিন্দ রায় চৌধুরীর সেই অসামান্য গবেষণার কথা। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। গবেষণার স্বার্থে এই বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্টি করেছিলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক অতিকায় সরীসৃপ।

---

* লেখকের ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য উপন্যাস

—ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রি...!

টেলিফোনের শব্দে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো।

রিসিভার তুললাম,—হ্যালো। অর্ণব সেন স্পিকিং।

ও তরফ থেকে মেঘনাদের কণ্ঠস্বর ঃ

—অর্ণব, আমি মেঘনাদ বলছি। আগামীকালই ট্রেনের টিকিট কেটেছি। এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিবি। হাওড়া থেকে দিল্লী-কালকা মেল ছাড়ছে রাত সাতটায়। ঠিক সময়ে চলে আসিস।

—আগামী কালই! আমি আমতা আমতা করলাম, সঙ্গে আর কে কে যাচ্ছে?

—তুই, আমি আর গৌরীশঙ্করবাবু। ব্যাস। দেরী করিস নি কিন্তু। —বলেই মেঘনাদ ফোনটা রেখে দিলো।

আমার তো হতবুদ্ধি অবস্থা। এর আগের বারও আমরা দিল্লী-কালকা মেলেই যাত্রা শুরু করেছিলাম। আবার সেই পথে!

অজানা আশঙ্কায় মনটা একবার দুলে উঠলো।

তিন

আগুনের ধোঁয়া

হাওড়া থেকে দিল্লী-কালকা মেলে কালকা, তারপর ন্যারো গেজ লাইনে সিমলা।

আজই দুপুরে আমরা সিমলা পৌঁছেছি। এসে উঠেছি এখানকার বিখ্যাত কালীবাড়িতে। আমরা বলতে মেঘনাদ, গৌরীশঙ্করবাবু আর আমি।

বাঙালীর স্বভাব হলো প্রবাসে গেলেই প্রথমেই একটা কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করে, তারপরই নাটকের ক্লাব গড়ে তোলে।

তবে সিমলা কালীবাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর। বাসস্ট্যাণ্ডের ওপর, ম্যাল-লাগোয়া ভারী মনোরম অবস্থান। এখানকার মন্দিরে শ্যামলাদেবীর পূজো হয়। আর এই শ্যামলাদেবীর নামেই জায়গার নাম সিমলা। আর কালীবাড়ির ভেতরে নিয়মিত যে কালীপূজো হয়, তা নিয়ে আসা হয়েছে জয়পুর থেকে।

যাই হোক, সিমলা পৌঁছেই আমরা সোজা কালীবাড়িতে এসে উঠেছি। এখানকার ম্যানেজার ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। সাধারণত কাউকেই উনি ফেরান না। আমাদেরও জায়গা জুটে গেছে।

প্রায় দুদিন ট্রেনের ধকল গেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে বসে আমি আর গৌরীশঙ্করবাবু এটা ওটা নিয়ে কথা বলছি। মেঘনাদ অবশ্য ঘরে নেই। খাওয়া দাওয়া সেরে নিরুদ্দিষ্ট রামশঙ্করের পোস্টকার্ড সাইজের ফটোটা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছে। ওর ধারণা এখানে তার খোঁজ পেলেও পাওয়া যেতে পারে। একটা দিনও নষ্ট করা ঠিক হবে না। গৌরীশঙ্করবাবু সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। মেঘনাদ রাজি হয় নি।

ইতিমধ্যে দেখতে দেখতে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। দিনের আলো কমে আসছে। মেঘনাদ এখনও ফিরলো না। এই অজানা অচেনা জায়গায় একজন নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে কোথায় ও খুঁজে বেড়াচ্ছে! সবেমাত্র এই কথাটা নিয়েই আলোচনা শুরু করেছি—হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ।

তাকিয়ে দেখি হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকছে বন্ধুবর। ওর হাতে একটা ঠোঙায় এক গুচ্ছ আঙুর।

মেঘনাদ ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারটায় বসে আঙুরের ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বললো,—নে সিমলার টাটকা মিষ্টি আঙুর খা। গৌরীশঙ্করবাবু আপনিও নিন।

বললাম,—রামশঙ্কর বসুর সন্ধান পেয়েছিস?

মেঘনাদ হেঁয়ালি করে বললো,—আগুন না পেলেও তার ধোঁয়া দেখেছি। তা-ও এই কালীবাড়িতেই।

—তার মানে?

—মানে?—মেঘনাদ আঙুরের গুচ্ছ থেকে একটা ছিঁড়ে মুখে পুরে বললো,—সারা সিমলা শহরটা খোঁজার পর রামশঙ্করের হদিশ পাওয়া গেল এই সিমলা কালীবাড়ির ভিজিটার্স রেজিষ্টারের পাতায়।

—হদিশ পেয়েছেন? গৌরীশঙ্করবাবু উত্তেজনায় টান হয়ে বললেন।

—হ্যাঁ, তিনমাস আগে, এই কালীবাড়িতে এসে উঠেছিল রামশঙ্কর বসু।

—ওর চিঠি আর দানপত্র দলিলের কথা ভাবলে হিসেবেও তাই দাঁড়াচ্ছে মেঘনাদবাবু,—গৌরীশঙ্করবাবু এবার কিছুটা উত্তেজিত ভাবেই বলেন,—কিন্তু এরপর সে গেল কোথায় তার কোন হদিশ পেলেন?

—হ্যাঁ, এখানকার ভিজিটার্স রেজিস্টারে তাও লেখা আছে। তার পরবর্তী গন্তব্য ছিল নারকান্দা।

—নারকান্দা!

—হ্যাঁ, সেখানে তার ঠিকানা, 'ভগতলাল যোশী, নারকান্দা।'

চার

মানুষ নয় দেবতা

নারকান্দায় পৌঁছে ভগতলাল যোশীর খোঁজ পেতে খুব বেশী অসুবিধে হলো না।

অসুবিধে না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সিমলা ছাড়িয়ে হিন্দুস্থান-টিবেট রোড ধরে প্রায় ৬৪ মাইল পার হয়ে নারকান্দা নামক যে জায়গাটায় আমরা এসে পৌঁছলাম সেটি একটি শৈলী গ্রাম বলা চলে। লোকজন বিশেষ নেই, মোটামুটি পর্যটন-কেন্দ্র হিসাবেই পরিচিত। সে কারণে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং জীপ থেকে নেমে ভগতলাল যোশীর খোঁজ করতেই তার সন্ধান পাওয়া গেল।

ভগতলাল যোশী বছর পঞ্চাশ বয়সের এক দোহারা চেহারার মানুষ। অসম্ভব সরল আর অতিথি-বৎসল। নারকান্দায় ওঁর একটা ছোটখাট ট্যুরিষ্ট-লজ আছে। তাতে গোটা পাঁচেক ঘরের মধ্যে দুটি ঘর নিয়ে নিজেই থাকেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে উনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে লজ-এর একটি ঘর খুলে দিলেন। তারপর নিজেই ছোটাছুটি করে আমাদের জলখাবার আর যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলেন। এ কাজে তাঁর সঙ্গী একটি ছেলে আর মেয়ে। দুজনেই কিছুটা বোকাসোকা গোছের।

সেদিন দুপুর নাগাদ পৌঁছেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে আশপাশটা একটু বেরিয়ে এলাম। এখানকার মূল আকর্ষণ হাঁটু পীক। ৩৩০০ মিটার উঁচু এই পাহাড়ের চূড়া থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অতি মনোরম। অবশ্য এতটা সময় আমাদের হাতে ছিল না। তবু দেখেছি এখানকার পথ-ঘাটের মধ্যেই মনোরম শান্ত শোভা ছড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যাবেলা আমরা তিনজন গিয়ে বসলাম ভগতলালজীর কাছে। মেঘনাদই কথা বলছিল। আমরা দুজন মুলত শ্রোতা।

এটা ওটা কথার ফাঁকে মেঘনাদ রামশঙ্কর বসুর প্রসঙ্গ তুললো। মাস তিনেক আগে তার নারকান্দায় আসার কথা।

এক কথাতেই রামশঙ্করকে চিনতে পারলেন ভগতলালজী। উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন,—আরে, আপনারা ভোলারামবাবুর বাত বলছেন! বহুত ভাল আদমী।

—ভোলারাম! গৌরীশঙ্করবাবু অবাক হয়ে বললেন,—ও নাম তো তার নয়।

—হাঃ হাঃ.....ভগতলালজী হেসে উঠে বললেন,—হামিই ওর ভোলারাম নাম দিয়েছি বাবুমশাই। আপনার ভাই আছে না? আদমী যেমন ভোলাভালা, তেমনি সাধুপুরুষ। উনি তো আগেও হামার কাছে কয়েক দফা এসেছিলেন। নারকান্দায় এলেই ইখানে এসে উঠেন.....

—সে এখানে কী জন্য আসতো জানেন?—এবার মেঘনাদ কথার মধ্যেই কথা বললো।

—আরে বাবুমশাই, ইখানে যারা আসে সবাই কি কুছু কারণ নিয়ে আসে? তারা আসে হিমালয়ের টানে। বাবা মহাদেব তাদের ডেকে নিয়ে আসে বাবুজী।

তা রামশঙ্কর এমন মানুষই ছিল বটে। গৌরীশঙ্করবাবু তাঁর ভাই সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে রামশঙ্করকে এমন আপনভোলা স্বভাবের বলেই মনে হয়।

—আচ্ছা, শেষবার, মানে মাস তিনেক আগে রামশঙ্কর এখান থেকে কোথায় গেছে কিছু বলে গেছে?—মেঘনাদ হঠাৎ দুম করে অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা করে বসলো।

—কোথায় গেছেন তা বলতে পারবো না বাবুমশাই, তবে ভোলারামবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, ভগতলালজী এবার খুব গদগদ ভাবে বলেন,—ডাক্তারবাবুর সব বাত শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। উনি সাধু নন, মানুষ ভি নন। উনি নিজেই এক দেবতা।

—দেবতা!

—হাঁ জী। রক্তমাংসের দেবতা।

সেদিন বাইরের সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ভগতলালের লজের ঘরে হ্যারিকেনের স্বল্প আলোর মধ্যে বসে শুনলাম এক আশ্চর্য ডাক্তারের কাহিনী।

ডাক্তারবাবু নাকি স্থানীয় কেউ নন। তিনি একজন বাঙালী। বয়সের গাছ পাথর নেই। বয়স ষাট থেকে নব্বই যে কোন সংখ্যা হতে পারে। কিন্তু এখনও যথেষ্ঠ কর্মঠ। তিনি যে কোথায় থাকেন ভগতলালজী সঠিক জানেন না। তবে শুনেছেন, উত্তর কিন্নরের কোথাও তাঁর বাসস্থান আছে। সেখানে তিনি কেন থাকেন, কী করেন, তাও বলতে পারলেন না ভগতলালজী। তবে বোঝা গেল, ভগতলাল যোশী তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। বছবের কোন কোন সময়ে ডাক্তারবাবু যখন এখানে আসেন, ভগতলালজীর প্রাইভেট লজে তাঁর জন্যে অবারিত-দ্বার থাকে।

তখন শুধু ভগতলালজীই নন, সারা নারকান্দা শৈলীগ্রামের যে যেখানে আছে এসে হাজির হয় তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবুর কাছে। যে রোগের চিকিৎসা কেউ জানে না, তা তিনি করেন। তাই এ এলাকার এবং আশপাশের মানুষ সারা বছর ধরে তাঁর প্রতীক্ষা করে। কিন্তু তিনি কখন যে আসবেন তার স্থির নেই। উনি হঠাৎ আসেন। হঠাৎ চলে যান। ভগতলাল যোশীই তো গতবছর বিশেষ উপকৃত হয়েছেন নিজের একমাত্র ছেলেটার রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে।

ভগতলালের ছেলে উনিশবছর বয়সেও ছিল জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। ভগতলাল তার সাধ্যমতো অনেক ডাক্তার জড়ি-বুটি করেও ছেলের অবস্থা ভাল করতে পারেন নি। মন খুবই খারাপ। এ রকম অবস্থায় বছর দুয়েক আগে ভগতলালজীর সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হলো ডাক্তারবাবুর। তিনি ছেলেটিকে দেখে তার চিকিৎসা শুরু করলেন। মাত্র কয়েকদিনের চিকিৎসাতেই উপকার মিললো, তারপর থেকে তাঁর দেওয়া ওষুধ এই দুবছর নিয়মিত খেয়ে ভগতলালজীর ছেলে এখন প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এখন সে বাবার কাজে নিয়মিত সহযোগিতা করে—তা আমরা নিজেরাই দেখেছি।

ছেলের রোগ নিরাময়ের এ কাহিনী শোনাতে শোনাতে আবার কৃতজ্ঞতায় উথলে উঠলো ভগতলালজীর কণ্ঠস্বর,—তাই বলছিলাম বাবুমশাইরা, উনি মানুষ নন, দেবতা। আর সে কারণেই তো ভোলারাম তার ভক্ত সঙ্গী হয়েছে।

—কিন্তু আপনার ভোলারামকে ডাক্তারবাবু কোথায় নিয়ে গেছে তা বলতে পারছেন না?—প্রশ্নটা এবার আমিই করলাম।

—না বাবুমশাই। তবে ওই যে বললাম উত্তরে হিন্দুস্থান সীমান্তে শিনকি উপত্যকায় কোন্ জায়গায় নাকি ডাক্তারবাবুর ডেরা আছে। সেখানেই নাকি বছরভোর থাকেন উনি......

—শিনকি উপত্যকা! আমার মনের মধ্যে যেন একটা দোলা লাগলো, বললাম,—ঠিক জানেন?

—মানে, যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা দুজনে কী সব বাতচিত করছিলেন। তার মধ্যে ওই জায়গাটার নাম কানে এসেছে।

—আচ্ছা ভগতলালজী,—মেঘনাদ হঠাৎ বলে উঠলো,—ডাক্তারবাবু আপনার ছেলের চিকিৎসা করে যে ওষুধ দিয়েছিলেন সেই ওষুধ নিশ্চয়ই পুরোটা একসঙ্গে দিয়ে যান নি?

—না। প্রেসক্রিপসানে ওষুধের ফর্মূলা দিয়েছিলেন। আমি দু'মাস অন্তর সিমলা গিয়ে বড় ওষুধের দোকান থেকে বানিয়ে নিয়ে আসতাম।

—সেই প্রেসক্রিপসান আছে আপনার কাছে?

—জরুর। সে তো আমি যত্ন করেই রেখে দিয়েছি।

বলতে বলতে ভগতলাল যোশী উঠে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা পুরনো প্রেসক্রিপসানের কাগজ এনে মেঘনাদের হাতে দিলেন। মেঘনাদ সেটাকে কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুলিয়েই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,—দ্যাখ্ অর্ণব!

দেখলাম, প্রেসক্রিপসানের পুরনো প্যাডের কাগজের ওপর দিকে গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা নাম—'ডাক্তার অরবিন্দ রায়চৌধুরী।'

দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

এ নাম জীবনে ভোলার নয়!

পাঁচ

ড্রাগন পাহাড়ের ভয়ঙ্কর ড্রাগন

এ কোথায় এসে পড়লাম!

এক পাহাড়-ঘেরা প্রান্তর। প্রান্তর রুক্ষ কঙ্করময়। যেদিকে তাকানো যায় ন্যাড়া পাহাড় মাথা উঁচু করে রয়েছে। কোথাও কোন সবুজের চিহ্ন নেই।

ধীরে ধীরে দিনের আলো কমে আসছে। নেমে আসছে অন্ধকার। কিন্তু এই অজানা অচেনা জায়গায় কে আনলো আমায়?

দ্রাম্.....দ্রাম্......দ্রাম্.....দ্রাম.....!

কোথায় জয়ঢাক বাজছে না? হ্যাঁ, তাইতো।

তাকিয়ে দেখি একটু দূরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নাচছে একদল পাহাড়ী আদিবাসী। ওদের পরনে পশুচর্মের পোশাক, মাথায় পালকের টুপি। একযোগে দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতে গাইতে ওরা অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে নেচে চলেছে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে একটা প্রস্তর-বেদী। বেদীতে শুয়ে একজন

মানুষ। কিন্তু তার পরনে তো ওই আদিবাসীদের মতো পোশাক নয়! প্যান্ট-সার্ট। ওর হাত, পা আর মুখ বাঁধা। কে ওই ব্যক্তি?

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল এক ভয়ঙ্কর গর্জন। যেন বজ্রপাতের ধ্বনি। কিন্তু মেঘহীন আকাশে বাজ পড়লো কি ভাবে?

চারদিকে তাকাতেই দৃশ্যটা চোখে পড়লো।

দূর ওই উপত্যকার গা বেয়ে নেমে আসছে যেন এক চলন্ত পাহাড়!

না,পাহাড় নয়—এক অদ্ভুত জীব। চেহারাটা মোটামুটি একটা টিকটিকিকে কয়েক হাজার গুণ বাড়িয়ে তুললে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

গাঁ...ও...ও...!

বাজ পড়ার মতো বিকট গর্জন ওই বিশাল সরীসৃপের কণ্ঠ থেকেই ভেসে এল। বুকে হেঁটে জন্তুটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে পাহাড়ের নীচে।

ততক্ষণে জন্তুটার গর্জন শুনে অগ্নিকুণ্ডের সামনে নৃত্যরত আদিবাসীরা ফিরে তাকিয়েছে ওই বিশাল জন্তুটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে সব বাদ্যধ্বনি। আদিবাসী মানুষগুলো বন্দী তরুণটির বেদীর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে মন্ত্রধ্বনির মতো সমবেত কণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষা আওড়াতে শুরু করেছে। ওরা যেন ওই বন্দীটিকে ভয়ঙ্কর জীবের কাছে নিবেদন করতে চায়।

ওই বিশালদেহী সরীসৃপটিকে আমি চিনতে পেরেছি, ও ড্রাগন পাহাড়ের সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগন।

কিন্তু এত বছর বাদে ও হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ফিরে এল কি ভাবে?

গাঁ...ও...ও...!

ড্রাগন পাহাড় থেকে নেমে আসছে ভয়ঙ্কর ড্রাগন। তার বিশাল আর ভারী পায়ের চাপে কাঁপতে শুরু করেছে পাথুরে প্রান্তর।

ভয়ঙ্কর জীবটা এসে পড়েছে সেই অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি। গনগনে আগুনের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে।

একটা অমানুষিক গর্জন তুলে বেদীতে শোয়ানো বন্দী তরুণীটিকে সে মুখে তুলে নেয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে—'রাম...রামশঙ্কর...কে কোথায় আছ...রামকে বাঁচাও...রামকে তুলে নিয়ে গেল ওই ভয়ঙ্কর জীবটা...বাঁচাও...ওকে বাঁচাও...!'

তাকিয়ে দেখি একটু দূরে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রয়েছেন গৌরীশঙ্করবাবু। আর ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসছে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধের এক মুখ সাদা দাড়ি। বয়সের গাছপাথর নেই। দু চোখের দৃষ্টি যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।

কে? কে ওই বৃদ্ধ?

হঠাৎ মনে পড়লো—আরে উনিই তো ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী। সেই বিচিত্র বিজ্ঞানী। একদা ড্রাগন পাহাড়ের গভীর গহনে যিনি গড়ে তুলেছিলেন

এক আশ্চর্য ল্যাবরেটরী। এই বিংশ শতাব্দীর বুকে এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর সৃষ্টি করে তার সাহায্যে শুরু করেছিলেন এক মরণ-খেলা।

কিন্তু আজ আবার তিনি এলেন কোথা থেকে? ড্রাগনটাই বা ফিরলো কি করে?

হাঃ...হাঃ...হাঃ...!

ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী উন্মত্তের মতো হাসতে শুরু করেছেন। পাহাড়ী বাতাসে উড়ছে তাঁর সাদা দাড়ি। চোখের দৃষ্টিতে আগুন। দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে মনের ভেতরটা!

—অর্ণব...অর্ণব...ওঠ...উঠে পড়...!

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চারদিকে ফুটফুটে আলো। ঘরের জানলায় একটা সুন্দর ছোট্ট পাখী বসে আপন মনে ডেকে চলেছে—টুই...টুই...

তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম? হ্যাঁ, তাইতো। এই তো আমি রয়েছি নারকান্দার প্রাইভেট ট্যুরিষ্ট লজে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ। ও আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। মুচকি মুচকি হাসছে। বললো—সকাল ছটার সময় বিছানায় আয়েশ করে ঘুমিয়ে জব্বর একটা স্বপ্ন দেখছিলিস মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। দুঃস্বপ্ন!—এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছি।

তা ড্রাগন পাহাড়ে যাবার আগেই যদি দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করিস, ওখানে পৌঁছে কি করবি?

—ড্রাগন পাহাড়!—মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে এবার অস্ফুট স্বরে বলি।

—হ্যাঁ। চটপট তৈরী হয়ে নে। জীপ ঠিক হয়ে গেছে। ভেবে দেখলাম রামশঙ্কর বাবুকে যদি ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তার সন্ধানে আমাদের যেতে হবে ওই পথেই।

তার মানে আবার ড্রাগন পাহাড়ে অভিযান!

ছয়
দুর্গম পথে

আমাদের জীপ ছুটে চলেছে নারকান্দা পার হয়ে কার্টরোড ধরে উত্তরে সুদূর শিনকি উপত্যকার পথে।

এপথে প্রথমবার এসেছি এক যুগ আগে ক্যাপটেন সিংএর আমন্ত্রণে ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য-সন্ধানে।

সেবার যে সত্যিই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো তা ভাবিনি। কিন্তু এবার পারবো তো? মেঘনাদ যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ সত্যিই যদি সেই উন্মাদ বিজ্ঞানী গৌরীশঙ্করবাবুর ভাই রামশঙ্করকে সেই রহস্যময় পাহাড়ী ল্যাবরেটরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে এতদিনে তার ভাগ্যে কী ঘটেছে কে জানে!

চলন্ত জীপে বসে এসব চিন্তা বোধ করি আমাদের তিনজনের মাথাতেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনজন বলতে মেঘনাদ, আমি আর গৌরীশঙ্কর বসু। আমাদের জীপ-চালক দিল্ মহম্মদ।

পাহাড়ীপথে কোথাও চড়াই উৎরাই, রুক্ষ পাহাড় কিংবা পাইন গাছের সারি। পথ বেশ দুর্গম। এবার একদিকে খাড়া পাহাড় প্রাচীর উঠে গেছে, অন্যদিকে গভীর খাদ। কোনক্রমে বেসামাল হলেই পুরো গাড়ি একেবারে পাতাল-সমাধি লাভ করবে।

হঠাৎ মেঘনাদের কণ্ঠস্বর কানে এল,—আচ্ছা গৌরীশঙ্করবাবু, আপনার ভাই রামশঙ্কর বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ। ভাল ছাত্রই ছিল। বছর কয়েক আগে কলকাতা ইউনিভারসিটির পরীক্ষায় এম.এস.সি.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। কিন্তু [illegible] ওর মাথা খারাপ হলো।

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও যেন কী ভেবে চলেছে। দূরে পাইন বনের হাওয়ার ঝিরঝিরি শব্দের সঙ্গে নতুন কোন চিন্তা কি ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে ওর মাথার মধ্যে? ও কি কোন সূত্র পেয়েছে?

এর [illegible] পৌঁছলাম আর মাত্র [illegible] মধ্যেই।

সাত

সেই [illegible] গ্রাম

আবার সেই পাহাড়ী গাম। দুর্গম গিরিকন্দর উপত্যকার বুকে মাত্র কয়েকটা কুঁড়ে ঘর নিয়ে একটা জনবসতি। দূরে পাহাড় শ্রেণী। আশপাশে নানা রকম চেনা-অচেনা গাছ-গাছালি, লতাগুল্ম। যেন এক আদিম জনজীবন স্থির হয়ে পড়ে আছে [illegible] যুগের পর যুগ।

দূর থেকে জীপের আওয়াজ শুনে ছুটে বেরিয়ে এল নারী-পুরুষের দল। এককালে এ জায়গা সভ্য দুনিয়ার বাইরে ছিল। কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী অভিযাত্রীদলের দেখা যে মেলে না,তা বোধ হয় বলা যাবে না।

জীপ থেকে নেমে আমরা কয়েক পা এগিয়ে এলাম। ছোট্ট জনবসতির মধ্যে থেকে সবচেয়ে আগে যে মানুষটা এগিয়ে এসে মেঘনাদকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, তাকে চিনতে আমার একটুও দেরী হলো না। সে তাজু।

এই বারো বছরে তাজুর বয়স নিশ্চয়ই বেড়েছে। কিন্তু এখনও ওর পরনে সেই আগের মতোই ভল্লুকের চামড়ার পোশাক। মাথার পালখের মুকুট আর গলায় নানারকমের পাথরের মালা।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, বারো বছর বাদে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের এখানে দেখে তাজু এক লহমায় আমাদের চিনতে পেরেছে। কারণটা, খাঁটি প্রকৃতির সন্তানের বন্ধুত্বের আবেগ অনেক বেশী বলেই বোধহয়।

কিন্তু আমাদের অবাক হওয়া তখন সবে শুরু।

আট

বারো বছর বাদে

তাজুর সঙ্গে দেখা হবার পর পুরনো দিনের সেই কথাগুলোই আমার মনে এল। [illegible] ও ছিল আদিবাসী সর্দার থিং ডনের তরুণ পুত্র।

সেবার বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে ড্রাগন দেবতার ভোগের জীবন্ত নৈবেদ্য হবার পালা পড়েছিল এই তাজুর। প্রথা অনুযায়ী তাজুকে রাখা হতো নির্দিষ্ট শিলাখণ্ডে। সেখান থেকে ড্রাগন রূপী এক বিশাল প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ তাকে তুলে নিয়ে যেত ড্রাগন পাহাড়ের গভীরে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর গোপন ল্যাবরেটরী-গুহায়। তারপর হয়তো ব্যর্থ পরীক্ষার গিনিপিগের মতো তার মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া যেত কোন গভীর খাদের মধ্যে!

কিন্তু তা হয় নি। সেবার তাজুর বদলে মেঘনাদ নিজেই শুয়েছিল সেই নৈবেদ্য-শিলার ওপর বুকে পিঠে উপযুক্ত বর্ম এঁটে। আসলে এই ভাবেই সেদিন ও সরাসরি পৌঁছে গিয়েছিল ল্যাবরেটরী গুহার গোপন পুরীতে। এরপর কী ঘটেছিল তা 'ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য' যারা পড়েছে তারা সবাই জানে। তবে একথা ঠিক, সব কিছুর পরও সেদিন গ্রেফতার করা যায় নি বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরীকে।

তিনি আজও বেঁচে আছেন।

শুধু তাই নয়, একটা ব্যাপার দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না যে, বারো বছর বাদেও ওই আদিবাসী গোষ্ঠী আজও ড্রাগন দেবতার স্মৃতিকে ঈশ্বরের স্মৃতি হিসাবে মনে রেখেছে। শুধু কি তাই, বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরীকে তারা ভগবান বলেই মনে করে। ওরা নাম দিয়েছে 'ডাক্তার ভগবান'।

কিন্তু কেন যে তারা এ কথা বলে, তা জানতে পারলাম এখানে পৌঁছবার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই।

নয়

ডাক্তার ভগবান

আমরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলাম যে সভ্য দুনিয়ার বাইরে এই জনবিরল শিনকি উপত্যকার এক আদিবাসী পল্লীতে সৌরশক্তির ব্যবহারে আলো জ্বলতে দেখবো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরা এখানে এসে পৌঁছবার কিছু সময়ের মধ্যেই দিনের আলো কমে এল। পাহাড় ডিঙিয়ে নেমে আসতে লাগলো রাতের অন্ধকার।

আর কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট পল্লীটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বিদ্যুতের আলোয়। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে তাজু দুর্বোধ্য ভাষায় যা জানালো, তার অর্থ—এ সবই 'ডাক্তার ভগবানে'র কৃপা।

সত্যিই না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কতটা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে তবেই সারাদিনের সঞ্চিত সৌরকোষের সাহায্যে রাতের বেলা বিদ্যুতের আলো জ্বালা সম্ভব!

এ কৃপার দৃষ্টান্ত পরদিন আরও দেখলাম।

বলা যায়, একটা রাত অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট্ট আদিবাসী গ্রামটা চোখের সামনে ফুটে উঠলো নতুন রূপ নিয়ে। গত বারো বছর আগের সে রূপের সঙ্গে আজকের অনেকটাই অমিল।

আজ এ গ্রাম এক সুখী সমৃদ্ধ গ্রাম।

এই পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের 'ডাক্তার ভগবান' শুধু সৌরকোষ ব্যবহার করে রাতে আলো জ্বলার ব্যবস্থাই করেন নি, সেই সঙ্গে উন্নত প্রথায় চাষ এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। একটা ছোট পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে—যার প্রধান শিক্ষক বর্তমানে সর্দার তাজু।

সব কিছু দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। বারো বছর আগের সেই জংলী কুসংস্কার-ভরা গ্রামটিতে প্রবেশ করেছে সভ্য-দুনিয়ার এক টুকরো আলোকরশ্মি।

কিন্তু এসব দেখে শুনে সময় নষ্ট করতে আমাদের মধ্যে একজনের মোটেই ভাল লাগছিল না। তিনি মেজর গৌরীশঙ্কর বসু। তাঁর মনের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছিল।

অবশেষে তাঁর মনের প্রশ্নটা মেঘনাদই তুললো তাজুর কাছে, তা হলো তাদের 'ডাক্তার ভগবানে'র সঙ্গে অন্য কোন মানুষ সম্প্রতি এ গ্রামে এসেছিল কিনা।

উত্তরে তাজু যা শোনালো, তা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

সে বললো, মাসখানেক হবে তাদের 'ডাক্তার ভগবান' দিন কয়েকের জন্য এ গ্রামে এসেছিলেন। এবার তাঁর একজন সঙ্গী ছিল। সে মানুষটিকে তাজু আগে কোনদিন দেখে নি। বয়সে তরুণ। অত্যন্ত নম্র এবং ভদ্র স্বভাবের। এখানে তাজুর ঘরেই সে রাত কাটিয়েছে। যে কদিন ছিল, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সেই নতুন মানুষটি গ্রাম শুদ্ধ সকলের মনজয় করে নিয়েছিল। তারপর একদিন সকালে 'ডাক্তার ভগবানে'র সঙ্গে যাত্রা করেছে ড্রাগন পাহাড়ের উদ্দেশে। সেখানে আছে ডাক্তার ভগবানের 'যাদুকুঠি', এখনও সে এলাকা এই পাহাড়ী আদিবাসীদের কাছে নিষিদ্ধ।

—এই নতুন লোকই আমার ভাই। রামশঙ্কর। তাজুর কথার মধ্যেই—উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠেছেন গৌরীশঙ্করবাবু। ওরা তাহলে ড্রাগন পাহাড়ের দিকে গেছে। আর দেরী নয়। আগামীকালই আমি ওখানে যেতে চাই।

গৌরীশঙ্করবাবুর এই উত্তেজনাতেও মেঘনাদ কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো না। তবে ওর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত। কী ভাবছে মেঘনাদ? তবে কি ড্রাগন পাহাড়ের প্রসঙ্গ উঠতেই আমারই মতো ওর মনে ফুটে উঠেছে সেই এক যুগের আগের বিভীষিকার ছবি?

দশ

আবার সেই পথে

গৌরীশঙ্করবাবুর ইচ্ছামতো পরদিন ভোর বেলাতেই আমরা যাত্রা করলাম। আমাদের গন্তব্য ড্রাগন পাহাড়ে 'ডাক্তার ভগবানে'র সেই 'যাদু-কুঠি'।

মেঘনাদ তাজুকে একবার যাত্রা-সঙ্গী হবার অনুরোধ করেছিল কিন্তু সেই নিষিদ্ধ এলাকায় পা দিতে তার অনিচ্ছা দেখে দ্বিতীয়বার আর বলে নি।

অবশ্য এমনিতে অসুবিধা বিশেষ নেই। ড্রাগন পাহাড়ের সেই যাদু-কুঠি, যা নাকি আসলে পাহাড়ী গুহায় তৈরী ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর বিজ্ঞান গবেষণাগার, সেই স্থানটি তো ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচিত।

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আছে। মেঘনাদ আর মেভ ব গৌরীশঙ্কর বসু দুজনের কাছেই রয়েছে দুটি রিভলবার। সঙ্গে একটা রাইফেলও আছে। এ ছাড়া আমার নিত্যসঙ্গী সেই তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরিটা তো আছেই।

যথাসময়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম ড্রাগন পাহাড়েব উদ্দেশে। প্রায় বারো বছব বাদে একই পথে চলেছি আমরা।

পাকদণ্ডি চড়াই পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণা। চারদিকটা বড় বেশী নিঃ এই দিনমানেও একটা পাখী ডাকছে না কোথাও।

গাছপালা ঝোপ-ঝাড়ের পথ কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে শুধু ন্যাড়া পাহাড়।

ক্রমে রোদের প্রকোপ বাড়ছে। কিন্তু আমার সঙ্গীদের ভ্রুক্ষেপ গৌরীশঙ্করবাবু প্রাক্তন সামরিক অফিসার। তাঁর পক্ষে এমন পথে চ... কোন কষ্টকর ব্যাপারই নয়, আর মেঘনাদকেও তো আজ পর্যন্ত পথের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করতে দেখিনি।

—আমরা ঠিক পথে চলেছি তো মেঘনাদবাবু?—গৌরীশঙ্করবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে চমক ভাঙলো।

মেঘনাদ কিন্তু চলা থামালো না। হাঁটতে হাঁটতে বললো,—ভাববেন না, ঠিক পথেই হাঁটছি। বারো বছর আগের পথের স্মৃতি এত সহজে ভুলবো না।

ইতিমধ্যেই আমরা যে জায়গাটাতে এসে পৌঁছেছি তার আশপাশে ছোটখাট নানা পাহাড়ী গুহা চোখে পড়ছে। ওর যে কোন একটিতে কোন হিংস্র জন্তুর ঘাপটি মেরে থাকা আশ্চর্য নয়।

এরপর থেকে খুবই সর্তক পদক্ষেপে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। মনে এখন শুধু একটাই চিন্তা ভাসছে—যার খোঁজে এত দূরের পথ এলাম সেই রামশঙ্কর বসুকে সত্যিই এখানে পাব তো? ডক্টর অববিন্দ রায়চৌধুরীর কথাও মনে হচ্ছিল। এত বছর বাদে তাঁকে কী অবস্থায় দেখবো, তিনি কী ভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করবেন কে জানে! তবে গত এক যুগের মধ্যে তাঁর চিন্তা-ভাবনায়

যে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে, তা এবারে এখানে আসার পর থেকেই টের পেয়েছি। এ সত্ত্বেও ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী এ সময়ে সভ্য দুনিয়ার বাইরে ড্রাগন পাহাড়ের মাথায় তাঁর গোপন গবেষণাগারে নতুন কী গবেষণা শুরু করেছেন, সেটাও একটা রহস্য বৈকি। আর রামশঙ্কর—তাকেই বা ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন?

একটা ঝর্ণার ধারে বসে সঙ্গে আনা কিছু শুকনো খাবারে মধ্যাহ্ন-আহার সেরে আবার আমরা যাত্রা করলাম।

এগারো
সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ

আমার ঘড়িতে দুপুর তিনটে বাজে।

হঠাৎ মেঘনাদ চেঁচিয়ে উঠলো—ওই তো, ওই তো সেই গুহা।

চমকে তাকালাম।

সামনের টিলাটার ওধারে একটা ন্যাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা বিরাট গুহামুখ চোখে পড়ছে। গুহার কিছুটা ভেতর থেকে যেন পুরোপুরি অন্ধকারের রাজত্ব। গুহার সামনে পড়ে রয়েছে একটা বড় পাথরের চাঙড়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে ভেসে উঠলো বারো বছর আগের সেই দিনগুলোর স্মৃতি। সেদিন সেই প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগন মেঘনাদকে মুখে করে বয়ে এনে এই বড় পাথরের চাঙড়েই নামিয়ে রেখেছিল। আর সেই দানবকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলাম আমি আর ক্যাপটেন সিং।

—জায়গাটা চিনতে পারছিস অর্ণব? সামনের ওই যে গুহাপথ, ওর ভেতরেই ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গোপন ল্যাবরেটরী।

মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনে ওর মুখের দিকে তাকাই। বলি,—তার মানে তুই কি মনে করছিস তিনি আবার ওরই মধ্যে তাঁর গুপ্ত গবেষণাগার গড়ে তুলেছেন আর রামশঙ্কর বসুকে নিয়ে গেছেন সেখানেই?

—অস্বাভাবিক কি? মেঘনাদ বললো, বারো বছর অনেক দীর্ঘ সময়। এর মধ্যে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর অস্তিত্বের কথা ভুলেই গেছে সভ্যদুনিয়ার ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু প্রকৃত স্রষ্টা কিংবা বিজ্ঞানী কখনও ভোলে না তার সাধনার কথা।

গৌরীশঙ্করবাবু এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন। আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, বললেন,—কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বৃথা জল্পনা কল্পনা করে লাভ কি? তার চেয়ে চলুন, দিনের আলো থাকতে আমরা গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়ি,—বলতে বলতে হাতের রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরলেন।

গৌরীশঙ্করবাবুর এ ব্যস্ততা স্বাভাবিক। উদ্বেগের কারণও রয়েছে যথেষ্টই। কিন্তু আমাদের তো এই সুড়ঙ্গের ভেতর পা দেবার আগে সব দিক বিবেচনা করতে হবে। বিশেষত, এ ব্যাপারে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়।

তবে এ পর্যন্ত এখানে কোন জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। এ যেন পৃথিবীর বাইরে কোন প্রাণহীন গ্রহের ঠিকানায় এসে হাজির হয়েছি।

কথাটা যে মেঘনাদও চিন্তা করছে, তা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

গৌরীশঙ্করবাবু তাগাদা দিলেন,—মেঘনাদবাবু, দিনের আলো পড়ে আসছে। ভেতরে যদি যেতেই হয়, দেরী করা ঠিক হবে না।

গৌরীশঙ্করবাবুর কথায় যুক্তি আছে।

অতঃপর আমাদের গুহামুখের উদ্দেশে এগিয়ে যাওয়ার পালা। আমরা তিনজনেই হাতের অস্ত্র বাগিয়ে এগিয়ে চললাম চরম লক্ষ্যের পথে।

কিন্তু গুহার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো।

সামনের ওই গুহা যেন এক বিরাট অজগরের মতো হাঁ-করে রয়েছে। ওর ভেতরে সুড়ঙ্গ পথ কোথায় গেছে কে জানে! গুহার কিছুটা ভেতরের পর থেকে আর সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে নি। সেখানে পুরোটাই যেন অন্ধকারের রাজত্ব।

মনে পড়লো এক যুগ আগের কথা। একদা এই গুহার মধ্যেই দেখেছিলাম, গুহার ভেতর অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ গেছে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর গবেষণাগারে। এবার কী অভিজ্ঞতা হবে কে জানে!

মেঘনাদ তার ব্যাগ থেকে পাঁচ-ব্যাটারি টর্চটা আমার হাতে দিয়ে বললো,—এটা তুই জ্বেলে ধরে আমার সঙ্গে চল অর্ণব। এখন থেকে আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে চলতে হবে।

প্রথমে মেঘনাদ তারপর গৌরীশঙ্করবাবু এবং সবশেষে আমি গুহার মধ্যে পা দিলাম।

বারো
প্রাণহীন দেহ

গুহার মধ্যে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে চলেছি আমরা তিনজন। পাঁচ-ব্যাটারি টর্চের আলোয় গুহার অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে।

গুহার ভেতরটা নিঃশব্দ। গুহার মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে। কিছুটা পথ চলার পর যে জায়গাটাতে এসে পৌঁছলাম, দেখে মনে হলো সেটা পাহাড় কেটে কৃত্রিম ভাবে তৈরী একটা আস্তানা। সম্ভবত কোন পাহাড়ের ভেতরে তার অবস্থান। চারদিকে পাহাড়প্রাচীর। তবে আলো হাওয়া আসার মতো ঘুলঘুলি আছে। মাঝে একটা প্রশস্ত হলঘরের মতো—তার চারদিকে এক একটা খুপরি-ঘর। বারো বছর আগে এখানেই এসেছিলাম। তখন দেখেছিলাম জায়গাটা কর্মব্যস্ত। আসলে এটাই ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর গোপন গবেষণাগার। কিন্তু এবার তো এ পর্যন্ত এখানে কোন জনপ্রাণী চোখে পড়লো না। সমস্ত জায়গাটা কেমন যেন পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে। চারদিকে অপরিচ্ছন্নতা।

—আশ্চর্য!—মেঘনাদ আপন মনেই বিড় বিড় করলো,—দেখে তো এখানে কোন জনপ্রাণীর বাস আছে মনে হচ্ছে না। তবে কি সবটাই ভুল হলো!

প্রশ্নটা আমার মনেও জাগতে শুরু করেছে। এ গুহা কি এখন তাহলে পরিত্যক্ত? ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী এই গুহা ল্যাবরেটরী ছেড়ে ড্রাগন পাহাড়ের অন্য কোথাও তাঁর আস্তানা বানিয়েছেন?

মেঘনাদকে ফিরে যাওয়ার কথা বলবো কিনা ভাবছি, হঠাৎ গৌরীশঙ্কর বাবুর কণ্ঠস্বর শুনলাম,—ওই দেখুন মেঘনাদবাবু, আলো!

গৌরীশঙ্করবাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে হল-ঘরের একেবারে কোণের দিকে তাকালাম। এখানে কোন একটা গুহাঘরের ভেতর থেকে এক চিলতে আলো বেরিয়ে আসছে।

—মনে পড়ছে অর্ণব, ওখানেই ছিল ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর সেই ল্যাবেরেটরী?

হ্যাঁ, মনে পড়ছে বৈকি। সেবার বন্দী অবস্থায় মেঘনাদ আর আমাকে ওই গুহাঘর টার মধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডক্টর রায়চৌধুরীর কাছে। ওখানেই আমরা শুনেছিলাম তাঁর গবেষণার আশ্চর্য তথ্য।

আবার আমরা এসেছি এখানে। তবে এবার আর বন্দী অবস্থায় নয়—হয়তো বা তাঁর হাতে এক বন্দী মানুষের খোঁজে।

কিন্তু সত্যিই কি আমাদের অনুমান নির্ভুল? রামশঙ্কর চৌধুরীকে উন্মাদ বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী এখানে ভুলিয়ে এনে বন্দী করে রেখেছেন কোন নতুন উদ্ভট গবেষণার প্রয়োজনে?

হাতের টর্চ নিবিয়ে নিঃশব্দ পায়ে মেঘনাদ আর গৌরীশঙ্করবাবুর পিছু পিছু এগিয়ে চললাম সেই ল্যাবরেটরী গুহা-ঘরটির দিকে।

ঘরের মধ্যে পা দিলাম। নানা রকম বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে সাজানো। পাথরের দেয়াল কেটে র‍্যাক বানানো হয়েছে। তাতে নানা কেমিক্যালের বোতল। মাঝে লম্বা টেবিল, তার ওপর কাঠের হোল্ডিংয়ে বসানো নানা আকারের টেষ্টটিউব, বুনসেন বার্নার, আরও নানা অদ্ভুত যন্ত্রপাতি।

বারো বছর আগে, এই ল্যাবরেটরী গুহার মধ্যেই সাক্ষাৎ মিলেছিল ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর সঙ্গে। ঘটেছিল কত নাটকীয় ঘটনা—কিন্তু আজ এ পর্যন্ত এখানে কোন মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীর সাড়া শব্দ পাইনি।

এতক্ষণ আমরা ল্যাবরেটরী গুহার ভেতরে না ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই ভেতরটায় চোখ বুলোচ্ছিলাম আর পুরনো দিনের কথাগুলো ভাবছিলাম। এর মধ্যে খেয়াল করিনি কখন গৌরীশঙ্করবাবু ওই গুহা ল্যাবরেটরীর মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে গেছেন।

হঠাৎ গৌরীশঙ্করবাবুর চিৎকার কানে আসতে চমক ভাঙলো। গৌরীশঙ্কর বসু প্রায় ককিয়ে উঠেছেন,—ও কে! ও কে পড়ে আছে ওখানে?

গৌরীশঙ্কর বসুর কথামতো ওপাশের টেবিলটার নীচে চোখ পড়তেই প্রায় আঁতকে উঠলাম।

কী বীভৎস দৃশ্য!

টেবিলটার নীচে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা প্রাণহীন দেহ। পরনে প্যান্ট সার্ট। সার্টের ওপর ল্যাবরেটরীতে কাজ করার উপযোগী পোশাক। মানুষটাকে পেছন থেকে চেনার উপায় নেই। তবে মাথা ভর্তি ধপধপে সাদা চুল। দেহটার আশপাশে জমাট রক্ত কালচে হয়ে গেছে।

কার দেহ ওটা? ওই বৃদ্ধ মানুষটাকে এখানে ঢুকে খুন করে গেছে কে বা কারা?

মেঘনাদ ততক্ষণে এগিয়ে গেছে মৃতদেহটার পাশে। উপুড় করা দেহটা সোজা করে দিতেই আমি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম,—এ কি! এ তো ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী!!

তেরো
নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড

না, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ওই মৃত ব্যক্তিটি ড্রাগন পাহাড়ের এই গুপ্ত-গুহা ল্যাবরেটরীব মালিক বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী। প্রায় এক যুগ বাদে দেখলেও মানুষটাকে চিনতে আমাদের এতটুকু দেরী হয় নি।

কিন্তু আজ ওঁর সঙ্গে দেখা হলো ওঁর জীবিত অবস্থায় নয়। এর আগেই কোন অজানা ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন তিনি।

গৌরীশঙ্করবাবু মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন,—মনে হচ্ছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই ওঁর মৃত্যুটা ঘটেছে।

ঠিকই বলেছেন এই প্রাক্তন সামরিক অফিসার ভদ্রলোক। মৃতদেহ রাইগার মাটিস তো ধরেইছে, পচন ধরতেও শুরু করেছে। আশপাশের রক্তও কালচে হয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

—সম্ভবত গলাটিপে খুন করা হয়েছে ডঃ রায়চৌধুরীকে। মেঘনাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—গলার ওপর কালসিটে ছাপ স্পষ্ট। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

—হুঁ। আর মৃত্যুর আগে যে উনি প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন সে লক্ষণও রয়েছে। আমি বললাম।

এবার প্রশ্ন দাঁড়ালো, এভাবে খুনটা করলো কে?

এখনও পর্যন্ত তো দ্বিতীয় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব এখানে চোখে পড়েনি।

মেঘনাদ এতক্ষণে সমস্ত ল্যাবরেটরী কক্ষটাতে চোখ বুলোতে শুরু করেছে। পাশের টেবিলে ড্রয়ারগুলোও ঘেঁটে দেখছে ও।

দেখতে দেখতে ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা ডাইরী বেরুল। চামড়ায় বাঁধানো বেশ বড় আকারের। মেঘনাদ কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে পাল্টে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো,—এই তো, এখানেই রয়েছে সূত্র!

—কি সূত্র?

—ডক্টর রায়চোধুরী তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা সম্পর্কে, অনেক তথ্য এখানে নিজের হাতে লিখে রেখেছেন। দাঁড়া অর্ণব, আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিই, তারপর তোদের হাতে দিচ্ছি।

চৌদ্দ
আশ্চর্য গবেষণার ফল

ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর ডাইরীর পৃষ্ঠায় চোখ বুলোলাম। বারো বছর আগের মতো এবারও তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু অদ্ভুত। সেবার তিনি মানুষের শরীরের রক্তের বিকল্প তৈরীর চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। গবেষণার স্থান বেছে নিয়েছিলেন দুর্গম ড্রাগন পাহাড়ের এই গহন এলাকা। এখানেই গড়ে তুলেছিলেন গুপ্ত ল্যাবরেটরী পাহাড়ী গুহা কেটে। আর গবেষণার জন্য মানুষ সংগ্রহের জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেই পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামটিকে। সে কারণে এক অদ্ভুত মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে। এ কাজে তাঁর সাহায্য-কারিণী ছিল তাঁর একদা ছাত্রী মিতালী। সে হলো আদিবাসীদের মহিলা ওঝা দেবীরাণী। প্রতিবছর সে একটি করে মানুষকে পাঠাতো ড্রাগন পাহাড়ের গুপ্ত গবেষণাগারে। তাকে বয়ে নিয়ে যেত এক প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর।

ডঃ রায় চৌধুরীর এবারের গবের্ষণার বিষয়বস্তু আরও দুঃসাহসিক। তিনি তাঁর নতুন গবেষণায় মানুষকে দেবতার আসনে বসানোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। অর্থাৎ মনুষ্য স্বভারের আদিম হিংস্রতাকে নির্মূল করে ইচ্ছামতো প্রতিভার বিকাশ ঘটাবার অনুকূল চেতনা মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করার গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি।

এ জিনিস বোঝার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার মতো সাধারণ মানুষের নেই, তবে যেটুকু ধারণা করতে পারছি তা এই রকম ঃ

আমাদের শরীর অসংখ্য সেল দ্বারা গঠিত। এই সেলগুলো সাইটোপ্লাজমে ভরা। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস, আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোসমস্। এইসব ক্রোমোসমস-ই বহন করে পুরুষানুক্রমে মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, প্রবণতা, বিভিন্ন রোগের ধারাও।

ডক্টর রায়চৌধুরী চেয়েছিলেন জটিল প্রক্রিয়ায় এই সব জীনের মধ্যে কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্ট প্রয়োগ করতে—যার সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই সব জীনের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে সেই মানুষটিকে কুপ্রবৃত্তি বর্জিত মহান মানবিক গুণসম্পন্ন করা যেতে পারে। বিজ্ঞানী রায়চোধুরী লিখেছেন, মানুষ ছাড়া অন্যান্য

প্রাণীর ওপর তাঁর পরীক্ষায় কিছু কিছু সুফল মিলেছে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তিনি তাঁর ডাইরীর পৃষ্ঠায় সবিস্তারে লিখেছেন। সফলতার সঙ্গে ব্যর্থতার কথা লিখতেও ভোলেননি তিনি।

একটা নেকড়ে বাঘের জীনের কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টর পর সেটা সম্পূর্ণভাবে হিংসা ভুলে গেছে। এমনকি তার স্বাভাবিক হিংস্রতা ভুলে এখন সে সম্পূর্ণ তৃণভোজী। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তবে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর প্রথম পরীক্ষাটা সফল হয় নি। সেটা প্রয়োগ করেছিলেন একটা খরগোসের ওপর। সেটা বেজায় হিংস্র হয়ে পড়েছিল।

এরপর ডক্টর রায়চৌধুরী তাঁর চরমতম লক্ষ্য মানুষের ওপর তাঁর এই পরীক্ষার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন। আর তারপরই রামশঙ্করের প্রসঙ্গ ঢুকেছে তাঁর ডাইরীর পৃষ্ঠায়।

ডক্টর রায়চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হলো। রামশঙ্কর বসু। বয়সে তরুণ। বয়স বছর ২৫ এর বেশী হবে না। প্রথম দিন ছেলেটিকে দেখেই ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে ছেলেটির মধ্যে এক নিঃস্বার্থ দর্শন আছে। চিরকাল এই মনোভাবের তরুণরাই দেশ এবং সমাজের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে থাকে।"

তারপর এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"রামশঙ্করকে আমার গবেষণার কথা বলেছি, ও ভীষণ উৎসাহিত। ও বলেছে, যুগে যুগে মহামানবেরা যে চেষ্টা করছেন, মানুষকে ষড়রিপুর দাস থেকে মুক্তি দিয়ে—শুদ্ধ পবিত্র মানুষ এবং কলুষহীন সমাজ গঠন করতে—তা যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব হয়, তবে তার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কী হতে পারে। ও নিজের ওপর এই পরীক্ষা প্রয়োগের আবেদন জানিয়েছে, ও বলেছে—মানুষ হিসাবে এর চেয়ে বেশী কাম্য ওর জীবনে আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমি রাজি হতে পারছিনা.....যদি পরীক্ষা ব্যর্থ হয়!"

ডাইরীর অন্য এক জায়গায় ঃ

"নিঁখুত মানুষ আমায় সৃষ্টি করতেই হবে। এ পরীক্ষা সফল হলে আগামী দিনে মানুষের প্রয়োজন মতো ইচ্ছা করলেই আরও আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুভাষ বসু সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব হবে না। কিন্তু পরীক্ষার উপযুক্ত মানুষ একজনকে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে পাহাড়ী উপজাতি গ্রামের কোন মানুষকে কাজে লাগিয়ে নতুন করে পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাই না। তবে কি শেষ পর্যন্ত রামশঙ্করের ওপরই এ পরীক্ষার প্রয়োগ করতে হবে? ও তো প্রতিদিনই আমায় তাগাদা দিচ্ছে।"

এরপর ডাইরীর লেখা বেশ অনিয়মিত। বোধহয় অত্যধিক কাজের চাপে ডক্টর আর ডাইরী লেখার অবকাশ পাচ্ছিলেন না।

ডাইরীর একেবারে শেষের দিকে লেখা ঃ

"সম্মত আমায় হতেই হলো। এছাড়া আর উপায় নেই। আগামীকালই আমার জীবন-সাধনার চরম পরীক্ষার দিন। রামশঙ্করের দেহের ক্রোমোসোমস্-এর মধ্যেকার জীনে কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্ট প্রয়োগ করবো আমি।"

এরপর ডাইরীর কয়েকটা পৃষ্ঠা একেবারে ফাঁকা। একেবারে শেষ লেখার তারিখ মাত্র কয়েকদিন আগে। মাত্র দু-চারটে কথা। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের মতো :

"হায়, এ কী করলাম! সারা জীবনের সাধনা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল!"

এরপর আর কিছু নেই। ডাইরী মুড়ে রাখলাম।

তবে ঘটনাটা কী ঘটেছে—তা জানার উপায় তিনি রাখেন নি। এক্সপেরিমেণ্ট কি ব্যর্থ হয়েছে?

এ ব্যর্থতার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর।

খস্...খস্...খস্...!

আওয়াজটা শুনে কান পাতলাম। ল্যাবরেটরী গুহার বাইরে থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। ও কিসের আওযাজ? কেউ কি একটা ভারী দেহ নিয়ে পা ঘসে ঘসে এগিয়ে আসছে? মেঘনাদের দিকে তাকালাম। মনো হলো আমারই মতো একই চিন্তা ওর মাথায়। গৌরীশঙ্করবাবু হাতের রিভলবারটা চেপে ধরেছেন।

খস্...খস্ ..খস্...!

হ্যাঁ, কেউ একজন এগিযে অাসছে। কাছে, আরও কাছে ।

আগন্তুক এসে দাঁড়াল। গুহাকক্ষের সামনে।

কিন্তু ও কি মানুষ?

কী অমানুষিক ভঙ্গি! হ্যাঁ, শরীরটা মানুষেরই বটে। পরনে একটা ছেঁড়া, বিবর্ণ ফুলপ্যাণ্ট আর সার্ট। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, আর চোখের দৃষ্টি—যেন মরা মানুষের মতো।

—রামশঙ্কর!—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন গৌরীশঙ্করবাবু।

কিন্তু ভাই-এর দিকে ছুটে যাবার আগেই মেঘনাদ ওঁর হাত টেনে ধরলো,—সাবধান! যাবেন না গৌবীশঙ্করবাবু। যাকে আপনি ভাই মনে করছেন, তাব শরীরটা আপনার ভাই রামশঙ্করের হলেও এখন ও আর আপনাব ভাই নয়।

-তার মানে! চমকে মেঘনাদের দিকে তাকালেন মেজর গৌরীশঙ্কর বসু, -কী বলতে চাইছেন আপনি?

--ওই দেখুন!—মেঘনাদের কথা শুনে আমরা দুজনেই ঘাড় ঘোরালাম। আগন্তুক মানুষটা দরজার সামনে থেকে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টির মধ্যে কোন মানবিক প্রতিফলন নেই, তার পরিবর্তে ওর মরা দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত হিংস্রতা। হাত দুটো সামনের দিকে

ছাড়ানো, আর কণ্ঠ থেকে বেরুতে শুরু করেছে এক জান্তব গর্জন—গ...র...র...রর্!

ও মানুষ নয়। মানুষ হতে পারে না।

এবার গৌরীশঙ্করবাবুও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁর দু চোখে যুগপৎ বিস্ময় আর বেদনা। এত দীর্ঘ সময় কষ্ট করে, এত পথ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রিয় ভাইটির দেখা যদিও মিললো—কিন্তু এ কী তার রূপান্তর!

ও এগিয়ে আসছে একপা একপা করে। গলার মধ্যে থেকে জান্তব গর্জনটা আরও তীব্র হচ্ছে।

—একটা দড়ি কিংবা শেকল চাই। ওকে বাঁধতে হবে,—এক্ষুনি! বলতে বলতে মেঘনাদ নিজেই একপাশে পড়ে থাকা একটা মোটা দড়ি তুলে নিলো।

গ...র...র...র্!

ওই অমানুষিক আগন্তুক হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে আবার এগিয়ে আসতে শুরু করে। এবার ওর লক্ষ্য মেঘনাদ।

মেঘনাদও প্রস্তুত। ওর হাতে মোটা দড়ি। ও আঘাত না করে আগন্তুককে সরাসরি বন্দী করতে চায়।

—সাবধান মেঘনাদ!

কথাটা আমার কণ্ঠ থেমে বেরুবার আগেই সেই ভয়ঙ্কর অমানুষিক আগন্তুক ঝাঁপিয়ে পড়লো মেঘনাদের ওপর। মেঘনাদের মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে সে এক ঝটকায় মেঘনাদকে মেঝেতে চিৎ করে ফেলে ওর বুকের ওপর চেপে বসলো।

ওর সাঁড়াশির মতো দুহাতের আঙুলগুলো চেপে বসতে শুরু করেছে মেঘনাদের কণ্ঠনলীতে । ওর শরীরে দানবেব শক্তি। মেঘনাদ প্রাণপণে চেষ্টা করেও পারছে না ওর কবল থেকে মুক্ত হতে।

বিপদ বুঝে এবার পেছন থেকে দানবটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম ওকে মেঘনাদের বুকের ওপর থেকে তুলে আনতে। কিন্তু কিছুতেই পারছি না। ওর মোটা মোটা আঙুলগুলো ক্রমেই আরও শক্ত হয়ে চেপে বসতে শুরু করেছে মেঘনাদের কণ্ঠনালীতে। মেঘনাদের সারা মুখ রক্তবর্ণ। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

হাতের রিভলবারের বাঁটটা দিয়ে আঘাত করলাম রামশঙ্কররূপী দানবটার মাথাব পেছনে। দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করলো।

হা...উ...উ...ম্...!

হিংস্র গর্জন করে উঠলো দানবটা। কিন্তু আশ্চর্য! একটুও নড়লো না।

ওদিকে মেঘনাদের দম বোধ হয় বন্ধ হয়ে আসছে। আজ পর্যন্ত মেঘনাদকে এ অবস্থায় পড়তে কোনদিন দেখি নি। তবে কি আর বাঁচাতে পারবো না আমার বন্ধুকে! ...কি, কী করবো এখন...।

একটাই বিকল্প...

গুড়ুম্!

দানবের দেহটা মুহূর্তে শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঘনাদের বুকের ওপরই। ঝলকে ঝলকে রক্ত!

একেবারে ওর কানের পাশে গুলিটা করেছেন গৌরীশঙ্করবাবু।

আমি বিস্মিত চোখে গৌরীশঙ্করবাবুর দিকে ফিরে তাকাতে উনি অদ্ভুত শান্ত গলায় বললেন,—অর্ণববাবু, শিগগির মেঘনাদবাবুর কণ্ঠ থেকে রামশঙ্করের আঙুলগুলো খুলে দিন। দেরী হলে আরও এঁটে বসবে।

তাই করলাম। তারপর ওই রক্তাক্ত দানবের দেহটা মেঘনাদের বুক থেকে তুলে ওর পাশেই শুইয়ে দিলাম। এবার লক্ষ্য করলাম গৌরীশঙ্করবাবুর দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত।

মেঘনাদ এখনও অচৈতন্য।

পনের
করুণ পরিণতি

ড্রাগন পাহাড় থেকে ফেরার পথ ধরেছি—গৌরীশঙ্করবাবু, মেঘনাদ আর আমি।

সেদিন ল্যাবরেটরী গুহা থেকে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী এবং রামশঙ্কর-এর দানব শরীরটাকে বাইরে বার করে যথাবিহিত সৎকার করা হয়েছে। মেঘনাদের শুশ্রূষার জন্যেও একটা দিন বিশ্রাম নেয়া হয়েছে। খাবার-দাবারের অভাব ওখানে ছিল না। ডঃ রায়চৌধুরী বেশ কয়েক মাসের খাদ্যদ্রব্যের সঞ্চয় রেখেছিলেন।

কিন্তু এত কিছু করেও তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য সফল হলো না। নিঁখুত মানুষ গড়তে গিয়ে সত্যিকার মানবিক চেতনা সম্পন্ন একজন মানুষ দানবে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ অভিশাপে পরিণত হলো। নিজের জীবনটাও হারালেন।

গৌরীশঙ্করবাবুর ট্রাজেডিটাও বড় করুণ। যে ভাইকে তিনি জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন, যে নিরুদ্দিষ্ট ভাই-এর সন্ধানেই তিনি আমাদের নিয়ে ছুটে এসেছিলেন এত দূরে, শেষ পর্যন্ত তার দেখা যখন মিললো—সে আর মানুষ নয়, মনুষ্যদেহী ভয়ঙ্কর দানব। ভাইয়ের সেই দানব দেহটাকে নিজের হাতে বিনাশ করতে হয়েছিল গৌরীশঙ্করবাবুকে। ভাই-এর সে দেহ চিতায় তোলবার সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন গৌরীশঙ্করবাবু। তাঁর জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে!

আমরা হাঁটতে শুরু করেছি ড্রাগন পাহাড়কে পেছনে ফেলে। পেছনে ড্রাগন পাহাড়ের মাথায় প্রভাতী সূর্যটা রক্ত আঁখি মেলে তাকিয়ে আছে। সারা আকাশ লালে লাল!

জাল ছবির রহস্য

এক

ছুটির দিনটা সকালবেলায় মেঘনাদের বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, দীননাথ এসে খবরের কাগজ আর দু'কাপ চা রেখে গেল।

মেঘনাদ চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিল। পাতাগুলো উল্টে চোখ বোলাতে বোলাতে বললো, অর্ণব, আজ একটা বিশেষ খবর আছে।

মেঘনাদের কথায় কাগজটা হাতে নিলাম। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় চোখ বুলোতেই দেখতে পেলাম চোখে পড়ার মতোই খবর বটে :

দিল্লী কাস্টমস অফিসারদের কৃতিত্ব

বহুমূল্য প্রাচীন চিত্র উদ্ধার

গতকাল দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে কাস্টমস অফিসারদের তৎপরতায় সপ্তদশ শতকের এক বিখ্যাত চিত্র বিদেশে পাচার করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য চিত্রটি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হলেও পুলিশ পাচারকারীকে গ্রেফতার করতে পারেনি, যদিও তার নাম এবং চেহারা বর্ণনা পাওয়া গেছে। পাচারকারীর নাম গোপী খুরানা। বয়স বছর চল্লিশ। মাঝারি হাইট, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে চশমা। ঠিকানা সম্ভবত কলকাতা। তাকে গ্রেফতার করার জন্য জোর পুলিশি অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

ছবি সম্পর্কেও সেদিনের সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে। বিশেজ্ঞদের মতে সেটি সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুঘল দরবারী চিত্রকর খাজা আবদুস সামাদের আঁকা। ছবিটির বিষয়বস্তু হলো মুঘল হারেমে প্রসাধনরত বেগমসাহেবা। চিত্র সমালোচকরা এই শিল্পীর এ যাবৎ প্রাপ্ত চিত্রগুলির মধ্যে এটিকেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে মনে করছেন। এই ব্যাপারে সরকারী মহলে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

খবরের কাগজটা মেঘনাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললাম, ভাবতে পারিস মেঘনাদ, এভাবে আমাদের দেশের মত প্রাচীন শিল্পসম্পদ কিছু লোভী মানুষ সুযোগ পেলেই দেশের বাইরে পাচার করে চলেছে!

মেঘনাদ উত্তর দেবার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো, রিসিভার কানে তুলে মেঘনাদ বললো, হ্যালো, মেঘনাদ ভরদ্বাজ বলছি। টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে কে কি বললো ঠিক বোঝা গেল না, তবে মেঘনাদকে বলতে শুনলাম, ঠিক আছে, চলে আসুন...হ্যাঁ, এসব কথা সামনে বসে শোনাই ভাল, বলেই রিসিভার রেখে দিল।

জিগ্যেস করলাম, নতুন কোনো কেস মনে হচ্ছে?

মেঘনাদ হেঁয়ালি করে বললো, টালিগঞ্জে কাক মরলো, শ্যামবাজারে বৃষ্টি হলো।

তার মানে?

মানেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাবি। সুরিন্দর জয়সওয়াল আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়লো।

দুই

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। পরনে গুরু পাঞ্জাবি-ধুতি। আঙুলে দামী স্টোনের আঙটি। এক মুখ পান। পানের রস গড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটের ফাঁকে। ইনিই সুরিন্দর জয়সওয়াল। জয়সওয়াল স্টীল ইণ্ডাস্ট্রির বর্তমান মালিক।

আজ খবরের কাগজটা পড়ার পরই ভদ্রলোক ধাঁধায় পড়েছেন। তারপর আর উপায় না দেখে ছুটে এসেছেন রহস্যভেদী মেঘনাদের কাছে।

ভদ্রলোক সামনের সোফাটায় বসে বার বার শুধু একই কথা বলছেন। হায় রাম! এ হামার কি হলো! সত্যনাশ হোয়ে গেল মেঘনাদবাবু!

বেশ ভেঙে পড়েছেন। তা ভেঙে পড়ার কারণও আছে। যে প্রাচীন মুঘল চিত্রকর্মটি গতকাল দিল্লী বিমানবন্দরে কাষ্টমস অফিসারদের হাতে ধরা পড়েছে, ঠিক সেই চিত্রটিই নাকি পাচারকারী গোপী খুরানা গত এক মাস আগে সুরিন্দর জয়সওয়ালকে বিক্রি করেছিল নগদ তিন লাখ টাকার বিনিময়ে।

বলতে বলতে সুন্দির জয়সওয়াল প্রায় ডুকরেই কেঁদে উঠলেন।

মেঘনাদ তাঁর কান্নায় কান না দিয়ে বললো, কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে ওই একই ছবি গোপী খুরানা আপনাকে বিক্রি করেছিল?

আরে হাঁ বাবা। হামাদের হিন্দি কাগজে ছবির বর্ণনা আরও ভাল বেরিয়েছে। ওই একই ছবি। সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরির মুঘল পেণ্টিং। বেগমসাহেবা হারেমে বসে সাজগোজ করছেন। দারুণ ছবি মেঘনাদবাবু! লেকিন জাল ছবি।

এবার আমি বললাম, কিন্তু আপনার ছবিটাই যে জাল এক কথা আপনি ভাবছেন কেন সুরিন্দরজী? এমনও তো হতে পারে আপনাকে বিক্রি করা ছবিটাই আসল আর যেটা পাচার করা হচ্ছিল সেটাই.....

এ্যাবসার্ড। আমার কথা শেষ হবার আগেই সুরিন্দর জয়সওয়াল সামনের টি-পয়টার ওপর একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, সেই ব্যাটা জালিয়াত হামার মতো এক নভিস আদমীকে আসলি ছবি বিক্রি করে জাল ছবি পাচার করবে বিদেশে? না অর্ণববাবু, এ হতে পারে না। মেঘনাদবাবু, হাপনি কি বোলেন?

মেঘনাদ এতক্ষণ চোখ বুজে কি যেন ভাবছিল। জয়সওয়ালজীর কথার উত্তরে চোখ খুলে ওঁর দিকে তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করলো, এই গোপী খুরানা লোকটির সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে?

তাহলে গোড়া থেকেই সব বলি, শোনেন।

এরপর সুরিন্দর জয়সওয়াল ইনিয়ে বিনিয়ে যা বললেন তা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়—

কলকাতার বুকে সুরিন্দর জয়সওয়ালের ব্যবসা দু'পুরুষের। ওঁর বাবা হরিনাথ জয়সওয়াল পঞ্চাশ বছর আগে এ শহরে এসে একটি লোহালক্কড়ের ব্যবসা শুরু করেন। সেখান থেকে আজ সুরিন্দর জয়সওয়াল এক স্ট্রীল ইণ্ডাস্ট্রির মালিক হয়ে বাড়ি-গাড়ি সবই করেছেন।

এরপর জয়সওয়ালজীর সাধ হয়েছে একটু সংস্কৃতিবান হিসাবে খ্যাতি পেতে। এ শহরে ও ব্যাপারটার বড্ড কদর। কিন্তু রাতারাতি তো এসব আয়ত্তে আসে না। তাই এক্ষেত্রে শর্টকাট পথটাই বেছে নিলেন সুরিন্দর জয়সওয়ালজী। দেশ-বিদেশের দামী দামী বই কিনে বাড়ির গোটাকয়েক আলমারি বোঝাই করে ফেললেন আর দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেন বিশ্বের দুর্লভ কিছু পেণ্টিংস।

সেদিন কলকাতার এক বিখ্যাত প্রদর্শনী কক্ষে নামকরা চিত্রসংগ্রাহক জীবনলাল ভট্টাচার্যর সংগৃহীত চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন জয়সওয়ালজী। সেখানে উপস্থিত ছিল গোপী খুরানা। সে জীবনলালবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী। চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাটা সেই করেছিল কারণ জীবনলাল ভট্টাচার্য বয়সেই শুধু বৃদ্ধ নন, শারীরিকভাবেও পঙ্গু। হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরাই করতে পারেন না। তাই প্রদর্শনীর সব ব্যবস্থা বরাবর গোপী খুরানাই করে থাকে।

কথার মধ্যেই জিগ্যেস করেছিলাম, আচ্ছা, গোপী খুরানা নামটা শুনে তো পাঞ্জাবী বলেই মনে হচ্ছে।

সুরিন্দর জয়সওয়াল মুখের মধ্যে আর একটা পান গুঁজে বললেন, দূর মশাই, গোপী খুরানা নামেই পাঞ্জাবী। ভাষায় একটু গুরুমুখী টান ছাড়া ওর সব কিছুই একদম বাঙালীর মতো।

কিন্তু লোকটা যে জালিয়াত ত'তে কোনো সন্দেহ নেই। মেঘনাদ সোফায় হেলান দিয়ে বসে বললো।

সে কথা এখন বুঝছি মেঘনাদবাবু। তখন কি জানতাম? সুরিন্দর জয়সওয়াল মুখ কাঁচুমাচু করে বলে চললেন, লোকটা এত ধূর্ত যে হামার মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছিল মুঘল পেণ্টিংটাই হামার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে। তখন সে নিজেই এসে আমায় প্রস্তাব দিল।

প্রস্তাব?

হ্যাঁ, ওই রেয়ার কালেকশানটা ও জীবনলালবাবুকে লুকিয়ে হামায় চুপিচুপি বিক্রি করে দেবে যদি হামি তিন লাখ রুপিয়া দাম দিই।

সঙ্গে সঙ্গে আপনি রাজী হলেন, তাই তো?

হামার মাথায় ভূত চেপেছিল মেঘনাদবাবু। না হলে ওই লোভের ফাঁদে পা দিই? বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়সওয়ালজী বললেন, বিশ লাখ রুপিয়া দিলেও অমন মুঘল পেণ্টিং বাজারে মিলবে না। হামি খোঁজ নিয়েছি।

তাই তো রাজী হয়ে গেলাম। দিন কয়েকের মধ্যেই গোপী খুরানা টাকা গুনে নিয়ে পেন্টিংটি হামার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলো।

তারপার হুবহু একইরকম আর একটি ছবি আসল বলে বিদেশে পাচারের চেষ্টা করলো, তাই তো? বললো মেঘনাদ, কিন্তু যদি দুটি ছবির কোনোটিই আসল না হয়, তাহলেও আমি অবাক হব না সুরিন্দরজী।

সুরিন্দর জয়সওয়ালের সঙ্গে এবার আমিও চমকে উঠি, বলছিস কি মেঘনাদ?

অপেক্ষা কর বন্ধু, মেঘনাদের রহস্যময় হেঁয়ালি ভেসে এল, এ লঙ্কাকাণ্ডের সবে তো শুরু।

তিন

কলকাতার লেকটাউন এলাকায় জীবনলাল ভট্টাচার্যের নিজস্ব ফ্ল্যাট।

টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখে মেঘনাদ ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা করতে চাইতেই উনি রাজী হলেন। সেই দিনই বিকেলবেলা ওঁর ফ্ল্যাটের সামনে উপস্থিত হলাম আমরা দুজনে।

এর মধ্যে মেঘনাদের প্রথম অনুমানটি মিলে গেছে। অর্থাৎ সুরিন্দর জয়সওয়ালকে বিক্রি করা সেই দুর্মূল্য চিত্রটির কেমিক্যাল টেস্ট করে জানা গেছে চারশো বছর দূরে থাকুক, সে ছবির বয়স চার বছরও নয়। তবে বিশেষ কৌশলে এমন ভাবে সে ছবি আঁকা হয়েছে যাতে ছবিটি নকল বলে বোঝার সাধ্য অতি বড় চিত্রবিশেষজ্ঞেরও হবে না।

ফ্ল্যাটের কলিংবেলটা টিপতেই ভেতরে একটা মিষ্টি ডিংডং শব্দ হলো। দরজা খুলে দিল একটি অল্পবয়সী মেয়ে। দেখে কাজের মেয়ে বলেই বোধ হলো। মেঘনাদ নিজের পরিচয় দিতেই সে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালো।

ছিমছাম সাজানো ড্রইংরুম। সোফাসেট, টি-পয়। দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট বুককেস। তার ওপর সুন্দর একটি কিউরিও। তবে ঘরের মধ্যে সবচেয়ে আগে যেটা চোখে পড়ে তা হলো দেয়াল জোড়া একটা অয়েল পেন্টিং। ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক একটি শৌখিন চেয়ারে বসে আছেন। আশ্চর্য জীবন্ত ছবি, মনে হয় মানুষটি যেন এখুনি হেসে উঠে দাঁড়াবে।

কথাটা মেঘনাদকে বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ পেছনে ঘড়ঘড় শব্দ। ফিরে দেখি হুইল চেয়ারে বসে এক বৃদ্ধ নিজেই চেয়ারটা চালিয়ে ঘরে ঢুকেছেন। ভদ্রলোকের একহারা চেহারা। এক মাথা সাদা রুক্ষ চুল। দাড়ি গোঁফের বালাই নেই। কেউ বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না ইনিই জীবনলাল ভট্টাচার্য।

আমরা কিছু বলার আগেই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দু' হাত জোড় করে মেঘনাদের উদ্দেশ্যে বললেন, নমস্কার, আপনি নিশ্চয়ই রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ? তারপর

আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, আপনিই তো অর্ণব সেন, শার্লক হোকসের যেমন ওয়াটসন!

জীবনলালবাবুর কথার ধরনে না হেসে পারি না।

মেঘনাদবাবু, আপনার ফোন পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। কদিন থেকেই ভাবছিলাম আমি নিজেই আপনাকে ফোন করবো। বুঝতেই পারছেন, খোঁড়া মানুষ, চলাফেরার সামর্থ বিশেষ নেই।

মেঘনাদ কিন্তু ভদ্রলোকের এই উচ্ছ্বাসে তেমন আমল না দিয়ে সামনের দেয়াল জোড়া অয়েল পেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে বললো. অসাধারণ আপনার আঁকা। ওই একটি ছবিই বলে দেয় কত উঁচু দরের শিল্পী আপনি।

জীবনলালবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু দেখলাম মেঘনাদের প্রশংসা শুনে ওঁর মুখে একটা বিষন্নতার ছায়া চকিতে উঠে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে আমরা সোফায় বসেছি। সামনের টি পয়টায় কফি রেখে গেছে কাজের মেয়েটা।

মেঘনাদ কফির কাপ হাতে তুলে নিয়ে বললো, যদি কিছু না মনে করেন তো জিজ্ঞেস করি আপনার পা দুটো কিভাবে নষ্ট হলো?

কার এ্যাকসিডেণ্টে। জানেন কি আমার আদি বাড়ি ছিল বিহারের দ্বারভাঙ্গায়?

হ্যাঁ, শুনেছি।

শুনেছেন? একটু যেন বিস্মিত হন জীবনলালবাবু। তারপর বলেন, তাহলে এটাও জেনেছেন বছর দশ আগে এক রোড এ্যাকসিডেণ্টে আমি একই সঙ্গে আমার স্ত্রী আর আমার একমাত্র ছেলেকে হারাই। সেই সঙ্গে নিজের পা দুটিও পঙ্গু হয়। তারপরই দ্বারভাঙ্গায় আমার পিতৃপিতামহের ভিটেমাটি বেচে দিয়ে চলে এসেছি কলকাতায় এই লেকটাউনের ফ্ল্যাটে। এখন আমি একা—সম্পূর্ণ একা।

জীবনলালবাবু যখন তাঁর জীবনের কথা বলছিলেন আমি তাকিয়েছিলাম ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের মুখ চোখে একটা চাপা অসহায়তা আর অভিমান আছে। অথচ এই বয়সেও ভারী মিষ্টি চেহারা। বয়সও ঠিক বোঝা যায় না—ষাট থেকে আশি যে কোনো একটা সংখ্যা হতে পারে।

জীবনলালবাবু, আপনি আমায় ফোন করার কথা ভেবেছিলেন কেন সেটাই বরং আগে বলুন। মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো।

হ্যাঁ, কথাটা গুরুতর। হয়তো ব্যাপারটা পুলিশকেই আগে জানান উচিত ছিল, কিন্তু মনে হলো আপনিই আমায় যথার্থ সাহায্য করতে পারবেন।

আপনি কি সেই বিখ্যাত মুঘল পেন্টিংটির চুরির ব্যাপারে বলছেন?

হ্যাঁ, বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়লেন জীবনলালবাবু, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তবে এই বিশেষ সংগ্রহটা আমার নয়, আমার ঠাকুর্দার। বাবাও একজন আগ্রহী প্রাচীন চিত্রসংগ্রাহক ছিলেন। আমার স্টুডিওর বেশির ভাগ ছবি তাঁরই সংগ্রহ করা।

হুঁ, মেঘনাদ জীবনলালবাবুর কথাটা শেষ হওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তারপর বললো, কিন্তু আপনি কি জানেন, যে ছবিটা দিল্লী কাস্টমস অফিসারদের হাতে ধরা পড়েছে সেটা আসল নয়। হুবহু জাল করা একটা ছবি।

হ্যাঁ, জানি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জীবনলাল ভট্টাচার্য বললেন, আর এও জানি অমন জাল ছবি গোপী খুরানা শুধু একটাই নয়, বেশ কয়েকটি কয়েকজনকে বিক্রি করেছে।

আমি চমকে উঠি। জীবনলালবাবু এ তথ্য জানলেন কোথা থেকে! সুরিন্দর জয়সওয়ালের কথা তো মেঘনাদ এখনও ওঁকে বলেনি।

গতকাল দিল্লী থেকে সি বি. আই ইনসপেক্টর মিঃ রাজেন্দ্র শ্রীনিবাসন ফোন করেছিলেন। উনিই জানালেন সেই মুঘল পেন্টিং-এর আর একটা জাল কপি নাকি পাওয়া গেছে পুনায় একজন চিত্র সংগ্রাহকের কাছে। গোপী খুরানা তাঁকে ছবিটি বিক্রি করেছিল, মাত্র পনের দিন আগে।

আশ্চর্য! মেঘনাদ অস্ফুট ভাবে বললো।

আশ্চর্য নয় মেঘনাদবাবু। গোপী খুরানার স্বভাব সম্বন্ধে এখন যা খবর পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে এ ধরনের কাজ করা ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মিঃ শ্রীনিবাসনকেও সেই কথাই বলেছি। হয়তো এতক্ষণে উনি কলকাতাতেও এসে পড়েছেন। একে নিশ্বাসে কথাগুলো বললেন জীবনলালবাবু।

গোপী খুরানা এখন কোথায়? কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে মেঘনাদ এবার মূল প্রশ্নটা করলো।

সে পালিয়েছে। তাকে বিশ্বাস করে আমি আমার স্টুডিও আর সংগ্রহের সমস্ত ছবি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে তার উপযুক্ত মূল্যই দিল। স্টুডিওর সবচেয়ে মূল্যবান পেন্টিংটা সে শুধু চুরিই করেনি, সেটাকে জাল করে আসল বলে বিক্রি করেছে দেশের নানা শিল্পরসিক মানুষদের কাছে। অথচ জানেন, এই গোপী খুরানাকে যাকে বলে রাস্তা থেকে তুলে এনে আমি বড় করেছিলাম। নিজের হাতে আঁকা শিখিয়েছি। তারপর বিশ্বাস করে আমার ভাণ্ডারের সব দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়েছি। এখন বুঝতে পারছি দুধ-কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলাম . উত্তেজনায় আর কথা শেষ করতে পারলেন না জীবনলালবাবু।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো মেঘনাদ, তারপর বললো, গোপী খুরানার সঙ্গে শেষবার কবে দেখা হয়েছিল আপনার?

দিন সাতেক আগে, বোম্বাই শহরে ছবির প্রদর্শনী সেরে আসার পরে। এসব প্রদর্শনীর ব্যাপারে কিছুকাল যাবৎ ওর অত্যধিক উৎসাহ লক্ষ্য করতাম। আমি বাধা দিইনি।

এবারে প্রদর্শনীর পর ওই বিশেষ ছবিটা ছিল কিনা দেখেছেন? মেঘনাদ একটা সিগারেট ধরাল।

আগেই বলেছি ওর ওপর আমার একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার ফিরে আসার পর ওর ব্যবহারে কেমন একটা পরিবর্তন দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎই কোনো কিছু না বলে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তখন স্টুডিওতে ছবির স্টক মেলাতে গিয়েই দেখতে পেলাম সেই মুঘল পেন্টিংটা ও আরো কয়েকটা ছবি নেই। কি করবো ভাবছি ঠিক সেই সময় কাগজে বেরুল দিল্লীর পালাম এয়ারপোর্টে কাস্টমস অফিসারদের হাতে পড়েছে ছবিটা।

হুঁ! মেঘনাদ একটু সময় চুপচাপ কি যেন চিন্তা করলো, তারপর বললো, আচ্ছা, গোপী খুরানার আত্মীয়-স্বজন কোথায় কে আছে জানেন?

আত্মীয়-স্বজন বলতে ভূ-ভারতে ওর কেউ আছে বলে তো জানি না। ওর পূর্বপুরুষের বাস ছিল লাহোরে। দেশ ভাগের বছর কয়েক পরে সদ্যোজাত গোপীকে নিয়ে ওর মা চলে আসন ভারতবর্ষে। যখন উনি মারা যান তখন গোপী খুব ছোট। রাস্তার ওপর খড়ি দিয়ে ছবি এঁকে ভিক্ষে করতো। ওর মধ্যে শিল্পপ্রতিভার সম্ভাবনা দেখে আমি ওকে তুলে এনেছিলাম। তখন কি কল্পনাও করতে পেরেছি ও তার প্রতিভাকে জালিয়াতির কাজে লাগাবে? বলতে বলতে আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জীবনলাল ভট্টাচার্য।

গোপী খুরানার একটা সাম্প্রতিক ফটো দিতে পারেন, যদিও চেহারার একটা বর্ণনা কাগজেই পড়েছি। মেঘনাদ বললো।

হ্যাঁ, ওর অনেক ফটো আমার আছে। বলতে বলতে জীবনলালবাবু হুইল চেয়ারটা চালিয়ে নিয়ে গেলেন ঘরের দেয়ালের কাছাকাছি বুক সেলফটার কাছে। ওখানে একটা ড্রয়ার খুলে বার করলেন একটা খাম। তার মধ্যে থেকে একটা ফটো নিয়ে মেঘনাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটাই তার সর্বশেষ ফটো। মাত্র এক মাস আগে তোলা।

তাকিয়ে দেখলাম পাশাপাশি দুজনের ছবি। এই ঘরেই হুইল চেয়ারে বসে রয়েছেন জীবনলালবাবু, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গোপী খুরানা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে চশমা।

জীবনলাল ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাট থেকে চলে আসার আগে ওঁর স্টুডিওটা ঘুরে দেখলাম। দেখে মুগ্ধ হয়েছি। দেয়াল জুড়ে সব মূল্যবান চিত্র। অনেকগুলি বেশ পুরনো। দেখলেই বোঝা যায় বহু বছর ধরে এগুলি দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি জীবনলাল ভট্টাচার্যের নিজের হাতে আঁকাও কিছু চিত্র রয়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই একসময়ে গুণী শিল্পী ছিলেন। যে ছবিটি গোপী খুরানা চুরি করেছে দেয়ালে সে ছবির জায়গাটা ফাঁকাই পড়ে রয়েছে দেখলাম।

হুইল চেয়ারে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে জীবনলালবাবু বললেন, মেঘনাদবাবু, ওই চুরি যাওয়া ছবিটা আমার ভীষণ প্রিয় ছিল। যদি সেটা ফিরিয়ে এনে দিতে পারেন, আপনার ইচ্ছেমতো পারিশ্রমিক দিতে আমি রাজী।

মেঘনাদ কোনো জবাব দেয়নি। ওর ঠোঁটের কোণে শুধু ফুটে উঠেছে সেই দুর্বোধ্য হাসিটা—যে হাসির রহস্য আজও আমার অজানা!

চার

দিন দুয়েক বাদে মিঃ শ্রীনিবাসন মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

মিঃ শ্রীনিবাসন সি. বি. আই-এর দিল্লী অফিসের একজন সিনিয়ার ইন্সপেক্টর। জাল ছবির রহস্যভেদের তদন্তেই তিনি কলকাতায় এসেছেন। কারণ ইতিমধ্যেই এ খবর তাঁদের কাছে পৌছে গেছে যে ছবি-জালিয়াত গোপী খুরানার ঘাঁটি ছিল কলকাতায়।

মেঘনাদের আর একটা অনুমানও সত্য হয়েছে। মুঘল পেন্টিং এর আরও একটা জাল পাওয়া গেছে। তার মানে এই নিয়ে একই ছবির চারটি জাল কপি চারজনকে বেশ চড়া দামে বিক্রির খবর পাওয়া গেল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছবির বিক্রেতা একই লোক—জীবনলাল ভট্টাচার্যের সেই একদা বিশ্বাসী সেক্রেটারী গোপী খুরানা।

আমি বললাম, যদি সেদিন দিল্লী এয়ারপোর্টে জাল ছবি না ধরা পড়তো তবে বোধকরি এ জালিয়াতিটা ধরে ফেলা সম্ভব হতো না।

মেঘনাদ হেঁয়ালি করে বললো, এমনও তো হতে পারে বন্ধু, গোপী খুরানাই চেয়েছিল ওই জাল ছবি ধরা পড়ুক এবং সারা দেশের লোক ব্যাপারটা জানুক।

এবার শুধু আমি নয়, সামনে বসা মিঃ শ্রীনিবাসনও অবাক হলেন, বললেন, এ আপনি কি বলছেন মিঃ ভরদ্বাজ, কোনো জালিয়াতের পক্ষে এমন কাজ করা কি সম্ভব?

মেঘনাদ ততক্ষণে প্রসঙ্গ বদলে ফেলেছে।

নিজের চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, মিঃ শ্রীনিবাসন, এ কেসে যদি আপনি সত্যিই আমার সাহায্য চান, তবে একটা খবর আমায় চটপট যোগাড় করে দিতে হবে।

হ্যাঁ, বলুন, এ কেসে আপনার পরামর্শ ও সবরকম সাহায্যের জন্য ওপরতলা থেকে জরুরী নির্দেশ আছে। বলুন, আমায় কি করতে হবে?

মেঘনাদ তার বুক পকেট থেকে জীবনলাল ভট্টাচার্য আর গোপী খুরানার জয়েন্ট ফটোর একটা কপি এগিয়ে দিয়ে বললো, এই দুজনের অতীত জীবন সম্পর্কে সমস্ত খবর আমার চাই।

তিনদিনের মধ্যে খবর পাবেন। বলতে বলতে মিঃ শ্রীনিবাসন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আরও দু'একটা কথার পর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মিঃ শ্রীনিবাসন চলে যেতেই মেঘনাদ বললো, অর্ণব, টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে শ্রীমন্ত স্টুডিওর ফোন নম্বরটা বার করে একটা রিং কর তো। ওর মালিক

শ্রীমন্ত সরকার আমার পুরনো বন্ধু। ওকে এসময়ে আমার খুব দরকার।

পাঁচ

ইতিমধ্যে কয়েকটি দিন কেটে গেছে। এই কদিনে মেঘনাদের সঙ্গে একেবারেই দেখা হয়নি। ও ভীষণ ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মেঘনাদের ঘরে ঢুকে দেখলাম ও সোফার ওপর বসে সামনে দুটো পোস্টকার্ড সাইজের ফটো পাশাপাশি রেখে চোখ বুজে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তবু মেঘনাদ আমার উপস্থিতি টের পেল না। নিঃশব্দে ফটো দুটোর দিকে তাকালাম—একজন জীবনলাল ভট্টাচার্য, অন্যজন গোপী খুরানা। ঠিক তক্ষুনি মেঘনাদ চোখ খুলে তাকাল, কিন্তু আমায় দেখেও ওর মুখে কোনো কথা ফুটলো না। অগত্যা আমিই বললাম, তুই বুঝি তোর বন্ধুর 'শ্রীমন্ত স্টুডিও' থেকে জয়েন্ট ফটোর ছবি দুটি আলাদা করে এনলার্জ করে নিলি?

হুঁ। মেঘনাদ এখনও কেমন অন্যমনস্ক।

সামনের সোফাটায় জুত করে বসে বললাম, তবে যাই বলিস মেঘনাদ, গোপী খুরানা জালিয়াত হলেও একজন প্রতিভাধর শিল্পী সন্দেহ নেই। না হলে এমন নিখুঁত ভাবে আসল ছবি জাল করতে পারে! খাজা আবদুস সামাদের আঁকার পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ তো করেইছে এমনকি প্রাচীন ছবির বিবর্ণতাটুকুও তুলে ধরেছে।

প্রসঙ্গতঃ ইতিমধ্যে একদিন আমরা দুজনে সুবিন্দর জয়সওয়ালের গড়িয়াহাটের বাড়িতে গিয়ে সেই জাল ছবিটি দেখে এসেছি।

মেঘনাদ কিন্তু আমার এতসব কথাকে বিশেষ পাত্তা দিল না। বললো, একটু আগে ইন্সপেক্টর তলাপাত্র এসেছিলেন।

ইন্সপেক্টর তলাপাত্র! মানে আমাদের দি গ্রেট মিঃ তলাপাত্র? তুই বোধহয় ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলি?

হ্যাঁ, আমাদের পুরনো বন্ধু বলে কথা—

রিন্.. রিন্...রিন্. মেঘনাদের কথার মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠলো। মেঘনাদ রিসিভার তুললো ঃ

হ্যালো...কে, মিঃ শ্রীনিবাসন?...

কি বললেন—বিহারের দ্বারভাঙ্গায় জীবনলাল ভট্টাচার্যের অতীত সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?. .সব খবর ঠিক?...আর গোপী খুরানা?...কি বললেন, তার খবর ও তল্লাটে কেউ দিতে পারলো না?...না, মিঃ শ্রীনিবাসন, আপনার আর আপাততঃ কিছু করার নেই...বাকিটা আমিই করবো.. হ্যাঁ, ঠিক সময়ে আপনাকে জানাব...ও

কে...থ্যাঙ্ক ইউ।

মেঘনাদ রিসিভার রাখলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কিছু বুঝলি?

বোকার মতো শুধু ঘাড়টা নেড়ে বললাম, না।

আমিও সবটা বুঝিনি। তবে বাকিটা হয়তো শীগগিবই বুঝতে পারবো।

আমার সব কিছু কেমন গুলিয়ে গেল। তবে মেঘনাদের দুচোখের দৃষ্টি দেখে এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না—রহস্যভেদী মেঘনাদ শিকারের গন্ধ পেয়েছে।

ছয়

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মেঘনাদের কোনো খোঁজ পেলাম না। কোথায় ঘুরে বেড়াল কে জানে। তারপর সন্ধ্যেবেলা ও নিজেই আমায় ফোন করলো।

ফোন ধরতেই ওধার থেকে মেঘনাদ বললো, বন্ধু, আগামীকাল সকালের দিকে তৈরি থেকো। আশা করছি জাল ছবির রহস্যের যবনিকাপাত ঘটাতে পারবো।

জিগ্যেস করলাম, গোপী খুরানার খোঁজ পাওয়া গেছে?

উঁহু, এক্ষুণি আর কিছু বলা যাবে না। তবে আগামীকাল সকাল ঠিক এগারোটায় আমরা জীবনলাল ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাটে যাব। ইন্সপেক্টর তলাপাত্রও সঙ্গে থাকবেন। মিঃ শ্রীনিবাসনকেও জানিয়েছি।

ব্যাপারটা কি আর একটু খুলে বলা যাবে না? ফোনের মধ্যেই আমি আগ্রহ না জানিয়ে পারি না, জীবনলালবাবু কি তাহলে নিজেই গোপী খুরানাকে কোনোভাবে হাপিস করেছেন!

তাতে জীবনলালবাবুর স্বার্থ কি?

এমনও তো হতে পারে, জীবনলালবাবু নিজেই গোপী খুরানাকে দিয়ে ওই জাল ছবিগুলি বিক্রি করিয়েছেন, তারপর ...

আমার কথা আর শেষ হলো না, তার আগেই ও পাশ থেকে মেঘনাদের হাসি শুনলাম। ও চিমটি কাটা গলায় বললো, বন্ধু, বামন হয়ে এত সহজে রহস্যের চাঁদটিকে ধরবার চেষ্টা করো না। অপেক্ষা করো, আগামীকালই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। বলেই মেঘনাদ ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

অগত্যা এবারও আমার কিল খেয়ে কিল হজম করার দশা!

সাত

আমার হাত ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা—আমরা জীবনলাল ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপলাম। আমরা অর্থে মেঘনাদ, আমি আর ইন্সপেক্টর তলাপাত্র।

বাইরে থেকেই শুনতে পেলাম সুরেলা ধ্বনিতে ভেতরে কলিংবেল বাজলো। তার একটু পরেই আগের দিনের সেই কাজের মেয়েটা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মুখ

বাড়াল।

জীবনলালবাবু আছেন?

হ্যাঁ। ভেতরে এসে বসুন। আমি খবর দিচ্ছি।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। আগের দিনও এখানেই বসেছিলাম। মেঘনাদ গিয়ে দাঁড়াল সামনের দেয়ালের সেই বিরাট অয়েল পেন্টিংটার কাছে। কিন্তু ছবিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে এত কি দেখছে ও? কথাটা জিগ্যেস করার আগেই মেঘনাদ আমার দিকে তাকাল, অর্ণব, লক্ষ্য কর, ওই বড় ছবিটা খুব সম্প্রতি নিচে নামিয়ে আবার নতুন করে টাঙান হয়েছে!

কি করে বুঝলি?

দৃষ্টি থাকলে ঠিকই বোঝা যায়। দেখ না, নতুন করে টাঙান হয়েছে বলেই ঠিক আগের জায়গায় ছবিটা নেই। আর সে কারণেই দেয়ালে ছবির আগের দাগটা দেখা যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর তলাপাত্র, আপনি কি বলেন?

ইন্সপেক্টর তলাপাত্র ততক্ষণে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন মেঘনাদের পাশে। ওর কথার উত্তরে উনি শুধুমাত্র ওঁর পুরনো অভ্যেস মতো নাক দিয়ে 'ফোঁড়ৎ' করে একটা শব্দ বার করলেন।

নমস্কার। সুস্বাগতম।

তিনজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকালাম। আমাদের কথার মধ্যেই জীবনলাল ভট্টাচার্য কখন যে নিঃশব্দে হুইল চেয়ার চালিয়ে ঘরে ঢুকেছেন লক্ষ্য করিনি।

বিগলিত হেসে জীবনলালবাবু বললেন, মনে হচ্ছে বিশেষ কোনো খবর আছে। তাই একেবারে পুলিশ নিয়ে মেঘনাদবাবু এসেছেন।

মেঘনাদও যথাযোগ্য বিনয়ী কণ্ঠেই জবাব দিল, ইন্সপেক্টর তলাপাত্র আমার বিশেষ বন্ধু। তাছাড়া আপনি তো বোঝেনই আমার মতো একজন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের পাশে একজন সরকারী আইনরক্ষক না হলে চলে না।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর তলাপাত্র তাঁর স্বভাবগত 'ফোঁড়ৎ' আওয়াজে তা সমর্থন করলেন।

একটু যেন গম্ভীর হলেন জীবনলাল ভট্টাচার্য। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, কিন্তু কাজ কতদূর এগুলো? এ পর্যন্ত গোপী খুরানার কোনো খবর পাওয়া গেল?

হ্যাঁ, পাওয়া গেছে, এবার কথা বললেন ইন্সপেক্টর তলাপাত্র। নিজের পুরুষ্ট গোঁফের প্রান্ত দুটি পাকাতে পাকাতে বললেন, আপনি শুনলে খুশি হবেন, আপনার সেই বিশ্বাসঘাতক জালিয়াত সেক্রেটারী গোপী খুরানাকে অবশেষে আমরা খুঁজে পেয়েছি।

মনে হলো কথাটা শুনে জীবনলাল ভট্টাচার্য প্রথমটা কিছুটা বিস্মিত হলেন, কিন্তু তা কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তরপরই উনি মুখে একটা দারুণ খুশির ভাব ফুটিয়ে বললেন, এ তো দারুণ খবর! তা কোথায় ধরা পড়লো সেই বদমাশ!

না, ধরা সে এখনও পড়েনি। তবে আর খুব বেশি সময় লুকিয়ে থাকতেও

পারবে না। মেঘনাদ খুব স্বাভাবিক ভাবে কথাটা বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, জীবনলালবাবু, আজ আপনার ছবির স্টুডিওটা আর একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। বিশেষ করে আমাদের এই বন্ধুটি পুলিশ হলে কি হয়, রীতিমতো চিত্র-অনুরাগী।

মেঘনাদের সমর্থনে আবার ইন্সপেক্টর তলাপাত্রর নাকের সেই 'ফোঁড়ৎ' আওয়াজ!

সানন্দে। জীবনলালবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনাদের মতো বুদ্ধিমান গুণগ্রাহীদের আমার এসব ছবি যতবার দেখাতে পারি ততবারই আমার আনন্দ। আসুন আপনারা।

বলতে বলতেই উনি এগুলেন। পেছনে আমরাও চললাম।

আট

বাবোশো স্কোয়ার ফুটের সবচেয়ে বড় ঘরটাই জীবনলাল ভট্টাচার্য তাঁর স্টুডিও হিসাবে সাজিয়ে রেখেছেন। এর আগের দিন এসে এখানে এক পাক ঘুরে গিয়েছিলাম মাত্র। আজ দেখলাম মেঘনাদ বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টুডিওর প্রতিটি আনাচ কানাচ লক্ষ্য করছে।

আমরা যখন ছবিগুলি দেখছি জীবনলাল ভট্টাচার্য ঘরের দরজার পাশে তাঁর হুইল চেয়ারে বসে চুপচাপ আমাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। আমাদের বিস্ময় স্বভাবতই ওঁকে বিশেষ আত্মতৃপ্তি দিচ্ছিল।

বেশ কিছুটা সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর মেঘনাদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। জীবনলালবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা জীবনলালবাবু, বলতে পারেন আপনি নিজে শেষ ছবি এঁকেছিলেন কবে?

বছব দশেকের এদিকে নয়। ড্রইংরুমের দেয়ালে আমার যে প্রতিকৃতিটা আছে ওটাই আমার আঁকা শেষ ছবি। তারপর আমার জীবনের সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা তো আপনাকে বলেছি মেঘনাদবাবু...

জীবনলালবাবুর স্টুডিও দেখা শেষ করে এরপর আবার আমরা ওঁর ড্রইংরুমে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ গুমোট হতে শুরু করেছে। জীবনলালবাবুই স্তব্ধতা ভাঙলেন, ইন্সপেক্টর তলাপাত্র, আপনি কি আজ নেহাতই আমার স্টুডিও দেখতে এসেছিলেন, না, রথ দেখার সঙ্গে কলাবেচার মতো ব্যাপার কিছু আছে?

আপনি বুদ্ধিমান জীবনলালবাবু তাই সত্যি কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি, ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের আগেই উত্তরটা দিল মেঘনাদ, আজ আমরা এসেছি আপনার জালিয়াত সেক্রেটারী গোপী খুরানাকে গ্রেফতার করতে।

গোপী খুরানা! কোথায় সে? তার সন্ধান কি সত্যিই পেয়েছেন? জীবনলালবাবু

বেশ চঞ্চলভাবেই প্রশ্নটা করলেন।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ওর এই ভঙ্গির সঙ্গে আমি পরিচিত। বাঘ শিকার ধরার আগে বোধহয় এমনই সর্তক হয়ে ওঠে।

খট্!

মেঘনাদ হাতের এ্যাটাচিটা খুলে পোস্টকার্ড সাইজের দুটি ফটো বার করে সামনের টি-পয়ের ওপর পাশাপাশি রাখলো। ফটো দুটো মেঘনাদের ঘরে আগেই দেখেছি। এর একটা ফটো জীবনলালবাবুর, অন্যটি গোপী খুরানার।

ফটো দুটো দেখেই চমকে উঠলেন জীবনলালবাবু, একি! এ দুটো ফটো আপনি কোথায় পেলেন?

ভুলে গেলেন, এ তো দিন কয়েক আগে আপনিই দিয়েছেন জীবনলালবাবু। তবে একই ফটোতে আপনারা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন। তা থেকে আমি আলাদা করে এনলার্জ করিয়েছি। মেঘনাদ খুব শান্ত স্বরে কথাটা বলে ওর এ্যাটাচি থেকে একটা জিরো নম্বর তুলি, আর একটা ছোট্ট কালো তরল ভরা শিশি বার করলো।

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু জীবনলালবাবু দেখছি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। উনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, আপনি এখন কি করতে চান?

মেঘনাদ অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে বললো, আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার ছবির মুখটিতে আমি কিছু শিল্পকর্ম করতে চাই। যদিও আপনার মতো কুশলী শিল্পী আমি নই, তবু

বলতে বলতে মেঘনাদ তুলিটা শিশির কালো তরলের মধ্যে ডুবিয়ে নেয়। কিন্তু তুলির কালো রঙ ছবির মুখে ছোঁয়াবার আগেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন জীবনলালবাবু, না, না, মেঘনাদবাবু ও কাজ আপনি করবেন না। আপনি আমার ছবির মুখকে বিকৃত করবেন না। আমি সহ্য করতে পারবো না।

মেঘনাদ এতটুকু নিবৃত্ত না হয়ে বললো, কিন্তু জীবনলালবাবু যদি বলি এ কোনো সাধারণ তুলি নয়। এতে জাদু আছে। আমি প্রমাণ করবো এই তুলির স্পর্শে খুব সহজেই একটি মানুষের মুখকে অন্য মুখে রূপান্তরিত করা যায়..

এবার আর মেঘনাদের কথা শেষ হয় না, তার আগেই এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায় চোখের সামনে। জীবনলাল ভট্টাচার্য তাঁর হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন মেঘনাদের ওপর। এক ঝটকায় কেড়ে নেন ওর হাতের তুলি।

ওই অবস্থাতেও বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ করলো না মেঘনাদ, কোনোরকম বাধাও দিল না, শুধু বললো, তাহলে জীবনলালবাবু, সত্যিই আপনি পঙ্গু নন।

এই তো দিব্যি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাই তো! সত্যিই অবাক কাণ্ড! জীবনলাল ভট্টাচার্য উত্তেজনার বশে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাঁর পা দুটিতে কোনো ত্রুটিই নেই। সুস্থ মানুষের মতোই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মধ্যে।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র—জীবনলালবাবু আবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেন হুইল চেয়ারের দিকে। কিন্তু সে অবকাশ তাঁকে দেওয়া হলো না। তার আগেই হুইল চেয়াবটি গার্ড করে দাড়িয়ে পড়েছেন ইন্সপেক্টর তলাপাত্র। তাঁর কণ্ঠে রীতিমতো পুলিশি ধমক, উঁহু, মিঃ ভট্টাচার্য, আবার নতুন কবে খোঁড়া সাজার চেষ্টা কবে লাভ হবে না। তার চেয়ে যেমন আছেন, তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। আর মেঘনাদবাবু, আপনি বরং আপনার শিল্পকর্মের জাদুটি আমাদের দেখান। বলতে বলতেই নাক থেকে 'ফোঁড়ৎ' করে আওয়াজ ছাড়লেন ইন্সপেক্টর।

এরপর জীবনলালবাবু আর কোনো রকম নড়াচড়া করলেন না। কেমন যেন নিস্পন্দ ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হুইল চেযারটার সামনে। ওঁর দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই।

মেঘনাদ খুব দ্রুত ওর শিল্পকর্ম শেষ করে ফেললো। জীবনলালবাবুর পোস্টকার্ড সাইজের ফটোব মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গোঁফ আর চশমাটা বসিয়ে দিতেই যে রূপ ফুটে উঠলো তা আমাদের অচেনা নয়—সে গোপী খুরানা।

হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ছবিতে যেটুকু পার্থক্য ছিল মেঘনাদ নাকের ওপর কালো তিলের দাগটা দিতেই হুবহু মিলে গেল।

হঠাৎ ধপ্ করে শব্দ। চমকে তাকিয়ে দেখি জীবনলাল ভট্টাচায মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছেন। ওঁব মুখ দিয়ে ফ্যানা বেরুচ্ছে। দুচোখ বিস্ফারিত। চোখের মণি স্থির।

ইন্সপেক্টর তলাপাত্র এক লাফে জীবনলালবাবুর সামনে পৌঁছে ওঁর কব্জিটা ধরলেন। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সিভিয়ার সেলিব্রাল এ্যাটাক। এ্যারেস্ট করার সময়টুকুও দিলেন না।

মেঘনাদকে এভাবে ভেঙে পড়তে আগে কখনও দেখিনি।

নয়

মেঘনাদকে জিগ্যেস করলাম ... কি হলো বল তো মেঘনাদ?

মেঘনাদ ওর ড্রইংরুমের সোফায় গা এলিয়ে বসে বললো, ব্যাপারটা বোঝা তো এমন কিছু নয়। গোপী খুরানা নামে কোনো মানুষেব অস্তিত্ব কোনোদিনই ছিল না। সেটা জীবনলাল ভট্টাচার্যেরই আর এক রূপ।

ছদ্মবেশ?

হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। আসলে নিজেরই আর একটা আলাদা পরিচয় তৈরি

করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিত্রসমালোচক এবং ধনী চিত্রসংগ্রাহকদের একের পর এক ঠকিয়ে যাচ্ছিলেন উনি। শুধু কি তাই, একই ছবি জাল করে পাঁচজনকে পর্যন্ত বিক্রি করেছেন।

সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার। জীবনলাল ভট্টাচার্যের মতো একজন প্রতিভাধর শিল্পীর পক্ষে এসব জালিয়াতি কথা ভাবা যায় না। ওঁর ওপর যাতে কোনোরকম সন্দেহ না পড়ে সেজন্যে দিনের পর দিন খোঁড়া সেজে ঘরে বসে অভিনয় পর্যন্ত করেছেন। ইন্সপেক্টর তলাপাত্রও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না।

এমনকি একই ফটোর মধ্যে পাশাপাশি দুটি ছবি নিপুণভাবে সুপার ইমপোজ করে আমার হাতে দিয়েছিলেন যাতে দুজনে যে আদতে একই ব্যক্তি তা কোনোভাবে যেন ভাবতে না পারি, মেঘনাদ বললো।

জাল ছবির রহস্যভেদ সম্পূর্ণ হয়েছে। মেঘনাদের কথা মতো জীবনলালবাবুর স্টুডিওর দেশী-বিদেশী ছবিগুলির কেমিক্যাল এ্যানালেসিস করে জানা গেছে ওর মধ্যে বেশির ভাগই আসল ছবি নয়। কিন্তু এত নিঁখুত অঙ্কনরীতিতে সেগুলি আঁকা আর ছবিকে পুরনো দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, বড় বড় চিত্রসমালোচকের সাধ্য কি আসল-নকলের পার্থক্য বার করে। এ জন্য ছবির রঙে বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন জীবনলালবাবু।

এত বড় জালিয়াতি কেন করলেন ওঁর মতো প্রতিভাধর একজন শিল্পী? শুধুই কি অর্থের লালসায়? প্রশ্নটা মেঘনাদকে না করে পারলাম না।

মেঘনাদ তখন ঘরের জানলাটার সামনে দাঁড়িয়েছে। আমার কথার উত্তরে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ তাকিয়ে রইলো বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে, তারপর বললো, ওঁর জীবনের সেই আশ্চর্য কাহিনী আমি সংগ্রহ করেছি অর্ণব। একই সঙ্গে তা বড় করুণ।

একটু থেমে মেঘনাদ আবার বলতে শুরু করলো, বিহারের প্রবাসী জীবনলাল ভট্টাচার্যের দাদু ছিলেন শুধুই একজন চিত্রপ্রেমী ও সংগ্রাহক। কিন্তু নাতি জীবনলাল ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকাতে ভালবেসে ছিলেন। স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে একজন নামকরা চিত্রশিল্পী হবেন। এ জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে ছবি আঁকা শিখলেন। প্রতিভাও তাঁর ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানাভাবে চেষ্টা করেও তাঁর সে প্রতিভা অভিজাত শিল্পী সমালোচক মহলে স্বীকৃতি অর্জন করতে পারলো না। দিনের পর দিন অবহেলা আর বঞ্চনায় তাঁর মনের মধ্যে জন্ম নিল দুরন্ত এক অভিমান। প্রতিশোধের বাসনা আগুন হয়ে জ্বলে উঠলো হৃদয়ে। এর মধ্যে জীবনে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একই দিনে মারা পড়লো তাঁর স্ত্রী আর একমাত্র পুত্র। শারীরিক দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলেন জীবনলালবাবু। দ্বারভাঙ্গার পাট তুলে পাকাপাকি চলে এলেন কলকাতায়। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো তাঁর দ্বিতীয় জীবন।

দ্বিতীয় জীবন?

হ্যাঁ। গোপী খুরানা সেজে তিনি নিজের একটা দ্বিতীয় পরিচয় তৈরি করলেন। তারপর বিশ্বখ্যাত চিত্রকরদের অঙ্কনরীতির অনুকরণে একের পর এক জাল ছবি সৃষ্টি করে সেগুলি দেশের বিভিন্ন চিত্র-সংগ্রাহক ও চিত্র-অনুরাগীদের আসল বলে বিক্রি করতে শুরু করলেন। এইভাবে একই সঙ্গে অর্থসংগ্রহ আর শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়াব যে ব্যর্থতা তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেন।

কিন্তু একই ছবি পাঁচজনকে বিক্রি করার কারণ? আমি প্রশ্ন করলাম। আমার ধারণা এ কাজ যদি জীবনলাল না করতেন তবে বোধহয় তাঁর জালিয়াতি এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়তো না।

ঠিক কথা, ইন্সপেক্টর তলাপাত্র 'ফোঁড়ৎ' করে আবার একবার নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা বোধকরি আগে কখনও ঘটেনি।

ভুল! ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের কথা শেষ হবার আগেই বললো মেঘনাদ, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। তবে এ দেশে নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছর কয়েক বাদে ইউরোপে। ভ্যান মিগেরান নামে এক জালিয়াত চিত্রশিল্পীর সঙ্গে জীবনলাল ভট্টাচার্যের জীবনের অনেকটা মিল আছে।

ভ্যান মিগেরান?

হ্যাঁ। সেই জালিয়াত চিত্রকর সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের বিখ্যাত শিল্পী জাঁ ভার্মিয়ারের অঙ্কনরীতির হুবহু অনুকরণ করে বেশ কয়েকটি জাল ছবি এঁকে আসল বলে চালিয়েছিল। ইউরোপেব বিখ্যাত চিত্রসমালোচকরাও তার এই জাল চিত্রকর্ম অনেকদিন পর্যন্ত ধরতে পারেননি। আসলে সেই ভ্যান মিগেরান জীবনলালবাবুর মতোই ইউরোপের নামী চিত্র-সমালোচকদের ওপর এইভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তাকে শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার অভিমানে। পরবর্তীকালে সমালোচকরা স্বীকার না করে পারেননি ভ্যান মিগেরান এভাবে নিজেকে নষ্ট না করলে বিশ্বেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হতে পারত।

দশ

সেই দিনই রাতে দিল্লী থেকে মেঘনাদের উদ্দেশে সরকারীভাবে ধন্যবাদ বার্তা এল। সেই সঙ্গে পারিশ্রমিকের চেক। এর আগে মিঃ শ্রীনিবাসনও ব্যক্তিগতভাবে মেঘনাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাল ছবি রহস্যের মীমাংসার জন্যে। কিন্তু আমি জানি এর কোনোটিতেই মেঘনাদ খুশি হয়নি।

আমিও সেদিন সারারাত ঘুমোতে পাবিনি। বার বার মনে পড়েছে জীবনলাল ভট্টাচার্যের অদ্ভুত জীবন কাহিনী! বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পীর কি করুণ পরিণতি! এত কিছুর পবও তাঁকে গ্রেফতার করা যায়নি। তার আগেই মৃত্যু এসে তাঁর সব বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে।

এবাবও তিনি ফাঁকি দিয়েছেন।

বাঘের থাবা

এক

শীতের রাত।

গভীর ঘুমে মগ্ন শহর কলকাতা। জেগে আছে শুধু নিশাচরের দল। এই তো তাদের বিচরণের সময়।

আলিপুর চিড়িয়াখানার ছবিটাও একই রকম। সারাদিন দর্শক সমাগমের পর এখন নিথর নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে চিড়িয়াখানা প্রাঙ্গণ। শুধু খাঁচার কোটরে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে রাতজাগা প্যাঁচারা, আর বাইরের অন্ধকারের দিকে জ্বল জ্বলে চোখে তাকিয়ে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে অবিরাম পাইচারী করে চলেছে হিংস্র শ্বাপদের দল।

আঃ..আ...আ..আ...হ্ ।

হা.. উ...উ. ম্...ম...।

হঠাৎ রাতের স্তব্ধতা চূর্ণ হলো। চিড়িয়াখানার কোথাও তীব্র মরণ আর্তনাদে কঁকিয়ে উঠলো একজন মানুষ- সেই সঙ্গে তীব্র বাঘের গর্জন!

ও কিসের শব্দ: তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেল?

ভীষণ চিৎকার আর গর্জনটা কিন্তু একবার উঠেই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার নেমে এসেছে রাতের স্তব্ধতা।

কিন্তু সেই চিৎকার ততক্ষণে পৌঁছে গেছে চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিসটেন্ট সুপার, মিঃ রাকেশ দুয়ার কানে। তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে বেরিয়ে পড়েন নিজস্ব কোয়ার্টার থেকে। কয়েকজন কর্মচারি এবং নাইটগার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে চললেন বাঘের খাঁচাগুলোর দিকে। আর্তনাদ আর গর্জনটা ওই দিক থেকেই শোনা গেছে।

দিন কয়েক আগে আলিপুর চিড়িয়াখানায় এসেছে একটা নতুন রয়াল বেঙ্গল টাইগার। এখনও তার বন্যতা কিছুমাত্র কমেনি। সেই রয়াল বেঙ্গলের খাঁচার সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন মিঃ রাকেশ দুয়া।

পাঁচ ব্যাটারি টর্চের তীব্র আলোর ফোকাসে খাঁচার ভেতরে যে দৃশ্য দেখলেন মিঃ দুয়া তা ভয়ঙ্কর।

খাঁচার মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একজন মানুষ। আর তার পিঠের ওপর বিশাল থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রয়াল বেঙ্গল টাইগারটা।

টর্চের আলো সেই নিশাচরের মুখের ওপর পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে হিংস্রভাবে দাঁত বার করে আর একটা হাড় হিম করা গর্জন ছাড়লো—হা...উ...উ...ম্...ম্...!

বোঝা গেল হিংস্র শ্বাপদ মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে—সহজে ছাড়তে সে রাজি নয়।

ততক্ষণে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে চিনতে পারা গেছে—সে ঝগড়ু। এই চিড়িয়াখানার অস্থায়ী ঝাড়ুদার।

কিন্তু এই গভীর রাতে ঝগড়ু ওই বাঘের খাঁচায় ঢুকলো কি করে? কেনই বা ঢুকলো?

রাকেশ দুয়া তখুনি ফোন করলেন থানায়।

দুই

সকালবেলা। মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে বসে আড্ডা জমিয়ে ছিলাম আমি আর মেঘনাদ। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু দিন দুই আগে বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে সেখানকার এক প্রাক্তন জমিদার তনয়ের ফোন বার্তা। ভদ্রলোকের নাম শ্যামলাল শর্মা। কিছুদিন আগে তাঁর বাড়ি থেকে নাকি এক মহামূল্যবান নীলকান্ত মণি চুরি গেছে। সেটি বংশপুরুষ যাবৎ শর্মাজীর গৃহদেবতা- কিষাণ মহারাজের মাথার মুকুটে শোভা পেত।

শ্যামলাল শর্মার ধারণা ওই নীলকান্ত মণিটি চুরি করেছে তাঁর চাকর রামসেবক। কারণ মণি চুরি যাবার পর থেকেই নাকি রামসেবক নিরুদ্দেশ। পুলিশ অনেক সন্ধান করেও এপর্যন্ত রামসেবকের খোঁজ পায়নি।

শ্যামলাল শর্মা গত পরশু এ ব্যাপারে দ্বারভাঙ্গা থেকে মেঘনাদের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করেছেন, এবং মেঘনাদ দিন কয়েকের মধ্যেই দ্বারভাঙ্গা যাবে কথা দিয়েছে।

সব শুনে আমি মেঘনাদকে জিজ্ঞেস করেছি, —এ ব্যাপারে তোর কি করার আছে বুঝতে পারছি না। শর্মাজীর গৃহদেবতার মুকুটের মণি চুরি হয়েছে। সে মণি চাকর নিয়ে পালিয়েছে। এর মধ্যে রহস্য কোথায়? চাকরকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব তো পুলিশই নিতে পারে।

মেঘনাদ বললো, —সত্যি বলতে কি, আমার এখানে রাজি হবার দুটো কারণ আছে অর্ণব। প্রথম কারণ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জায়গাটা দেখার আমার বহুদিনের ইচ্ছে। জানিস তো দ্বারভাঙ্গার প্রাচীন নাম 'দ্বারবঙ্গ'। একসময়ে ওটা ছিল বঙ্গের সীমা। শুনেছি ওখানে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখনও বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি একটা আলাদা ভালবাসা আছে—যেটা আমরা এই বাংলাতে বসেও ক্রমেই হারাতে বসেছি।

—বুঝলাম। এবার দ্বিতীয় কারণটা শুনি।

—সে কারণটা খুব সহজ। এই মুহূর্তে আমার হাতে কোন কেস নেই। আর এটা তো জানিস অর্ণব, রহস্যভেদী মেঘনাদ রহস্যের গন্ধ ছাড়া থাকতে পারে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠলো।

মেঘনাদ রিসিভার তুললো।

মিনিট কয়েক ফোনে ও তরফের কথা শুনে মেঘনাদ রিসিভার রেখে বললো, —অর্ণব, আমাদের দ্বিতীয় কারণটার বোধ হয় আর প্রয়োজন হলো না।

—কে ফোন করেছিল?

—ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্র। একটা অদ্ভুত খবর শোনালেন।

মেঘনাদের কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ বদলে গেছে।

—কি খবর?

—গতকাল শেষ রাতে আলিপুর চিড়িয়াখানায় এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। চিড়িয়াখানায় রয়াল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচায় একজন ঝাড়ুদার ঢুকে পড়ে এবং বাঘের খাবায় প্রাণ দেয়।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে আমার দু'চোখ বিস্ফারিত হলো, —তা সেই ঝাড়ুদার অত রাত্রে বাঘের খাঁচায় ঢুকেছিল কি জন্যে? খাঁচা পরিষ্কার করার সময় তো তখন নয়। তাছাড়া যদিও বা খাঁচায় ঢোকার প্রয়োজন হয়, আগে থেকেই বাঘকে পাশের অন্য একটা ছোট খাঁচায় পুরে ফেলা হয়।

ঠিক বলেছিস। পুরো ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক। তাই তো ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের অনুরোধ, আমি যেন একবার ঘটনাস্থলে যাই। —বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মেঘনাদ।

বললাম, —মনে হচ্ছে এ কেসটা একটু অন্যরকম হবে। কারণ এক্ষেত্রে খুন মানুষ হলেও খুনী মানুষ নয়—রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

মেঘনাদ শেষবারের মতো চুলে চিকনিটা বুলিয়ে নিতে নিতে বললো, —কিন্তু বন্ধু, একটা কথা মনে রেখ, বাঘের চেয়েও হিংস্র—মানুষের থাবা!

কি জানি কি বলতে চাইলো মেঘনাদ!

তিন

ঝাড়ুদার ঝগড়ুর মৃতদেহটা চিড়িয়াখানার সুপারিনটেনডেন্ট-এর অফিসের সামনেই শোয়ানো ছিল।

গতকাল শেষরাত্রে ঝগড়ুর আর্তনাদ আর বাঘের গর্জন শুনে অ্যাসিসটেন্ট সুপার রাকেশ দুয়া তাঁর লোকজন নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। তারপর অতিকষ্টে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বাঘকে অবশ করে বাঘের মুখ থেকে ঝগড়ুর দেহটা বার করে আনেন। কিন্তু তখন তার মুমূর্ষু অবস্থা।

খবরটা শুনে ইন্সপেক্টর তলাপাত্র যখন এসে পৌঁছেছিলেন। তখন নাকি ঝগড়ুর অন্তিম অবস্থা। ইন্সপেক্টরকে দেখে ঝগড়ু শেষবারের মতো কি একটা বলতে চেয়েছিল। মিঃ তলাপাত্রের মনে হয়েছে কথাটা এই রকম— ত...ত...ত ..ত.. ও. !

এর বেশি আর কিছু উচ্চারণ করতে পারে নি সে। ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে মারা গেছে। দৃশ্যটা সত্যিই বীভৎস। বাঘের থাবা ঝগড়ুর পিঠ ফুটো করে দিয়েছে। মাথার পেছনের খুলি চূর্ণ। উঃ! চোখে দেখা যায় না।

মেঘনাদ পৌঁছবার আগেই ইন্সপেক্টর তলাপাত্র একদফা সকলের স্টেটমেন্ট নোট করেছেন।

মেঘনাদ প্রথমে সব ব্যাপারটা শুনে ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের নেয়া জবানবন্দীগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর মিঃ রাকেশ দুয়াকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, —এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত!

রাকেশ দুয়ার বছর চল্লিশ বয়স। ভাল স্বাস্থ্য। কথাবার্তাও বেশ মার্জিত। খুবই কর্তব্যপরায়ণ অফিসার মনে হলো। স্বভাবতই ঘটনাটায় উনি বেশ বিচলিত। উনি জানেন ব্যাপারটা নিয়ে সরকারি মহলে অনেক দূর পর্যন্ত তোলপাড় হতে পারে। খবরের কাগজগুলোও হৈ চৈ করার একটা রসদ পেয়ে যাবে।

মিঃ দুয়া মেঘনাদের প্রশ্নের উত্তরে বিমর্ষভাবে বললেন, —আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ ভরদ্বাজ। তবে লোকটি ভীষণ মদ্যপ ছিল। এই এক মাসে এ ব্যাপারে ওকে বেশ কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছিলাম।

—একমাস! মানে ঝগড়ু এখানে মাত্র একমাস চাকরি করছে?

—হ্যাঁ। ও এখনও অস্থায়ী কর্মী। তবে এখানেই ওর ঘর ছিল। তুলসীর সঙ্গে ও বাঘের খাঁচার দেখাশোনা করতো।

তুলসী! —মেঘনাদ ভ্রু কোঁচকালো ঃ সে বুঝি বাঘের খাঁচার চার্জে আছে?

—হ্যাঁ। ওর ওপরই দায়িত্ব ছিল চিড়িয়াখানায় নতুন আনা রয়াল বেঙ্গলটাকে খাবার দাবার দেয়া থেকে শুরু করে সব কিছু দেখা শোনা করার।

—তুলসীকে একবার ডাকতে পারেন?

—নিশ্চয়ই।

মিঃ রাকেশ দুয়া ডেকে পাঠালেন। তুলসী এল। বছর পঞ্চাশ বয়স। দেখে মনে হয় হাঁফানি আছে। লোকটার চেহারা যা, তাতে ওকে বাঘের খাঁচার দায়িত্ব না দিয়ে বুড়ো শিয়ালের খাঁচার দায়িত্ব দিলেই মানাতো। লোকটা এল ঘঙ ঘঙ শব্দে কাশতে কাশতে।

মেঘনাদ বললো,—খুব কাশি হয়েছে দেখছি। কখন ঠাণ্ডা লাগলো?

—আর বলবেন না স্যার, একে হাঁফানি রুগী, তার ওপর কাল রাতে বেদম ঠাণ্ডা লেগেছে।

—কখন বেরিয়েছিলে কাল রাতে?

—ওই যে যখন ঝগড়ু বাঘের খাঁচায় ঢুকে কাণ্ড বাঁধালো। খবর পেয়েই তো সায়েবের সঙ্গে ছুটে গেলাম।

বলতে বলতে কাশির দমকে হাঁফাতে লাগলো তুলসী।

তা এমন হতে পারে তুমি কখনও ভেবেছিলে?—মেঘনাদ যেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা করলো।

কি বলবো স্যার, মদের নেশায় মানুষ করতে পারে না কী? —বলতে বলতে মাঠের ধারে এক গাদা কফ তুলে ফেললো তুলসী।

—তার মানে, তুমি কি বলতে চাও গত রাতে ও নেশার ঝোঁকেই......!

তা ছাড়া কি!—বলতে গিয়েও তুলসী হঠাৎ যেন থমকে গেল! তারপর একটু ভেবে বললো ঃ কদিন আগে ঝগড়ু আমায় একটা বাত বলছিল স্যার।

—কী বাত?

—বলছিল বাঘমাতা দেবীর কাছে ওর একটা মানত আছে।

—বাঘমাতা দেবী!

—হ্যাঁ স্যার। যাকে আপনারা বাংলায় বলেন বাঘের পিঠে চড়া বনবিবি কিংবা জগদ্ধাত্রী। মানে বাঘের পিঠে বসে দুর্গামাঈ। পশ্চিমে সেই রকম বাঘমাতা দেবীর পূজা চালু আছে।

শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে গেল কয়েকবছর আগে এই আলিপুর পশুশালাতেই ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা। সেদিন শীতের দুপুরে বহু দর্শকের চোখের সামনে দুই মদ্যপ যুবক চিড়িয়াখানার বাঘের এলাকার রেলিং টপকে বাঘের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। একজনের হাতে ছিল গাঁদাফুলের মালা, সে চেয়েছিল বাঘের গলায় মালা পরাতে। সেবারে অবশ্য বাঘের থাবায় কারুর মৃত্যু হয়নি। তার আগেই একজনকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয়েছিল। পরে সে বলেছিল, সে নাকি স্বপ্নে পাওয়া বাঘমাতা দেবীর নির্দেশে পেয়েছিল বাঘের গলা মালা পরাতে। ব্যাপারটা নিয়ে সে সময়ে কলকাতায় খুব হৈ চৈ হয়েছিল।

হঠাৎ অন্যমনস্কতা ভাঙলো মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে, —চল অর্ণব, আপাতত আর তুলসীর কাছে জানার কিছু নেই। এখন মিঃ দুয়ার কাছে ঝগড়ু সম্পর্কে আর যে দুচারটে কথা জানার আছে, জেনে ফিরতে হবে।

মিঃ রাকেশ দুয়া তখনও ঝগড়ুর ডেডবডির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে ডেডবডির ফটো ইত্যাদি তুলে বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মেঘনাদ মিঃ দুয়াকে বললো, —আমার আর একটা কথা জানার আছে মিঃ দুয়া।

—বলুন।

—আপনি পুলিশকে বলেছেন রাত্রিবেলা ঝগড়ুর আর্তনাদ আর বাঘের গর্জন শুনে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখলেন বাঘটা ঝগড়ুর পিঠে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাই তো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা,·খাঁচার দরজাটা কি খোলা ছিল?

ন্...না। —একটু ভেবে মিঃ দুয়া বললেন ঃ দরজা খোলা থাকলে তো বাঘ বেরিয়েই পড়তো।

—তবে কি আমি মনে করতে পারি যে ঝগড়ু খাঁচায় ঢুকে খাঁচার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল?

—সেটাও সম্ভব না মিঃ ভরদ্বাজ। কারণ ওই খাঁচার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করার উপায় নেই।

—তাহলে সে দরজা বন্ধ করলো কে?

মিঃ রাকেশ দুয়া মেঘনাদের এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তিনি কয়েক সেকেন্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন, —তাই তো' এটা তো ভেবে দেখি নি।

মেঘনাদ ফেরার পথে ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্রকে দুটি অনুরোধ করলো। প্রথম অনুরোধ, ঝগড়ুর দেশ বা বাড়িঘরের হদিস জানা। কারণ এখানকার কোয়ার্টারে ও থাকলেও ওর সঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় নি। আর দ্বিতীয়ত যেটা দরকার, তা হলো ঝগড়ুর একটা ফটো।

ইন্সপেক্টর তলাপাত্র নাক চুলকে বললেন, —ভাববেন না মেঘনাদবাবু, দুটোই আজকের মধ্যে পেয়ে যাবেন।

চার

শুধু সেই দিন নয়, আরও একটা দিন চেষ্টা করেও ইন্সপেক্টর তলাপাত্র মেঘনাদের একটা অনুরোধ রাখতে পারলেন না—ঝগড়ুর কোন পূর্ব হদিস বা আত্মীয় স্বজনের পরিচয়। তবে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটো উনি এনে দিলেন। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে তোলা। ঝগড়ু আর তুলসী বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সেইদিনই ঝগড়ু ডেডবডির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল। বাঘের থাবার নখ ঝগড়ুর পিঠ দিয়ে ঢুকে ওর হৃদপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে। আর মাথার পেছন দিকটাও আঘাতে গুঁড়ো হয়ে গেছে। এটাই মৃত্যুর কারণ। এই সঙ্গে ঝগড়ুর পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণ অ্যালকোহল। অর্থাৎ ও যখন খাঁচায় ঢোকে, তখন ও তীব্রভাবে নেশাচ্ছন্ন ছিল।

তবে এসব আলোচনার পর ইন্সপেক্টর তলাপাত্র বলেছেন, —মেঘনাদবাবু, এখন আমার মনে হচ্ছে এ কেসটার মধ্যে বোধ হয় সত্যিই কোন রহস্য নেই।

—মনে হওয়ার কি কোন কারণ দেখতে পাচ্ছেন?

নিশ্চয়ই। —ইন্সপেক্টর তলাপাত্র বললেন ঃ প্রথম কারণ লোকটা বেহেড মাতাল ছিল। একজন মাতালের পক্ষে এমন কোন কাজই অসম্ভব নয়। আর

দ্বিতীয় কারণ তুলসীর জবানবন্দী। ঝগড়ু নাকি ওকে বলেছিল বাঘমাতা দেবীর গলায় মালা পরাবার মানত আছে তার। দুটো সূত্র যদি যোগ করা যায়.....।

দাঁড়ান ইন্সপেক্টর তলাপাত্র। —মেঘনাদ ওনার কথা শেষ হবার আগেই উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরের জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো ঃ আমি আপনার যুক্তি মেনে নিতে পারতাম, যদি আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতাম।

—তিনটি প্রশ্ন?

—হ্যাঁ। আমার প্রথম প্রশ্ন, ঝগড়ু মৃত্যুর আগে পুলিশকে 'ত...ত...ত...ও' বলে কি জানাতে চেয়েছিল। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন মনে এসেছে ঝগড়ুর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানার পর। রিপোর্টে জানা গেছে মৃত্যুর আগে সে বেদম মদে প্রায় বেহুঁস ছিল এবং বাঘের থাবাটা পড়েছিল তার পিঠে আর মাথার পেছনে।

—হ্যাঁ, তাতে কি?

—তাতে এ সম্ভাবনাই ফুটে উঠেছে, এ অবস্থায় তালা খুলে খাঁচায় ঢোকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে ওই অবস্থার মধ্যেও সে তালা খুলে খাঁচায় ঢুকেছিল বাঘের গলায় মালা পরাতে, তবে বাঘের থাবা এসে পড়তো তার শরীরের সামনের অংশে। তাছাড়া খাঁচার ভেতরে কোন মালাও পাওয়া যায় নি। এর অর্থ একটাই।

—কী?

—ঝগড়ুকে কেউ একজন সেই রাতে নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় ধাক্কা মেরে খাঁচার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই সে উপুড় হয়ে পড়েছে এবং বাঘের থাবা পড়েছে তার পিঠে, মাথার পেছনে। তবে আমার তৃতীয় প্রশ্নটাই সবচেয়ে গুরুতর।

—সেটা কি?

—অ্যাসিসটেন্ট সুপার মিঃ দুয়া তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, সে রাতে বাঘের খাঁচা খোলা ছিল না। ঝগড়ুর পক্ষেও ভেতর থেকে খাঁচার দরজা বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। তাহলে ঝগড়ু খাঁচায় ঢোকার পর খাঁচার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হলো কি ভাবে?

মেঘনাদের বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে এবার উৎসাহে দপ্ দপ্ করে উঠলো ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্রের দু'চোখ। বললেন, —ধন্য রহস্যভেদী। তাহলে এখন কি করণীয় তাই বলুন?

—এখন করণীয় একটাই, তা হলো বাঘের থাবার রহস্যভেদ। আপনি আপনার তদন্ত চালিয়ে যান।

বলতে বলতে মেঘনাদ আবার সোফায় এসে বসলো।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যের পর মেঘনাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলাম ও টেলিফোনে রীতিমত মশগুল হয়ে কথা বলছে।

একটু বাদে রিসিভার নামিয়ে রাখার পর জিজ্ঞেস করলাম, —কার সঙ্গে কথা বলছিলিস রে?

—দ্বারভাঙ্গার জমিদার তনয় শ্যামলাল শর্মা। শর্মাজী টেলিফোনে জানতে চাইছিলেন ওঁর গৃহদেবতার নীলকান্তমণি চুরির তদন্তে কবে আমি দ্বারভাঙ্গা যাব।

—তুই কি বললি?

—বললাম আগামী কালই যাচ্ছি।

শুনে অবাক হলাম। বললাম—কিন্তু এ সময়ে তো তুই অন্য একটা কেসের তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত রয়েছিস। এখন তোর কলকাতা ছাড়াটা কি ঠিক হবে?

মেঘনাদ নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দিয়েছে, —অসুবিধে নেই। ইন্সপেক্টর তলাপাত্রকে সব বলে যাব। তাছাড়া আশা করছি দিন দুয়েকের মধ্যেই ফিরতে পারবো।

—তার মানে! ওখানে পৌঁছবার আগে তুইই বুঝতে পারছিস ও কেসটা সমাধান করতে দুদিনের বেশি সময় লাগবে না? এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

মেঘনাদ আমার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর দু'চোখে কৌতুক। তারপর স্বভাব মতো ছড়ার হেঁয়ালি শোনাল :

বন্ধু দৃষ্টিটাকে স্বচ্ছ রাখো
অনুমানকে ছড়িয়ে দাও,
ধোঁযা দেখে আগুন চেনো
রত্ন যদি খুঁজতে চাও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, —কি বলতে চাস?

মেঘনাদ হেসে বললো, —ক্রমশ প্রকাশ্য!

ছয়

যা ভেবেছিলাম তা হলো না। মেঘনাদ তার কথা রাখলো। ঠিক দুদিনেব মধ্যেই ও দ্বারভাঙ্গা থেকে ফিরে এল। ফিরেই পরের দিন সাত সকালে ফোন করলো, —অর্ণব, এক্ষুনি চলে আয়,

—কি ব্যাপার? একেবারে জোর তলব।

এলেই জানতে পারবি। —বলেই মেঘনাদ লাইন কেটে দিল।

অগত্যা আর দেরি না করে চটপট মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে পৌঁছে

অগত্যা আর দেরি না করে চটপট মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলাম।

ঘরে ঢুকে দেখি মেঘনাদ ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

আমায় দেখে মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, —এসে পড়েছিস? চল, চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসি।

আমি তো অবাক! এই অসময়ে! বললাম, —কিন্তু স্নান খাওয়া না সেরেই....

—ওসব করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। দিন সাতেক হলো চিড়িয়াখানায় দারুণ সুন্দর একটা অস্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়া এসেছে। প্রজাতিটার নাম কাকাতুয়া লেডবিটার (Cacatua Leadbeater) খুব বিরল জাতের পাখি।

মেঘনাদ যখন একান্ত উৎসাহ নিয়ে কথাগুলো বলছিল আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। শুধু এই একটা কাকাতুয়া দেখার জন্য মেঘনাদ এসময়ে চিড়িয়াখানায় যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের দিকে আড়চোখে তাকালাম। ওঁর মুখ দেখেও কিছু বোঝা গেল না। সবটাই হেঁয়ালি।

মেঘনাদ আর ভাববার অবকাশ দিল না। প্রায় জোর করেই আমায় নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ওর গাড়িতে উঠলো। তিন আরোহী নিয়ে মেঘনাদের মারুতি সুজুকি ছুটে চললো চিড়িয়াখানার পথে।

সাত

—মিঃ দুয়া, আপনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ আলোচনা আছে।

চিড়িয়াখানার অ্যাসিসটেন্ট সুপার মিঃ রাকেশ দুয়া এ সময়ে তাঁব অফিসের নিজস্ব চেম্বারে বসে কাজ করছিলেন। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে মুখে হাসি টেনে বললেন, —আরে আসুন, আসুন।

আমরা সামনের তিনটে চেয়ার দখল করে বসলাম। মিঃ দুয়া মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে বললেন, —আজ একেবারে সকালে চলে এসেছেন। কি খাবেন, ঠাণ্ডা না গরম?

—ওসব কিছুর প্রয়োজন হবে না। আমরা এসেছি আপনাদের চিড়িয়াখানার বিশেষ আকর্ষণ সেই অস্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়াটা একবার দেখতে।

মিঃ দুয়ার মুখ দেখে মনে হলো মেঘনাদের কথাটা ওঁর খুব একটা পছন্দ হলো না। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন,—আপনারা শুধু এই জন্যে আজ চিড়িয়াখানায় এসেছেন! বাট ভেরি স্যরি মিঃ ভরদ্বাজ, পাখিটা আজই সকালে মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ, অর্ণববাবু। খুব বিরল প্রজাতির কাকাতুয়া। কদিনেই বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। দর্শকদের খুব আনন্দ দিত। কিছু কিছু কথা বলতেও শিখেছিল। কিন্তু কদিন যাবত কি যে হলো! কিছু খেত না! কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

পাখিটা এখন কোথায়? —এবার প্রশ্ন ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের।

পাখিটা? —হঠাৎ হেসে ওঠেন মিঃ রাকেশ দুয়া ঃ কেন, আপনারা কি মরা কাকাতুয়াও দেখতে চান?

আসলে এত সুন্দর পাখিটা! এসেছি যখন, একবার না দেখে ফিরতে মন চাইছে না। —মেঘনাদের কণ্ঠে আকুতি।

এবার একটু যেন ভাবলেন মিঃ দুয়া! তারপর বললেন, —একটু অসুবিধে আছে মিঃ ভরদ্বাজ। ওটা এখন আমার কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে রেখেছি। ইচ্ছে আছে পাখিটাকে মাউন্ট করে রেখে দেব।

মাউন্ট করা অর্থে, পাখির শরীরের ভেতরের অংশ বার করে নিয়ে অনেকটা মমির মতো করে রাখা। কলকাতা মিউজিয়ামে এমন অনেক পশুপাখির শরীর আছে। সহসা দেখে মনে হয় জীবন্ত। আসলে ওপরের চামড়া, লোম বা পালক ঠিক থাকলেও ভেতরটা অন্য কিছু দিয়ে ভরাট করা।

—হঠাৎ ওটা মাউন্ট করার ইচ্ছা হলো কেন।

ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের কণ্ঠস্বরে আমার অন্যমনস্কতা ভাঙলো।

কারণ আর কিছু নয়। —মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে মিঃ রাকেশ দুয়া বললেনঃ পাখিটাকে কয়েকদিনের মধ্যেই এখানকার সব কর্মচারি ভালবেসে ফেলেছিল। আমার ঘরের ছেলেমেয়েরাও। সকলেরই ইচ্ছে ওকে বাঁচিয়ে রাখা না গেলেও ওর শরীরটা মাউন্ট করে যেন এই চিড়িয়াখানার কোন ঘরে রেখে দেয়া হয়।

—মরা কাকাতুয়াটাই আমরা একবার দেখতে চাই।

মেঘনাদের জেদে এবার কিছুটা বিরক্ত মনে হলো মিঃ দুয়াকে। কিন্তু সে ভাব চেপে বললেন,—বেশ তো, দিন কয়েক বাদে আসুন। তার মধ্যে ওটা মাউন্ট করা হয়ে যাবে।

—না মিঃ দুয়া। ওটা আমরা আজ এবং এখনই দেখতে চাই।

মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে তাকালাম। মনে হলো ওর কণ্ঠস্বর থেকে সৌজন্যের মুখোশটা খুলে পডছে।

—স্যরি মিঃ ভবদ্বাজ, আমি এখন জরুরি অফিসের কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু আমাদের ব্যস্ততাটা যে আরও বেশি মিঃ দুয়া। —এবার ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্রের পুলিশি মেজাজ শোনা গেল।

আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ ওই মরা কাকাতুয়াটা নিয়ে দুপক্ষে এমন টানাপোড়েন শুরু হয়েছে কেন!

যাই হোক, শেষপর্যন্ত মিঃ দুয়াকে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই হলো। ওঁর সঙ্গে আমরা পা বাড়ালাম ওঁর নিজস্ব কোয়ার্টারেব দিকে।

কোয়ার্টারেব সামনের ঘরটাতেই টেবিলের ওপর একটা বড় কাঁচের বাক্সের মধ্যে মরা কাকাতুয়াটা শোয়ানো ছিল।

সত্যিই দারুণ সুন্দর পাখিটা। সাধারণ কাকাতুয়ার চেয়ে অনেক বড় সাইজের। ধবধবে সাদা পালকে ঢাকা শরীর। ঠোঁট আর পায়ের রঙ ধূসর। বুকে গোলাপী আভা। টুকটুকে লাল মাথার ঝুঁটি। এখানে আসার আগে মেঘনাদ এর নামই বলছিল অস্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়া লেডবিটার। বিরল প্রজাতি।

মিঃ রাকেশ দুয়া বললেন, —আপনাদের কাকাতুয়া দেখার সাধ মিটলো তো মিঃ ভরদ্বাজ?.......এবার তাহলে আমরা যেতে পারি?

মনে হল মেঘনাদ ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করলো। ইন্সপেক্টর তলাপাত্র গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, —মিঃ দুয়া, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই মরা কাকাতুয়াটাকে আমি পুলিশের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হলাম। ওটা আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে হবে।

তার মানে?—মিঃ দুয়া এবার সতিাই উত্তেজিত ঃ আমার এখন রসিকতা শোনার সময় নেই।

মেঘনাদের কণ্ঠে কিন্তু কোন উত্তাপ নেই। ও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বললো,— আসলে কি জানেন মিঃ দুয়া, এই কাকাতুয়ার মৃত্যুটারও আমাদের কাছে বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। তবে চিন্তা করবেন না, আপনার কর্মচারী ঝগড়ুর মতো এই কাকাতুয়ার শরীরটাকে আমরা পোস্টমর্টেম-এর নামে চেরাই করবো না। এর শরীরের একটা এক্স-রে তুলে ওর পাকস্থলির ভেতরটা দেখতে হবে।

না। —হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ রাকেশ দুয়া ঃ একাজ আপনারা করতে পারেন না। আমাদের প্রিয় কাকাতুয়াকে আমরা এই চিড়িয়াখানার বাইরে নিয়ে গিয়ে ওর শরীরটা নষ্ট করতে দিতে পারি না।

আপনি ভুল করছেন মিঃ দুয়া।— মেঘনাদ তবু বোঝাবার চেষ্টা করে ঃ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমরা মরা পাখিটা নিয়ে যাব, তারপর আবার ফিরিয়ে দেব। তখন আপনারা ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন।

প্লিজ আপনারা চলে যান। —মিঃ দুয়ার কণ্ঠস্বর এবার বেশ কর্কশ শোনাল ঃ পুলিশের কাজ ঝগড়ুর মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করা। চিড়িয়াখানার একটা মরা পাখি নিয়ে মাথা ঘামাতে কেউ আপনাদের ডাকেনি।

মিঃ দুয়া এ কৈফিয়ৎ পুলিশ আপনাকে দিতে বাধ্য নয়। —এবার ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের কঠিন পুলিশি কণ্ঠ শোনা গেল ঃ আমরা পুলিশের তরফ থেকে পাখিটাকে বাজেয়াপ্ত করছি। আপনি আমার কর্তব্য করতে দিন।

নো। নেভার। —বলতে বলতে হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বার করলেন মিঃ দুয়া। এসময়ে ওঁর চোখ দুটো দেখে চমকে উঠলাম—যেন হিংস্র বাঘের দৃষ্টি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ঃ আউট আই সে। বেরিয়ে যান। এতক্ষণ আপনাদের অনেক উৎপাত সহ্য করেছি। আর কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে...

কিন্তু বাকিটা আর মিঃ দুয়ার বলা হলো না, তার আগেই আমার পাশ থেকে যেন একটা তীব্র ঝড় ছুটে গেল। চোখের পলক ফেলার আগেই দেখলাম রাকেশ দুয়ার হাতের রিভলবার চলে এসেছে মেঘনাদের হাতে, আর তার শরীরটা ছিটকে আছড়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে।

রাকেশ দুয়ারের তো জানা ছিল না রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ একসময়ে কুংফু ক্যারাটের সর্বোচ্চ ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া লড়িয়ে ছিল।

ইন্সপেক্টর তলাপাত্রকে এরপর আর বলতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে উনি বাঘের মতো রাকেশে দুয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে নড়বার আগেই তার দু'হাতে পরিয়ে দিলেন হাতকড়া।

'ততক্ষণে মেঘনাদ পাখিটাকে বাক্স থেকে বার করে ফেলেছে। তারপর অতি দ্রুত পকেট থেকে একটা ধারাল ছুরি বার করে চিরে ফেলেছে মরা কাকাতুয়ার পেটটা।

পেট চিরতে প্রথমে বেরুলো একগাদা নাড়ি ভুঁড়ি। মেঘনাদ সেগুলো হাতে তুলে নিল। তারপর সেই ধারাল ছুরির সাহায্যে কাকাতুয়ার পাকস্থলিটা কাটতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট ডিমের মতো কি একটা শক্ত পদার্থ।

মেঘনাদ বোধ হয় আগে থেকেই তৈরি ছিল। পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বার করে কি একটা কেমিক্যালে সেই শক্ত ডিমটা ধুয়ে ফেলতেই জিনিসটা থেকে নীলচে আলো জ্বল জ্বল করে উঠলো।

মেঘনাদ বললো, —অর্ণব, বুঝতে পারছিস। এটাই সেই দ্বারভাঙ্গার জমিদার বাড়ির গৃহদেবতার মুকুট থেকে চুরি যাওয়া নীলকান্তমণি।

মেঘনাদের কুংফুর মোক্ষম প্যাঁচ আর ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের হাতকড়ির যুগপৎ বন্ধনে কাহিল রাকেশ দুয়ারের তখন আর কথা বলা বা নড়ার ক্ষমতাও নেই!

আট

মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে বসে মেঘনাদ রহস্যের বিশ্লেষণ করছিল। শ্রোতা আমি আর ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্র। একটু আগে দীননাথ তিনকাপ গরম চা আর পাঁপড় ভাজা দিয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যায় জমাটি আড্ডা।

ইতিমধ্যে রাকেশ দুয়া পুলিশের জেরায় জেরবার হয়ে স্বীকার করেছেন যে তিনি দ্বারভাঙ্গার জমিদার তনয় শ্যামলাল শর্মার বহুকালের পারিবারিক বন্ধু এবং তিনিই সুযোগ মতো বাড়ির চাকর রামসেবকের সাহায্যে ওই বাড়ি থেকে বিগ্রহের মুকুটের নীলকান্ত মণিটি চুরি করান। তারপর রামসেবককে কলকাতায় এনে ঝগড়ু নামে ঝাড়ুদারের অস্থায়ী চাকরিটা পাইয়ে দেন। এরপর ঝগড়ু ওরফে রামসেবক যখন মণিটার জন্য আরও বেশি টাকার দাবী করতে থাকে, তখন রাকেশ দুয়াই তাকে এক রাতে বেদম মদ খাইয়ে বাঘের খাঁচার মধ্যে ফেলে আসেন।

এই পর্যন্ত শুনে আমি জিজ্ঞেস করেছি। —আচ্ছা, ঝগড়ুই যে দ্বারভাঙ্গার শ্যামলাল শর্মার চাকর রামসেবক, এটা তুই জানলি কি করে?

মেঘনাদ বললে, —আসলে বাঘের থাবায় ঝগড়ুর মৃত্যুর পেছনে যে অন্য কোন মানুষের থাবা আছে এটা আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, তা তো তুই জানিস। তবে ঝগড়ুই যে রামসেবক সেটা অনুমান করেছি কদিন আগে টেলিফোনে শ্যামলাল শর্মার সঙ্গে কথা বলবার সময়।

কি ভাবে?—এবার প্রশ্ন ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের।

—মিঃ শর্মা ওই দিন কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ জানিয়েছিলেন আলিপুর পশুশালার বর্তমান অ্যাসিসটেন্ট সুপার রাকেশ দুয়া ওঁদের পারিবারিক বন্ধু। মাস কয়েক আগেও মিঃ দুয়া তাঁর বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছিলেন। তখনই মিঃ শর্মাকে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম মিঃ দুয়া ঘুবে আসার কদিন পরেই তাঁর গৃহদেবতার মুকুটের মণি এবং চাকর রামসেবক নিপাত্তা হয়।

—আর তারপরই যখন তুই ঝগড়ুর ফটো নিয়ে দ্বারভাঙ্গা গেলি, তখন শ্যামলাল শর্মা সে ফটো রামসেবকের বলে সনাক্ত করলেন, —তাই তো?

রাইট অর্ণব। —মেঘনাদ বললো ঃ এরপর অঙ্কের হিসেব মিলতে কতক্ষণ?

কিন্তু কাকাতুয়ার পেটে যে নীলকান্ত মণি আছে, এ সন্দেহ আপনার হলো কি করে?

—ইন্সপেক্টর তলাপাত্রের ধাঁধা এখনও কাটেনি।

—খটকাটা লেগেছিল মিঃ তলাপাত্র, যখন আপনার মুখে শুনলাম ঝগড়ু মৃত্যুর আগে শেষ কথাটা বলছে— 'ত .ত্...ত্...ও...'। প্রথমে ভেবেছিলাম সেটা ওর সঙ্গী তুলসী সম্পর্কে অন্তিম অভিযোগের চেষ্টা কিন্তু তুলসীকে ঘিরে কোন সন্দেহজনক তথ্যই পাওয়া গেল না। তারপর দ্বারভাঙ্গা থেকে ফেরার পথে যখন ভাবছিলাম রাকেশ শর্মা যদি রামসেবক ওরফে ঝগড়ুকে দিয়ে মণিটা চুরি কবিয়েই থাকে, সেটা সে কোথায় রাখতে পারে। হঠাৎ এসময়ে মনে পড়লো চিড়িয়াখানায় সদ্য আসা কাকাতুয়াটার অসুস্থতার খবর। কাকাতুয়া তোতাবর্গীয় পাখি। অনেক কাকাতুয়াকে হিন্দিতে তোতা বলে। তাহলে কি মৃত্যুর আগে ঝগড়ু তোতার কথাই বলতে চেয়েছিল? এর অর্থ একটাই দাঁড়ায় —তা হলে, নীলকান্তমণিটা লুকিয়ে রাখতে সেটা কোনভাবে কাকাতুয়ার মুখের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রাকেশ দুয়া। কিন্তু সেটাও জেনে ফেলে ঝগড়ু। তখন ঝগড়ুর মুখ বন্ধ করতে তাকে বাঘের খাঁচায় ফেলা ছাড়া উপায় খুঁজে পান নি রাকেশ দুয়া।

সব শুনে ইন্সপেক্টর তলাপাত্র উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন, —সত্যিই মেঘনাদবাবু, অপূর্ব আপনার রহস্যভেদ! বাঘের থাবার চেয়েও হিংস্র থাবা যে মানুষের—একেসে সেটা আপনি প্রমাণ করলেন।

মেঘের আড়ালে মেঘনাদ

এক

সংবাদপত্রে অদ্ভুত বিজ্ঞান

কিছুদিন যাবৎ একটা বিজ্ঞাপন দৈনিক সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে। অদ্ভুত সে বিজ্ঞাপনের ভাষা আর বিষয়বস্তু ঃ

আপনি কি দু হাজার বছর আগেকার পৃথিবীতে সশরীরে বেড়াতে যেতে চান? ব্যাপারটা কিন্তু আজ মোটেই অসম্ভব বা ভোজবাজি নয়। বিস্তারিত জানতে হলে প্রকৃত আগ্রহী সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় জানিয়ে লিখুন। একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিই এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবেন।

বিজ্ঞাপনদাতার নাম ঠিকানা নেই। শুধুমাত্র পত্রিকার বক্স নম্বর দেওয়া আছে।

বিজ্ঞাপনটি শুধু অদ্ভুতই নয়, সন্দেহজনকও। বিংশ শতাব্দীর শেষে সশরীরে অতীত পৃথিবী পরিভ্রমণ! বুঝতেই পারা যাচ্ছে কেউ ধাপ্পা দিয়ে কিছু টাকা কামিয়ে নেবার ধান্দা করছে। কিন্তু এভাবে ধাপ্পা দেওয়াই বা কি করে সম্ভব? কৌতূহল একটা থেকেই যাচ্ছে।

ছুটির দিন সকালে মেঘনাদের বেলতলা রোডের ফ্ল্যাটে এসেছিলাম এ ব্যাপারেই আলোচনা করতে। দেখি মেঘনাদ তার স্টাডিতে সোফায় আধশোয়া অবস্থায় এইচ. জি. ওয়েলসের 'দ্য টাইম মেশিন' উপন্যাসটা তন্ময় হয়ে পড়ছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই কিন্তু ও টের পেল। বই থেকে মুখ না সরিয়েই বললো, আজকের কাগজেও সেই বিজ্ঞাপনটা দেখেছিস?

বললাম, হ্যাঁ, সেটা দেখেই তো আসছি।

বোস। বইটার দুটো পাতা শুধু বাকি রয়েছে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

বসলাম এবং মনোযোগী পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হলো কি শেষ পর্যন্ত? ও কি আজকের বিজ্ঞাপনের সূত্র মেলাচ্ছে এইচ. জি. ওয়েলস এর কল্পবিজ্ঞান টাইম মেশিনের সঙ্গে!

দারুণ উপন্যাস, বুঝলি অর্ণব। মেঘনাদ উপন্যাসটি পড়া শেষ করে বললো, এই সায়েন্স ফিকসানটা লিখেই ওয়েলেস রাতারাতি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে।

মেঘনাদকে বাধা দিয়ে বললাম, আজ কিন্তু তোর কাছে এইচ. জি. ওয়েলসের টাইম মেশিন সম্পর্কে লেকচার শুনতে আসিনি।

জানি বন্ধু। মেঘনাদ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললো, তুই এসেছিস বিজ্ঞাপনের টাইম মেশিনের সূত্র খুঁজতে।

ঠিক তাই। ব্যাপারটা অসম্ভব এবং ধাপ্পা মনে হয় না?

একই সঙ্গে অসম্ভব এবং ধাপ্পা? বিশেষণটা একটু বেশি কঠিন হয়ে যায় না কি?

আলবৎ নয়। উত্তেজিতভাবে বললাম।

ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে মেঘনাদ বললো, কিন্তু আমি যদি বলি অর্ণব যে ব্যাপারটা রীতিমত পরীক্ষিত। এক ব্যক্তি স্বয়ং প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিক্রমাদিত্যের আমলে ঘুরে এসেছেন, এমনকি সেখানকার ছবি পর্যন্ত তুলে এনেছেন, তুই বিশ্বাস করবি?

ছবি পর্যন্ত তুলে এনেছেন! এ[illegible] থতিয়ে যাই। কে সেই লোক?

ভবদুলাল সান্যাল। বাড়ি বর্ধমান। একজন কোটিপতি বলতে পারিস। অন্তত গোটা পাঁচেক আলুর কোল্ড স্টোরেজ থেকে শুরু করে আরও অনেকরকম ব্যবসা আছে।

আমার আর ধৈর্য থাকছিল না, বললাম, তা, সে ভদ্রলোক তোকে বলেছেন যে তিনি নিজে ওই বিজ্ঞাপনদাতার সাহায্যে দেড় হাজার বছর অতীত ভারতবর্ষ থেকে ঘুরে এসেছেন?

হ্যাঁ, নিজের মুখেই না হয় সব শুনবি। একটু ধৈর্য ধর। ভদ্রলোকের এখানে আসার সময় হয়ে এল।

তুই বুঝি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলি?

না, যোগাযোগ তিনিই করেছেন। কারণ দেড় হাজার বছর অতীত সেই বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে ঘুরে আসার পর ভদ্রলোক এক বেজায় সমস্যায় পড়েছেন।

সমস্যাটা কি?

সেটাও তাঁর কাছেই শুনিস।

বলতে বলতেই বাইবে থেকে কলিংবেলের শব্দ শোনা গেল। এ শব্দের ধরন আমাদের অপরিচিত। সম্ভবত ভবদুলাল সান্যালই আসছেন।

দুই
সময় অভিযাত্রী ভবদুলাল সান্যাল

পরনে ফাইন আদ্দির পাঞ্জাবি, মিহি শান্তিপুরী ধুতি। চেহারাটা নাদুসনুদুস, গোলগাল। দেখলেই বোঝা যায় ভোগে সুখে মানুষ। ইনিই ভবদুলাল সান্যাল। মেঘনাদ এঁর কথাই বলছিল।

একটু আগেই উনি এসেছেন। ওঁর মুখে আমরা শুনছিলাম রহস্যময় বিজ্ঞানী প্রফেসর চার্লি ল্যামবার্টের অবিশ্বাস্য সৃষ্টি টাইম মেশিনের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী, যা চড়ে ভবদুলালবাবু সজ্ঞানে সশরীরে অতীত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে এসেছেন। তিনি নাকি গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বর্ণময় গুপ্ত যুগে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের

আমলে। বলতে বলতে কখনও ভবদুলালবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছিল, কখনও বা দু চোখ বড় বড় হয়ে উঠছিল।

ভবদুলালবাবু বলছিলেন, মশাই বলবো কি, প্রথমটা আমিও নিজে বিশ্বাস করিনি। খবরের কাগজে বক্স নম্বর দেখে নেহাত কৌতূহলবশেই একটা চিঠি ছেড়ে দিয়েছিলাম। উত্তর এল চটপট। কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলের স্যুইটে আমার রীতিমতো ইন্টারভ্যু নেওয়া হলো।

ইন্টারভ্যু কিসের? জিজ্ঞেস করলাম।

মানে এমন একটা ভ্রমণে যাবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা, তাছাড়া ব্যাপারটাও নাকি 'টপ সিক্রেট'।

কেন?

কেন তা তো তখন বুঝিনি। আমায় বলা হয়েছিল প্রফেসর ল্যামবার্ট তাঁর এই একান্ত গোপনীয় আবিষ্কারের খুঁটিনাটি বিবরণ এখনই প্রকাশ করতে চান না, কারণ ব্যাপারটা এখনও তাঁর এক্সপেরিমেন্টের স্তরেই রয়েছে। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল...

মেঘনাদ এখানে বাধা দিয়ে বললো, পরের কথা পরে বলবেন। এখন যাওয়ার ব্যাপারটা থেকে শুরু করুন।

ভবদুলালবাবু বললেন, সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। সবটাই যেমন নাটকীয় তেমনি বিস্ময়কর।

আপনার কি পুরোটাই ধাপ্পা মনে হয়েছে?

তাই বা মনে করি কি করে? ভবদুলালবাবু বললেন, সবটাই এত নিখুঁত। দেখুন না, ছবি পর্যন্ত তুলে এনেছি...

মেঘনাদ আবার বাধা দিয়ে বললো, ছবি পরে দেখবো, আগে ঘটনাগুলো বলে যান।

ওরা আমায় সময় দিয়েছিল। সেই মতো ট্রেনে নির্দিষ্ট সময়ে উজ্জয়িনী স্টেশনে গিয়ে নামলাম। ভবদুলালবাবু শুরু করলেন, স্টেশনে নামতেই ওদের লোক এগিয়ে এসে আমায় রিসিভ করলো। তারপর স্টেশনের বাইরে একটা মোটরে বসিয়ে আমার চোখ দুটো বেঁধে দিল।

কেন?

ওদের পুরো ব্যাপারটাই যে টপ সিক্রেট। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় গাড়ি চললো। তারপর গাড়ি থামলে যখন চোখের বাঁধন খুলে দিল, দেখলাম লোকালয় থেকে দূরে কোনো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সেখানেই দেখা হলো সেই আমেরিকান বিজ্ঞানী প্রফেসর চার্লি ল্যামবার্টের সঙ্গে।

ভদ্রলোকের চেহারাটা মনে আছে?

হ্যাঁ। এক মাথা সাদা উস্কোখুস্কো চুল, সারা মুখ গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা। কথা বলেন জড়ানো অস্পষ্ট স্বরে। কিছুই বোঝা যায় না। আমার অবশ্য যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে সেই বিজ্ঞানীর এ্যাসিসটেন্ট জনার্দন প্যাটেলের সঙ্গে।

জনার্দন প্যাটেল!

হ্যাঁ। তিনি একজন ভারতীয় এবং নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন প্রাচীন ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্ববিশারদ হিসাবে। তাঁর অনুরোধেই নাকি প্রফেসর ল্যামবার্ট আমেরিকা ছেড়ে এ দেশে এসে তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কার টাইম মেশিনের সাহায্যে অতীত অভিযান সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। সুপ্রাচীন অতীত ঐতিহ্যশালী এই ভারতের মাটিতেই নাকি এ এক্সপেরিমেন্ট বেশি সুবিধাজনক।

তা, সেই জনার্দন প্যাটেলই তাহলে আপনার সঙ্গে যা কিছু কথাবার্তা বললো?

হ্যাঁ। সে রাতটা বেশ আরামেই কাটলো। পরদিন সকালে জনার্দন প্যাটেল এসে প্রথমে আমাকে নিয়ে গেল প্রফেসর ল্যামবার্টের কাছে। অভিযানের মূল্যস্বরূপ টাকাপয়সা দেওয়ার পালা শেষ হলো।

কত টাকা?

পঁচিশ হাজার।

পঁচিশ হাজার! মাই গুডনেস! এবার আমি চোখ কপালে তুললাম।

লাখপতি মানুষ ভবদুলালবাবু কিন্তু আমার বিস্ময়কে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, দেখুন অর্ণববাবু, দেড় হাজার বছর অতীত পৃথিবীর মাটিতে সশরীরে বেড়ানোর মূল্য হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা খুব বেশি বলে আমি মনে করি না, কিন্তু আমার আসল সমস্যা হলো.......

আপনার সমস্যার কথায় পরে আসা যাবে, আগে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা শেষ করুন, মেঘনাদ বললো।

ভবদুলালবাবু আবার খেই ধরলেন।

এরপর ওরা আমার পোশাকটা বদলে দিল। আমায় পরালো দেড় হাজার বছর পূর্বের উজ্জয়িনীর অধিবাসীর উপযোগী পরিচ্ছদ। মাথায় পাগড়ি, পরনে শুধুমাত্র একটা কার্পাস বস্ত্রের ধুতি জাতীয় আবরণ। কাম, গলা, হাত আর বাজুতে অলঙ্কার। জনার্দন প্যাটেল নিজেও তেমন পোশাক পরলেন।

এরপর আমরা দুজনে গিয়ে প্রবেশ করলাম যে ঘরটিতে টাইম মেশিন রাখা ছিল।

সেটা দেখতে কেমন? জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

আট ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটা লালবর্ণের গোলক। প্রফেসর ল্যামবার্ট কিন্তু সঙ্গী হলেন না। আমাকে নিয়ে সেই অদ্ভুত গোলক জাতীয় বস্তুটির প্রবেশদ্বার খুলে ভেতরে ঢুকলেন শুধুমাত্র জনার্দন প্যাটেল। ওই একটা মাত্র দরজা ছাড়া সেই গোলকের ভেতর আর কোনো জানলা বা ফোকর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। নানা অদ্ভুত যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ওসব যন্ত্র বা কলকব্জা কোনো কিছুই বোঝা আমার মতো মানুষের অসাধ্য। জনার্দন প্যাটেল গোলকের দ্বার ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে শুধুমাত্র দুজন লোক কোনোক্রমে বসে থাকতে পারে। জটিল ঘড়ির মতো একটা যন্ত্রে দেড় হাজার বছর অতীতের নির্দিষ্ট কোনো এক সময়ের বিন্দুতে চাবি ঘুরিয়ে জনার্দন প্যাটেল মেশিনের লিভার নামালেন। সঙ্গে

সঙ্গে সে যে কী অনুভূতি তা আপনাকে বোঝাবার ভাষা আমার জানা নেই মেঘনাদবাবু। সারা গোলকটা কেঁপে উঠলো থরথর করে। নানা রঙের আলোর বৈচিত্র্য শুরু হলো। সঙ্গে একটা অদ্ভুত গ্যাট্‌-গ্যাট্‌ গ্যাট্‌-গ্যাট্‌ শব্দ। এই ভাবেই সময় কেটে যাচ্ছে...মাথার মধ্যেও ঝিমঝিম ভাব.....এরই মধ্যে জনার্দন প্যাটেল কানে কানে বললেন, মিঃ সান্যাল, আমরা দেড় হাজার বছর অতীতে ফিরে চলেছি।

ভবদুলাল সান্যালের কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মাথার মধ্যেও তখন কেমন ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। বললাম, তারপর?

কতটা সময় যে এভাবে কেটেছে বলতে পারবো না মশাই। একসময় কম্পন থামলো। একটা যেন ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। জনার্দন প্যাটেল বললেন, আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। এবার বেরুতে হবে।

গোলকের দরজা খুলে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কি দেখলেন?

দেখলাম বাইরের প্রকৃতি আর পরিবেশ আমূল বদলে গেছে। প্রশস্ত রাজপথ, দুপাশে সুরম্য উদ্যান, তরুবীথি। কিছু কিছু বাড়িও চোখে পড়লো। বাড়িগুলি বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি। প্রতিটি বাড়িই যেন এক একটি মন্দিরের মতো গঠন। কোনো কোনো বাড়ির মাথায় স্বর্ণকলস বসান। দূরে নদী বয়ে যাচ্ছে। জলের কলকল শব্দ শুনতে পেলাম।

রাজপথে যে সব মানুষজন চলেছে তাদের চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদও সম্পূর্ণ আলাদা। ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সৈনিক পুরুষ, পালকি বা দোলায় চড়ে চলেছে নারী। পাশ দিয়ে একটা দু ঘোড়ার রথ ছুটে গেল।

আমি আর মেঘনাদ ভবদুলালবাবুর অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনছি, চোখের সামনে যেন ফুটে উঠেছে অতীত উজ্জয়িনী।

দেখতে দেখতে কয়েক মিনিট তো মশাই চোখের পাতাই পড়লো না। সত্যিই কি এমন অসম্ভব ব্যাপারটা সম্ভব হলো!

মনের আবেগটা একটু কমলে জনার্দন প্যাটেলকে বললাম, মিঃ প্যাটেল, আমার জীবন ধন্য হয়েছে। একটা শুধু ইচ্ছা আছে। যদি পূরণ করতে পারেন, চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

জনার্দন প্যাটেল বললেন, বলুন।

বললাম, ইতিহাসে পড়েছি এসময় উজ্জয়িনী নগরী ছিল নবরত্নসভার পরিপোষক সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। একবার স্বচক্ষে সেই রাজসভাটা দেখে যেতে চাই।

জনার্দন প্যাটেল বললেন, সেটা অসম্ভব কিছু নয়, তবে অসুবিধে একটাই।

কি অসুবিধে?

প্রফেসর ল্যামবার্ট আবিষ্কৃত এই টাইম মেশিনের এখন পর্যন্ত যা ক্ষমতা তাতে তা শুধু কোনো জায়গায় ঠিক আধঘণ্টা সময়ই থাকতে পারে। তারপর এমন

ব্যবস্থা আছে যাতে আমরা ওতে উঠি না উঠি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ওটা ফিরে যাবে ঠিক যে সময় থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছি সেই স্থান কালে।

সুতরাং এ অবস্থায় আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে পাঁচ মিনিট সময় কেটে গেছে। বাকি রয়েছে পঁচিশ মিনিট। যা কিছু দেখাশোনার এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে। ঠিক এই সময়ই একটা লোভনীয় প্রস্তাব দিলেন জনার্দন প্যাটেল। তাঁর লোভের টোপে ফেঁসে গেলাম। তিনি জানালেন এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার যদি আসল লাভ কিছু করার ইচ্ছে থাকে, সে ব্যবস্থা করতে পারেন।

আসল লাভ কিরকম? আমি জিজ্ঞেস করেছি। তিনি আমাকে বললেন, ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। প্রফেসর ল্যামবার্টের কাছেও যেন ফাঁস না করি।

স্বভাবতই আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। কারুর কাছে ফাঁস করবো না এ' প্রতিশ্রুতি আদায় করে জনার্দন প্যাটেল আমাকে চটপট নিয়ে গেলেন কাছেই একটা বাড়ির মধ্যে।

দেড় হাজার বছর পূর্বেকার মতোই এক পাথুরে বাসগৃহ। সেখানে এক প্রায় অন্ধকার ঘরে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। তাঁর পাশে কয়েকটা বড় বড় সিন্দুক। জনার্দন প্যাটেল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন সব কথাবার্তা বললেন' তারপর আমায় জানালেন, আমি যদি সোনা কিনতে চাই, জনার্দন প্যাটেল সে বৃদ্ধটির কাছ থেকে কিনে আমায় দিতে পারেন। বৃদ্ধ নাকি এই উজ্জয়িনী নগরীর এক শ্রেষ্ঠী। সোনা কেনাবেচা করাই তাঁর ব্যবসা।

বলতে বলতে ভবদুলালবাবু একটু থামলেন। এক গ্লাস জল চেয়ে খেলেন, তারপর বললেন, ভেবে দেখুন মেঘনাদবাবু, এ লোভ সামলানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা। কারণ আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের ক্রয়মূল্যে কেনা সোনা যদি বর্তমান কালের দরের হিসেবে বিক্রি করা যায়, তবে রাতারাতি শুধু লাখপতি কেন কোটিপতি হবার সম্ভাবনা থাকে। আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না।

আমি এখানে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বের সেই সোনা কেনার জন্য যে অর্থমূল্য হয়, সে মুদ্রা আপনার কাছে কোথা থেকে এল?

ভবদুলালবাবু বললেন, সে ব্যবস্থাও করলেন জনার্দন প্যাটেল। আমার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা বিশেষ ধরনের পান্না বসানো আঙটি ছিল, যার বর্তমান বাজারদর অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো বটেই। জনার্দন প্যাটেল বললেন, আমি যদি ওই পান্নার আঙটিটা তাঁকে দিই তবে তার বিনিময় মূল্যে তিনি ওই বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে সোনা কিনে আমায় দিতে পারেন। সে সোনার ওজন বেশ কয়েক কেজি তো হবেই।

কয়েক কেজি সোনা! আমি এবার চোখ কপালে তুলি, বর্তমানে সোনার আকাশছোঁয়া বাজারদরে তার মূল্য তো বেশ কয়েক লাখ টাকা!

মেঘনাদ দু আঙুলে নিজের রগটা টিপে ধরে এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার বললো, আচ্ছা ভবদুলালবাবু, পঞ্চাশ হাজার টাকার পান্নার আঙটির বদলে কয়েক লাখ টাকার সোনা পাওয়ার লোভ সামলানো কঠিন, না হয় মানলাম। কিন্তু জনার্দন প্যাটেল সে সোনা নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সেই পান্নার আঙটির বিনিময়ে কেনেনি। কারণ ব্যাপারটা সত্যি ধরতে হলে স্বীকার করতে হবে পান্নার দামও সে আমলে আনুপাতিক হারেই কম ছিল। তাই যদি হয়, তবে জনার্দন প্যাটেলকে সোনা কিনতে হয়েছে বিক্রমাদিত্যের আমলেরই মুদ্রামূল্যে। এত মুদ্রা সেই মুহূর্তে তার হাতে এল কি করে, আপনার মনে হয়নি?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভবদুলালবাবু বললেন, মেঘনাদবাবু, ঠিক এই কথাটা সে সময় আমিও জনার্দন প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু তিনি বলেছিলেন এর আগে নাকি বার কয়েক ভ্রমণে এসে এ সময়ের মুদ্রা তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। আমায় সে মুদ্রা দেখিয়েছেনও।

হুম! তারপর বলুন।

তারপর আর বিশেষ কিছু নেই মেঘনাদবাবু। জনার্দন প্যাটেলের প্রলোভনের জালে পড়ে আঙুলের পান্নার আঙটিটার বিনিময়ে বেশ কয়েক কেজি সোনা সংগ্রহ করে আবার টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে এলাম বর্তমান সময়ে। এরপর যাওয়ার সময়ের মতো ফেরার পথেও একইভাবে গাড়িতে তুলে চোখ বেঁধে জনার্দন প্যাটেল আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন উজ্জয়িনী স্টেশনে। সেখান থেকে ফিরে এলাম কলকাতায়।

সোজা হয়ে বসে বললাম, ভবদুলালবাবু, তাহলে তো আপনাকে এখন কোটিপতি বলতে হয়। বেশ কয়েক কেজি সোনার তালের মালিক হয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে!

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভবদুলালবাবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, আমি মহা লোভী, পাপী অর্ণববাবু। তারই ফল ফলেছে আমার কপালে। পান্না বসানো সেই আঙটির বাজারদর ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, কিন্তু আমার কাছে তার দর ছিল আরও বেশি। ওটা ছিল আমাদের বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক।

কিন্তু তার বিনিময়ে যা পেলেন.... .

কিচ্ছু না, কানাকড়ি দাম নেই। ভবদুলালবাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, সেই সব সোনার তাল এই ক'দিনে বহুবার বহু জায়গায় যাচাই করিয়েছি, কিন্তু এক গ্রাম সোনাও ওর মধ্যে আছে কেউ বলেনি।

বলেন কি।

হ্যাঁ অর্ণববাবু। পুরোটাই ধাপ্পা। পেতলের ওপর শুধু সোনার জল করা।

কয়েক মুহূর্ত আমার মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর ধীরে ধীরে বলি, আপনার কি ধারণা, ওই অতীত ভ্রমণ, মানে টাইম মেশিনের ব্যাপারটার মধ্যেও কোনো কারসাজি আছে?

সেটা কি করে বলি বলুন অর্ণববাবু। সেখানে সব কিছুই তো নিখুঁত ছিল, মানে সে সময়ের অতীতটা যেমন ছিল বলে ইতিহাস পড়ে জানা যায়। তাছাড়া যা কিছু সবই তো চোখের সামনেই ঘটলো।

ফটোটা এবার বার করুন। মেঘনাদ হঠাৎ বললো।

ভবদুলালবাবু কোনো কথা না বলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছোট ফটো বার করে এগিয়ে দিলেন।

সত্যিই বড় আশ্চর্য ফটো। এমন ফটো পৃথিবীতে আর কোনোদিন তোলা হয়েছে কিনা জানি না।

দেড় হাজার বছর পূর্বের উজ্জয়িনীর কোনো রাজপথ কি এমনই ছিল? ভবদুলালবাবু একটু আগে যেমন বর্ণনা দিচ্ছিলেন ঠিক সেই রকমই সব কিছু ফটোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো, ভবদুলালবাবু, একটু বড় সাইজ করে ফটোর একটা প্রিন্ট আমায় খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারেন?

অবশ্যই। আজ না পারি কালকের মধ্যেই আমি নিজে এসে আপনাকে দিয়ে যাব। শুধু আমার অনুরোধ, এ আশ্চর্য রহস্যের আপনি সমাধান করে দিন মেঘনাদবাবু, আর ওই কয়েক কেজি পেতলের পরিবর্তে ঠকিয়ে নেওয়া আমার মহামূল্যবান পান্নার আঙটিটা উদ্ধাব কবে দিন। এজন্য যা পারিশ্রমিক আপনি চান....

ভবদুলালবাবুর কথা শেষ হবাব আগেই মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, পারিশ্রমিকেব কথাটা পরে ভাবা যাবে, প্রথমে ফটোব কপিটা আপনি আমার হাতে দিয়ে যান। আপনার কেস খুবই ইন্টারেস্টিং।

তিন

নিরাপদ কুণ্ডুর চিঠি

দিন দুই বাদে মেঘনাদেব বাড়ি গেলাম। এই দুটি দিন নানা কাজের মধ্যেও সর্বক্ষণ ভেবেছি টাইম মেশিনে চড়ে ভবদুলালবাবুর অতীত ভ্রমণের সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাব কথাটা। সত্যিই এমন কি সম্ভব! গত একশো বছরে এই টাইম মেশিন নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে বেশ কয়েকটা কল্পবিজ্ঞানেব গল্প লেখা হলেও বাস্তবে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কেউই দিতে পাবেনি। অথচ ভবদুলালবাবু প্রমাণ পেয়েছেন হাতেনাতে। সোনাব বদলে পেতল পেয়ে প্রতাবিত হলেও অতীত ভ্রমণেব অভিজ্ঞতাটা অবিশ্বাস করতে পাবছেন না। নিখুঁত ছবিও তুলে এনেছেন।

তবে কি সত্যি সত্যি বিজ্ঞানেব এ এক অভাবিত আবিষ্কার? তবে তো পৃথিবীব ইতিহাসটাই বদলে যাবে। ল্যামবার্ট মানুষটারই বা হঠাৎ আবির্ভাব ঘটলো কোথা থেকে? ইউনিভাবসিটিতে আমার এক অধ্যাপক দাদা আছেন। বিজ্ঞান জগতেব অনেক খবরই উনি বাখেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কিন্তু অনেক চিন্তা কবেও উনি চার্লি ল্যামবার্ট নামে কোনো বিজ্ঞানীব কথা মনে করতে

পারেননি। তবে কি নামটা ভাঁড়ানো? গত দুদিন যাবৎ এসব ব্যাপার নিয়ে যত ভেবেছি ততই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আজ ঘরে ঢুকে দেখলাম মেঘনাদ চুপচাপ সোফায় বসে রয়েছে। পাশেই চলছে টেপ রেকর্ডার। সেদিন ভবদুলালবাবুর কথাগুলো টেপে বাজছে। আর সামনে টিপয়টার ওপর সেই দেড় হাজার বছর আগের আশ্চর্য ফটোটার একটা বড় সাইজের প্রিন্ট।

মেঘনাদ আমায় দেখে টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করলো। তারপর বললো, এসেছিস, ভাল হয়েছে। এটা পড়ে দেখ। মেঘনাদ একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিল।

এ তো দেখছি চিঠি। কার চিঠি?

পড়েই দেখ না।

পড়লাম। চিঠির বিষয়বস্তু হলো নিরাপদ কুণ্ডু নামে জনৈক প্রবাসী ব্যবসায়ী সম্প্রতি হংকং থেকে কলকাতা এসেছেন। খবরের কাগজে অতীত ভ্রমণের বিজ্ঞাপনটা দেখে বক্স নাম্বারে বিজ্ঞাপনদাতাকে লিখে জানাচ্ছেন, তিনি এই দুর্লভ সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক। এজন্য যে কোনো আর্থিক মূল্য দিতে রাজী। এরপর ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে তাঁকে খুবই সরল ভালমানুষ এবং এই আশ্চর্য ব্যাপারটায় নিদারুণ কৌতূহলী বোধ হয়।

চিঠিটা পড়া শেষ করে মুখ তুলে বললাম, কে এই ভদ্রলোক? এ চিঠি তোর কাছেই বা এল কি করে?

সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। মেঘনাদ আড়মোড়া ভেঙে বললো, তবে আপাততঃ এটুকু বোধহয় ভাবা যেতে পারে যে নিরাপদ কুণ্ডুর চেয়ে নিরাপদ শিকার আর পাওয়া যাবে না। টোপ হিসাবেও নয়।

বুঝলাম মেঘনাদ হেঁয়ালি শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ওর টেপ রেকর্ডারটা আবার চালু হয়ে গিয়েছে ঃ

"সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী অনুভূতি তা আপনাকে বোঝাবার ভাষা আমার জানা নেই মেঘনাদবাবু...সারা গোলকটা কেঁপে উঠলো থরথর করে...নানারঙের আলোর বৈচিত্র্য শুরু হলো...সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত গ্যাট্-গ্যাট্ গ্যাট্-গ্যাট্ শব্দ..."

আর থাকতে পারলাম না, অধৈর্যভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, হ্যাঁরে, এটুকুও কি বলবি না কেসটা সম্পর্কে এ পর্যন্ত কি ভেবেছিস? সময় অভিযানের আসল রহস্য কি?

মেঘনাদ টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললো, বলতে পারবি দেড় হাজার বছর আগে সম্রাট বিক্রমাদিত্য কাগজের ঠোঙায় মুড়ি খেতেন কিনা?

চার
ঠোঙার উৎস সন্ধান

বললাম, এসব কি বলছিস বল তো? এসব কথার কোনো জবাব হয়? কাগজের ঠোঙা! মুড়ি! আরে দেড় হাজার বছর আগে কাগজের ব্যবহারই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না বলে শুনেছি। তার ওপর.....

ব্যাস, ব্যাস, মেঘনাদ আমায় কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো, বাকিটা না বললেও চলবে, কারণ বিক্রমাদিত্যের মুড়ি খাওয়ার কথাটা মজা করে বলা। তাই বলে কাগজের ঠোঙার কথাটা পরিহাস নয়। তোর উত্তরটাও সঠিক।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও ধোঁয়াটে।

মেঘনাদ তখন সামনের টিপয়ের ওপর রাখা ভবদুলালবাবুর কাছ থেকে পাওয়া সেই আশ্চর্য ফটোটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ওর হাতে রয়েছে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। এতে ছবির প্রতিটি খুঁটিনাটি আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ ছবির ওপর চোখ রেখে বললো, এতদিন জানা ছিল, কাগজ তৈরি হয় প্রথম চীন দেশে সেই দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ। তারপর বিদ্যেটা সেখান থেকে যায় আরব মুলুকে আর ওই ঠোঙা বানাবার কাগজ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষে কেউ করতে শেখেনি। কিন্তু বন্ধু, এই ছবিটা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে সে সব ধারণা বদলে ফেলতে হবে।

বলতে বলতে মেঘনাদ উঠে গিয়ে ঘরের কোনে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করলো ঃ

হ্যালো...ভবদুলালবাবু...আমি মেঘনাদ ভরদ্বাজ বলছি...হ্যাঁ, একটা বিশেষ ইনফরমেশন চাইছি...আচ্ছা, মনে করে বলুন তো সেই অতীত যাত্রা করার সময়ে আপনার বা জনার্দন প্যাটেলের সঙ্গে কোনো কাগজের ঠোঙা ছিল কিনা...হ্যাঁ মশাই কাগজের ঠোঙা, বাজারে মুদিখানার দোকানে যা আকছার পাওয়া যায়...ছিল না...ঠিক বলছেন তো... কারণটা যথাসময়ে জানতে পারবেন...ধন্যবাদ!

মেঘনাদ ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলো। সোফায় বসে বললো, হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে এদিকে আয়। এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে ফটোর এই বিশেষ দিকটা ভাল করে নজর কর। কিছু দেখতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, ভাল করেই দেখলাম। প্রথমটা ঠিক বোঝা যায় না। তারপর মেঘনাদের কথায় আরও তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম। ঠোঙাই তো! রাজপথের ধারে এক গাছের নিচে পড়ে রয়েছে একটা কাগজের ঠোঙা। খবরের কাগজ কেটে বানানো এমন ঠোঙা পাড়ার যে কোনো মুদিখানার দোকানেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বেকার উজ্জয়িনীর রাজপথে খবরের কাগজের পাতায় বানানো ঠোঙা? টাইম মেশিনের ব্যাপারটা আবার নতুন করে ভাবা দরকার!

মেঘনাদকে সে কথা বলতে ও বললো, ঠিক বলেছিস। যারা এ ফাঁদ পেতেছে তারা রীতিমত চতুর। তবে সূত্র যখন একটা পেয়েছি সেই সূত্র ধরে টানতে দেরি করবো না। আর সে সূত্র টানবে নিরাপদ কুণ্ডু ওরফে অর্ণব সেন্।

সে কি কথা! অর্ণব সেন নিরাপদ কুণ্ডু হবে কোন দুঃখে?

দুঃখ নয় বন্ধু, এর মধ্যে রয়েছে রহস্যভেদী মেঘনাদের এ্যাসিসটেণ্ট হবার দায়িত্ব। তাছাড়া তোর চেয়ে ভাল 'নিরাপদ' আমি এখন পাব কোথায়?

পাঁচ
ইন্টারভ্যু

নিরাপদ কুণ্ডুর ভূমিকায় প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অভি॰ ্য .েশ ভালই করেছি। স্বয়ং মেঘনাদের মতোখুঁতখুঁতেও পিঠ চাপড়ে বলে॰- সাবাস অর্ণব, এতদিনে আমার এ্যাসিসটেণ্ট হওয়া তোর সার্থক হলো।

তা প্রথম অভিজ্ঞতাটা বেশ মজারই বলতে হয়। মেঘনাদে॰ অনুমান মতো বক্স নাম্বারে পাঠানো নিরাপদ কুণ্ডুর চিঠির জবাব যথাসময়ই এসেছিল এবং ভবদুলালবাবুর বিবরণ মতোই নিরাপদ কুণ্ডুর পরিচয়ে আমায় গিয়ে দেখা করতে হলো কলকাতার এক বড়ো হোটেলের স্যুইটে জনৈক বিকাশ শর্মার সঙ্গে।

বিকাশ শর্মা নিজের পরিচয় দিয়েছিল বিজ্ঞানী চার্লি ল্যামবার্টের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে। অন্ততঃপক্ষে এক ঘণ্টা ধরে সে আমার ইণ্টারভ্যু নিল। আমার ঠিকানা কুলজি থেকে শুরু করে আমার ব্যবসায়ে মাসিক উপার্জন কিছুই জানতে বাকি রাখলো না। নিরাপদ কুণ্ডুও বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সব কিছু জানাল। মনে হলো বিকাশ শর্মা সন্তুষ্টই হয়েছে। এরপর সে বিজ্ঞানী ল্যামবার্টের আবিষ্কারের কথাটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, অতীতের ঠিক কোন সময়টা আমি পরিভ্রমণ করতে চাই। মেঘনাদের শেখান মতো আমি তাকে জানালাম হাজার বছর আগের একটা সময়। কারণ সে সময়টা নাকি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। ভারতবর্ষের মাটিতে আরব বণিকদের যাতায়াত শুরু হয়েছে এবং এর কিছুকালের মধ্যেই মুসলমান আক্রমণ ঘটেছে সিন্ধু অঞ্চল দিয়ে।

বিকাশ শর্মা আমায় যাত্রার স্থান কাল জানাবে বলেছে। ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর খেলার মতো জমে উঠেছে সন্দেহ নেই।

ছয়
মাচার নিচে ছাগল

এই মুহূর্তে ট্রেনের একটা ফাস্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টের জানলার ধারে বসে আকাশ পাতাল ভাবছি। আমার চোখের সামনে অন্ধকার প্রকৃতি। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। ট্রেন ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। উজ্জয়িনী পৌঁছবো আগামীকাল ভোর নাগাদ। ট্রেনের রিভার্ভেশন চার্ট-এ আমার নাম আছে 'নিরাপদ কুণ্ডু'। ট্রেনের আয়নায় নিজেকে প্রথমে নিজেই চিনতে পারিনি। মাথার চুলের সিঁথি বদলে গেছে। চশমার ফ্রেমও বদলাতে হয়েছে। পরনে সাফারি স্যুট। সঙ্গে এ্যাটাচি। এইসঙ্গে ডান হাতের অনামিকায় রয়েছে বিরাট সাইজের একটা হীরের

আঙটি। আসল অবশ্য নয়, ঝুটো কাচ। কিন্তু সেট দেখে কারুর বোঝা সাধ্য হবে না।

অভিযানে বেরুবার আগে মেঘনাদ বলেছিল, চিন্তা করিসনি। আমাকে তুই দেখতে না পেলেও জানবি সর্বক্ষণ আমি তোর সঙ্গেই আছি। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কারণ যাত্রাপথেও ওদের লোক তোর ওপর নজর রাখবে এ [illegible] স্থির বিশ্বাস।

তা গোটা একটা দিন আর রাত কাটিয়েও কোনো দলেরই কোনো লোককে সন্দেহ করতে পারছি না। আমার সামনে তিনটে বার্থ-এ রয়েছে যথাক্রমে গেরুয়াধারী এক সাধু বাবা, একজন পাঞ্জাবী বিজনেসম্যান আর একজন হিপি সায়েব। এদের মধ্যে যে কেউ শত্রুপক্ষের নজরদার হতে পারে। মেঘনাদই বা কোথায়?

বাবুজি, এ বাবুজি...

ডাক শুনে ফিরে তাকালাম। সাধুবাবা তাঁর গেরুয়ার পকেট থেকে দামী ব্রাণ্ডের সিগারেট বার করেছেন, দেশলাই চাইছেন। দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সাধুবাবা বললেন, জিতা রহ বেটা।

এ সময় হঠাৎ সামনের সীটের কোণের পাঞ্জাবী যাত্রীটির দিকে চোখ পড়লো। লোকটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল। অজান্তেই বুকের ভেতরটা কেমন দুলে উঠলো। নিজেকে এখন যেন সেই শিকারীর মাচার নিচে বেঁধে রাখা ছাগলের মতো মনে হচ্ছে। কে জানে কি আছে কপালে!

সাত
টপ সিক্রেট

আজই সকালে উজ্জয়িনী স্টেশনে নেমেছি। যেমন কথা ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই নিজের ফাস্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টের সামনে একটা হলুদ রঙের রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি। দুজন লোক এগিয়ে এল। একজন বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা, মাথায় টাক। অন্যজনের ধূর্ত চোখের দৃষ্টি, শুকনো চেহারা।

দ্বিতীয় লোকটিই সামনে এসে ইংরাজীতে বললো, আমি কি মিঃ নিরাপদ কুণ্ডুর সঙ্গে কথা বলছি?

বললাম, হ্যাঁ, আমিই নিরাপদ কুণ্ডু।

আমি জনার্দন প্যাটেল, বিজ্ঞানী প্রফেসর চার্লি ল্যামবার্টের এ্যাসিসটেণ্ট। আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর।

নামটা আমার পরিচিত। ভবদুলাল সান্যালের মুখে শুনেছি। এই লোকটাই সান্যালমশাইকে টাইম মেশিনে চাপিয়ে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের আমলে নিয়ে গিয়ে হাজার পঞ্চাশ টাকার একটা পান্নার আঙটির বিনিময়ে সোনা বলে কয়েক কেজি

পেতল গছিয়ে দিয়েছিল। মনেব কথা মুখে না এনে বললাম, ধন্যবাদ। আমি প্রস্তুত।

এর পরে কি কি ঘটবে তাও আমি জানতাম।

একটা নীল বঙের এ্যামবাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল স্টেশনের বাইরে। ওরা আমায গাড়িতে তুলে বললো, মাফ করবেন, একটু কষ্ট দেব। বুঝতেই পারছেন, পুরো ব্যাপারটাই টপ সিক্রেট। সে কারণে আমাদের গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পুরো পথটাই আপনার দু চোখে বাঁধন দেবার নির্দেশ আছে।

স্বচ্ছন্দে। বলতে বলতে নিজেই মাথাটা এগিয়ে দিলাম।

ওরা আমার দু চোখে মোটা কাপড়েব একটা বাঁধন দিল, তারপর গাড়ি ছাড়লো।

ঠিক সেই সময় বাঁ পকেটে হাতটা ঠেকতেই পকেটের মধ্যে একটা কাগজ খসখস করে উঠলো। ও পকেটে কোনো কাগজ তো ছিল না! তার মানে কেউ কোনো সময নির্ঘাৎ ঢুকিযে দিযেছে। কিন্তু আপাততঃ তা পড়ে দেখবার উপায় নেই।

শহরেব বাইরে একটা বাগানঘেরা বাড়িতে পৌঁছে আমাব চোখর বাঁধন খুলে দিল। বাইরে থেকে বাড়িটা নিছক ভাঙাচোরা মনে হলেও ভেতরটা বেশ হালফ্যাশানের উপযোগী ছিমছাম সাজানো। ওরা সবসময়ই এ কথাটা ঘুরে ফিরে ব্যবহাব করছে—সব কিছুই 'টপ সিক্রেট'। বিজ্ঞানী প্রফেসর ল্যামবার্ট যে বিস্ময়কব আবিষ্কারটা করেছেন, যেহেতু তা এখনও এক্সপেরিমেন্টের পর্য্যায়ে বয়েছে, তাই নেহাত প্রয়োজনে বিশ্বস্ত কাউকে ছাড়া জানানো হচ্ছে না। এরকম এক্টা যুক্তি ওরা খাড়া করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে এই অতীত ভ্রমণে যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাও নাকি গবেষণার প্রযোজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য।

প্রফেসর ল্যামবার্টের সঙ্গে আলাপ হলো। ভবদুলালবাবু ঠিকই বলেছিলেন, মানুষটাকে দেখে কেমন যেন জবুথবু ধরনেব মনে হয়। উস্কোখুস্কো চুল, দাড়ি গোঁফ, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। চেহারা দেখে বযস অনুমান করা সম্ভব হয় না। ভাষাও বড় দুর্বোধ্য। যা কিছু কথাবার্তা সব ওই জনার্দন প্যাটেলের মাধ্যমেই হচ্ছিল। এ লোকটা যে কী পরিমাণ ধূর্ত তা ওর হাঁটাচলা, কথাবার্তার মধ্যেই টের পাওয়া যায়।

সারা দিনটা কেটে গেল। টাকাপয়সাব লেনদেনও হয়ে গেছে। করকরে পঁচিশ হাজার টাকা ক্যাশ গুনে নিয়েছে প্রফেসর। কথা আছে আজকের রাতটা কাটিয়ে আগামীকাল সকালে আমরা বেড়িয়ে পড়বো হাজার বছরের অতীত থেকে। সঙ্গে যাবে জনার্দন প্যাটেল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে সারাদিনে যা ঘটেছে সেসব কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সকালে গাড়িতে উঠে চোখ বাঁধা অবস্থায় পকেটে হাত দিয়ে কাগজের খরখরানি অনুভব করার কথাটা।

ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। উঠে গিয়ে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখা প্যান্টটার পকেটে হাত দিতেই একটা চিরকুট বেরিয়ে এল। পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা ঃ

নিরাপদ কুণ্ডু
ভাবছ মাথা মুণ্ডু
নজরটাকে শানিয়ে রেখো
কবচকুণ্ডল হারিও নাকো
মেঘের আড়ালে এ কোন জন
পড়ে নিও রামায়ণ।

পড়েই লাফিয়ে উঠলাম। ইস, আসল কথাটাই একেবারে খেয়াল ছিল না। লাইন দুটো আবার পড়লাম ঃ

নজরটাকে শানিয়ে রেখো
কবচকুণ্ডল হারিও নাকো।

ভাগ্যিস সংকেতটা ঠিক সময় খুলে পড়েছি।

আট
দু চোখে সর্ষেফুল

পরদিন ভোর না হতেই জনার্দন প্যাটেল এসে হাজির। মিঃ কুণ্ডু, চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নিন। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে অভিযানে বেরুবো। তার আগে এই পোশাকগুলোও বদলাতে হবে।

পোশাক বদলানোর কথাটাও ভবদুলালবাবুর কাছে আগে শুনেছিলাম। টাইম মেশিন নাকি যে সময়কালে পৌঁছবে তখনকার উপযোগী পোশাক আগে থেকেই পরে রেডি হয়ে থাকতে হয়।

আমরা অভিযান করবো দশম শতাব্দী কালে। আমাকে সজ্জিত করা হলো এক আরব বণিকের রূপসজ্জায়। জনার্দন প্যাটেল নিজেও সেই ধরনের পোশাকে নিজেকে সাজালো। এর মধ্যে আমার ডান হাতের আঙুলে সেই ঝুটো হীরের আঙটিটা তো রইলোই সেই সঙ্গে লুকিয়ে বুকে ঝুলিয়ে নিলাম এ অভিযানের সেই মোক্ষম কবচকুণ্ডলটি।

এরপর জনার্দন প্যাটেলের সঙ্গে গিয়ে পৌঁছলাম টাইম মেশিনের ঘরের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আপেক্ষা করছিলেন চার্লি ল্যামবার্ট নামে সেই অদ্ভুত মানুষটি। দুর্বোধ্য ভাষায় ধীর কণ্ঠে জনার্দন প্যাটেলকে কি সব নির্দেশ দিয়ে আমার হাত দুটো একসঙ্গে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যা বলে চললেন, আমি শুধু তার একটা কথাই বুঝতে পারলাম, হ্যাপি রিটার্ন...হ্যাপি রিটার্ন..।

ঘরের দরজা খোলা হলো। ভেতরে লাল রঙের দশ ফুট মতো ব্যাসার্ধের একটা ধাতব গোলক। এটাই বুঝি টাইম মেশিন! ভবদুলাল সান্যালের মুখে এটার কথা শুনেছি, এখন চাক্ষুষ পরিচয় হলো। কেন কে জানে এবার বুকের মধ্যে একটা ভয়ের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। হঠাৎ যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করছি।

জনার্দন প্যাটেল ততক্ষণে গোলকের প্রবেশদ্বার খুলে ফেলেছে। ভেতরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি। দুটো মাত্র সীট।

জনার্দন প্যাটেল বললো, আসুন মিঃ কুণ্ডু, আমরা মেশিনে ঢুকি।

জোর করেই নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে গোলকের ভেতর পা দিলাম এই সঙ্গে জনার্দন প্যাটেলের অলক্ষ্যে একবার বুকের কাছটা অনুভব করে নিলাম। ওখানেই আছে এ অভিযানে আমার একমাত্র রক্ষাকবচ—কবচকুণ্ডল।

গোলকের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর কোথাও কোনো ফোকর চোখে পড়ছে না। ভেতরে বোধহয় অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের অন্য ব্যবস্থা আছে। আমার চতুর্দিকে শুধু অচেনা অদ্ভুত নানাধরনের যন্ত্রপাতি, ঘড়ির ডায়াল, বিচিত্র বর্ণের আলো জ্বলছে, নিভছে।

আমরা এবার সময়ের হিসাবে ৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে ফিরে চললাম মিঃ কুণ্ডু...বলার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে লিভারটা টেনে নামাল জনার্দন প্যাটেল। সারা গোলক কেঁপে উঠলো থরথর করে। মনে হলো শরীরটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। চোখের সামনে নানা বর্ণের আলোর দপদপানি যেন চেতনার মধ্যে রঙ ছড়াতে শুরু করেছে। একটা গ্যাট্-গ্যাট্ আওয়াজ ভেসে আসছে কোথা থেকে।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারি না, হঠাৎ কানের পাশে যেন একটা বোমা ফাটলো। যা দেখলাম তা দেখবো একেবারেই আশা করিনি।

জনার্দন প্যাটেল আমার দিকে ঘুরে বসেছে। ওর হাতে একটা চকচকে রিভলবার। রিভলবারের নলটা আমার কপালে ঠেকিয়ে সব যান্ত্রিক আওয়াজ ছাপিয়ে সে গর্জন করে উঠলো, শয়তান তোমার সব চালাকি ধরা পড়ে গেছে। বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি তোমার আসল পরিচয়টা বল?

অতি কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে মিনমিনে কণ্ঠে বলতে গেলাম, পরিচয় তো আমার আলাদা কিছু নেই। আমি নিরাপদ কুণ্ডু। প্রবাসী ব্যবসায়ী। সম্প্রতি হংকং থেকে কলকাতায় এসে........

কথা আমার শেষ হলো না তার আগেই রিভলবারের বাঁটটা সজোরে এসে পড়লো আমার মাথার পেছনে। চোখে সর্ষেফুল দেখে জ্ঞান হারালাম।

নয়
বিনা মেঘে বজ্রপাত

যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালাম দেখলাম চারদিকে মরা আলো। আশপাশে রুক্ষ পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে এক একটা ঢিবি। দূরে দূরে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত তাদের আকার।

এ কোথায় এসে হাজির হয়েছি? এমন জায়গায় কে এনে ফেললো আমায়? এটা কি পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্ত?

ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগলো সব কিছু। বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপন......ভবদুলাল সান্যালের টাইম মেশিনে চড়ার অভিজ্ঞতা......দেড় হাজার বছর পূর্বের রাস্তায় কাগজের ঠোঙা...মেঘনাদের কথায় নিরাপদ কুণ্ডু ছদ্মবেশে উজ্জয়িনী আগমন......টাইম মেশিনে অভিযান...অকস্মাৎ জনার্দন প্যাটেলের হাতে রিভলবার.......তারপর......তারপর কি?

কিছু দূরে টিলাটা'র ওপাশে একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনছিলাম জ্ঞান ফিরে পাবার পর থেকেই। এখন একটা গর্জন শুনলাম। অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর গর্জন। অনেকটা মেঘের ডাকের মতো। টিলাটার পাশ থেকে সামনে কি একটা যেন এগিয়ে আসছে। প্রথমে ভেবেছিলাম আস্ত টিলাটাই। কিন্তু না, একটা জীব। কিন্তু এ কেমন ধরনের জীব? বিশাল ভয়ঙ্কর। আকার অনেকটা গিরগিটিরই মতো। কিন্তু গিরগিটির চাইতে হাজারগুণ বড়। ওর মাথা ওদিকের টিলা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে রয়েছে। অতিকায় জন্তুটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর ভারী শরীরটা টানতে টানতে।

জানোয়ারটা আরও এগিয়ে এসেছে। ও কি আমায় দেখতে পেয়েছে? আমি কি উঠে পালাব এখান থেকে? কিন্তু কোথায় যাব? এখানকার প্রকৃতি আমার সম্পূর্ণ অচেনা। ভাবতে ভাবতে আব একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনলাম। অন্য একটা টিলার পাশ থেকে মুখ বাড়িয়েছে আর এক অতিকায় অদ্ভূত জন্তু। এমন জন্তুও আমি আজ পর্যন্ত কোথাও কখনও দেখিনি। দেহখানা হাতির মতো, মুখটা লম্বাটে, পিঠের ওপর বড বড পাখনা উঁচু হয়ে রয়েছে। ল্যাজটা ছড়ান রয়েছে মাটির ওপর।

গ...র...র...র...।

হু...উ...উ...ম...ম...।

দুটো অতিকায় দানবই পরস্পরকে দেখতে পেয়েছে। দুজন দুজনেব দিকে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে, আর ভয়ঙ্কর গর্জন করছে। আকাশ বাতাস কাঁপছে গর্জনে। এমন দৃশ্যের সম্মুখীন এ পৃথিবীতে কোনো মানুষ কোনোদিন হয়েছে কিনা জানি না। তাহলে এ ঘটছে কোথায়? কোনখানে?

ভাবতে ভাবতেই চকিতে মনে এল কথাটা। এমন জানোয়ার আমি দেখেছি। বাস্তবে না দেখলেও ছবিতে প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের প্রাচীন জুরাসিক যুগের জানোয়ারদের চিত্রের মধ্যে। হুবহু এক ছবি। ওরা ছিল সে যুগের রাজা ডাইনোসর গোষ্ঠীর জানোয়ার। প্রথমটা একটা টাইনোসরস এবং দ্বিতীয়টা স্টিগোসরস। অন্ততপক্ষে দশ কোটি বছর আগে এরা রাজত্ব করতো পৃথিবীর বুকে। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। আমি যা ভাবছি তার অর্থ আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত দশ কোটি বছরের অতীত পৃথিবীতে।

নিজের হাতে চিমটি কাটলাম। এই তো বেশ ব্যথা অনুভব করছি। তার মানে চোখের সামনে যা দেখছি তা স্বপ্ন নয় বাস্তব। এদিকে চোখের সামনে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরত্বের মধ্যে দুই ডাইনোসর দানব মরণপণ লড়াইয়ে মেতে

উঠেছে। তাদের ভয়ঙ্কর গর্জন যুদ্ধের দাপাদাপিতে ধরণী কম্পিত।

তবে কি টাইম মেশিনের দ্বারাই এসব সম্ভব হয়েছে? বিজ্ঞানী ল্যামবার্ট সত্যি সত্যি আবিষ্কার করেছেন এমন এক যন্ত্র? বিজ্ঞানী ল্যামবার্টের ধূর্ত এ্যাসিসটেন্ট জনার্দন প্যাটেল আমায় চির নির্বাসনে ফেলে গেছে দশ কোটি বছরের অতীত পৃথিবীতে? এ চিন্তাতেই শরীর আব মনের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল।

সামনে ওই অ-মানুষিক লড়াই এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এক দানব অন্যটাকে কামড়ে ধরে ক্রমে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে টিলার ওধারে। এক সময় সেটা টিলার পেছনে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

মনের শেষ শক্তি সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। অবধারিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার আগে দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীর রূপটা যতটা সম্ভব ঘুরে দেখতে চাই। কিন্তু হেঁটে যাওয়া আর হলো না। অন্য একটা টিলার পেছনে হঠাৎ যেন লাল আলো জ্বলে উঠলো। দশ কোটি বছর পূর্বের পৃথিবীতে আলো জ্বাললো কে? একটু এগিয়ে উঁকি মারতেই চোখে পড়লো। ওই টিলাটার পেছনে সেই গোলাকার টাইম মেশিনটা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে ওটা কি আবার ফিরে এল? কি মতলব?

আশপাশটা ততক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠেছে। টাইম মেশিনের ধাতব গাত্র থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে আলো। টাইম মেশিনের দরজা খুলে নেমে এল দুজন। একজন ষণ্ডাগুণ্ডা টাকমাথা উজ্জয়িনী স্টেশনের সেই বেঁটে লোক, অন্যজন জনার্দন প্যাটেল।

কি মিস্টার কুণ্ডুচরণ, জনার্দন প্যাটেল এগিয়ে আসতে আসতে রীতিমত ব্যঙ্গ ভরে বললো, বলি জুরাসিক যুগের দুনিয়াটা কেমন দেখছ? এখন কি মনে হচ্ছে, টাইম মেশিন সত্যি না ধাপ্পা?

অমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিযে রইলাম শয়তানটার দিকে।

জনার্দন প্যাটেল এবার সামনে এসে নিজের কোমরে দুহাত রেখে বললো, এখন বল তো বাছাধন, এভাবে আমাদেব পেছনে টিকটিকিগিরি করতে কে তোমাকে পাঠিয়েছে? তোমার আসল নামটাই বা কি? শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা আর একবার টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে এসেছি দশ কোটি বছর পার হয়ে তোমার কাছে। কারণ ও দুটো তথ্য আমাদের খুবই দরকার।

আর থাকতে পারলাম না। প্রায় করুণ কণ্ঠেই বললাম, বলতে পারি শুধু একটা শর্তে। আমায় যদি খুন করতেও তোমাদের ইচ্ছে হয় আমার নিজের শতাব্দীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমরা। তারপর যেভাবে খুশি আমায় হত্যা করো। এই প্রাগৈতিহাসিক দানব উপত্যকায় অসহনীয় মৃত্যুর চেয়ে তাও ভাল।

বটে! বটে! জনার্দন প্যাটেলকে দেখে মনে হলো আমার এই করুণ আত্মসমর্পণে সে খুশিতে রীতিমত ডগমগ হয়ে উঠেছে। বললো, সেটা না হয় ভেবে দেখা যাবে। আগে তোমার পরিচয় পর্বটা তো শেষ হোক। মনে থাকে যেন মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে দশ মিনিট কাবার হয়ে গেছে।

মনের মধ্যে আমার আর বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ শক্তি নেই। যাকে বলে হাঁটু মুড়ে 'দ' হয়ে বসে বলতে শুরু করলাম, আমি নিরাপদ নই, আমার নাম অর্ণব সেন, আমার বাড়ি...

কিন্তু আমার পরিচয় পর্ব শেষ হবার আগেই বিনা মেঘে বজ্রপাত...

জনার্দন প্যাটেল ওরফে দীনদয়াল সিং তোমার খেলা শেষ। দুজনেই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।

ভীষণভাবে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি আশপাশের গাছপালাগুলোর পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে পুলিশবাহিনী আর সামনের টিলাটার পাশে উদ্যত রিভলবার হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে সে কোনো ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী নয়। রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ!!

দশ

অতি চালাকের গলায় দড়ি

মেঘনাদ বললো, যত ঝামেলার মূলে সেই চিরকুটটা যেটা উজ্জয়িনী স্টেশনে নামার সময়ে ছদ্মবেশে থেকে গোপনে একসময় তোর পকেটে চালান করে দিয়েছিলাম।

মানে সেই সংকেতলিপিটার কথা বলছিস তো?

হ্যাঁ। ওটা তোকে দিয়েছিলাম যাতে তোকে দেয়া সেই মাইক্রো ক্যাপসুল (যা সংকেতে 'কবচকুণ্ডল' বলা হয়েছে) অভিযানের আগে গলায় ঝুলিয়ে নিতে ভুলে না যাস। কারণ ওটার ওপরই নির্ভর করছিল অভিযানের আসল সাফল্য। সেই ক্যাপসুলের পাঠানো শব্দ তরঙ্গ সংকেত মারফৎই আমি খুঁজে বার করবো তোর হদিস, সেই সঙ্গে অপরাধীর ঠিকানা। কিন্তু তুই যে গোলমালটা করলি তা হলা আমার সে সংকেতবাণী পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলি না। ফল যা হবার হলো। আগেই বলেছি সারাক্ষণই ওদের দৃষ্টি তোর ওপর ছিল। তুই যখন বিকেলে বাগানে ঘুরতে গেছিস ওবা সেই অবকাশে এসে তোর প্যান্টের পকেট হাতড়ে চিরকুট পেল এবং সংকেতের ঠিক অর্থটা না বুঝলেও এর পেছনে যে একটা কারসাজি আছে সেটা টের পেল। রাত্রে তুই যখন ঘুমোচ্ছিলি সে সময় নিশ্চয়ই তোর আঙটিটাও যাচাই করে ওটা যে প্রকৃতপক্ষে হীরে নয়, ঝুটো কাচ তাও বুঝে গেল। আর তাবপরই ওরাও শয়তানি চাল চেলেছে। এক চালে ওরা দুভাবে বাজীমাৎ করতে চেয়েছিল— প্রথমতঃ তোর সত্য পরিচয় জেনে ওদের পেছনে কারা লেগেছে তার হদিস জানার চেষ্টা, সেই সঙ্গে তোকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়া যে টাইম মেশিন ব্যাপারটা সত্যি।

তাহলে আমায় মারবার ইচ্ছে ওদের ছিল না?

আমার তা মনে হয় না। তোকে মেরে ওদের লাভ কি, বরং ব্যাপারটা তোব কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারলেই আখেরে ওদের সুবিধে। তবে ওই অসম্ভব মানসিক চাপের মধ্যে তোর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা অসম্ভব ছিল না।

তা বটে, নিজের মনে ভাবি, এভাবে নিজেকে অসহায় বিপর্যস্ত কখনও বোধ করিনি।

এসব কথা হচ্ছিল ফিরতি পথে ট্রেনে ফাস্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের মধ্যে বসে। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গত দুদিন আগে টাইম মেশিন রহস্যের মীমাংসা হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে জালিয়াতি চক্রের মুল পাণ্ডারা। এদের গ্যাং লীডারের আসল নাম রতনলাল গ্রোভাল। সে গত কয়েক বছর আগে জয়পুরে সোনা তৈরির কৃত্রিম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে প্রচার করে কয়েকজন লোভী শেঠের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছিল। পুলিশ ধরতে পারেনি। আর জনার্দন প্যাটেল হলো তারই কুখ্যাত সঙ্গী দীনদয়াল সিং। এবারও এরা এক সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা ফেঁদে লাখ লাখ টাকা রোজগারের ধান্দা শুরু করেছিল। নাটের গুরু নিজের পরিচয় বানিয়েছিল বিজ্ঞানী চার্লি ল্যামবার্ট আর তার চেলা দীনদয়াল নিজেকে সাজিয়েছিল বিজ্ঞানীর এ্যাসিসটেন্ট জনার্দন প্যাটেল।

সত্যিই অদ্ভুত পরিকল্পনা। অথচ ব্যাপারটা কতই সহজ।

বলাই বাহুল্য টাইম মেশিন নামে যে গোলকটি তৈরি করা হয়েছিল ওটি পুরোপুরি ধাপ্পা। ওর মধ্যে কিছু বিচিত্র আকারের খেলনা যন্ত্র আর আলোর চমক ছাড়া সত্যিকার কোনো রহস্যই ছিল না। অভিযাত্রী যখন জনার্দন প্যাটেলের সঙ্গে সেই গোলকের ভেতরে ঢুকে বসতো তখন সে আর বাইরের কোন কিছুই চাক্ষুষ করতে পারতো না। এই অবকাশে বিজ্ঞানী ল্যামবার্ট ওরফে রতনলালের নির্দেশে ঘরের করোগেটের চালটা উঠিয়ে নেওয়া হতো ডালার মতো, তারপর একটা হেলিকপ্টার নেমে এসে তার শেকলের আংটায় গোলকটাকে তুলে নিয়ে যেতো কিছু দূরে এই শয়তান চক্রের তৈরি একটা নিজস্ব স্টুডিওর মধ্যে।

সেখানে আগে থেকেই তৈরি করা থাকতো নির্দিষ্ট অতীত সময়ের রূপটি। অনেকটা সিনেমার স্টুডিওর মতোই। সেখানে সব কিছুই কৃত্রিম ভাবে বানানো। কয়েকজন অভিনেতার একটা টিমও সেখানে সেই সময়ের উপযোগী ভূমিকায় অভিনয় করতো। মাত্র আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে ভাঁওতা ধরে ফেলা অভিযাত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ বন্ধ গোলকের মধ্যে শুরু থেকেই তার মনে সুকৌশলে টাইম মেশিনের এক বিশ্বাসযোগ্য বাতাবরণ সৃষ্টি করা হতো। তার পক্ষে আর কোনো কিছুই জানা সম্ভব হতো না।

এরপর শয়তানীর দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযাত্রীকে অতীতে নিয়ে গিয়ে তাকে লোভের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতো। ভবদুলালবাবুর মতো কারুরই সাধ্য হয়নি সেই ফাঁদে পা না দিয়ে বেরিয়ে আসা।

এই ভাবেই ব্যাপারটা চলছিল। কিন্তু ধাপ্পা ধরে ফেললো মেঘনাদ। টাইম মেশিনে অতীত পরিভ্রমণের ব্যাপারটা কল্পবিজ্ঞানে সম্ভব হলেও বাস্তবে যে সম্ভব নয়, সেটা আমারই মতো মেঘনাদেরও শুরু থেকেই মনে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে ধাপ্পা তার প্রথম সূত্র পেল ভবদুলালবাবুর তুলে আনা দেড় হাজার বছর

পুরনো কালোর ফটোর মধ্যে যখন কাগজের ঠোঙা দেখা গেল। বাকিটা তো সবই চোখের ওপর ঘটেছে।

মেঘনাদ এক্ষেত্রে যে 'কবচকুণ্ডল' অর্থাৎ মাইক্রোচিপের ব্যবহার করেছে সেটি সম্প্রতি বানিয়েছে কলোরাডার টেমার নামক সংস্থা। যার কাছে এই চিপ থাকবে দূর থেকে বেতার সংকেত পাঠিয়ে অন্যজনকে তার হদিস সর্বক্ষণ জানাবে।

মাইক্রোচিপটা আমার গলায় কবচকুণ্ডলের মতোই ঝুলছিল। ভাগ্যিস ওটা খোয়া যায়নি। তাহলে কি আর মেঘনাদ হদিস করে স্থানীয় পুলিশ ফোর্স এনে আমায় উদ্ধার করতে পারতো? এ ব্যাপারে স্থানীয় কোতোয়ালির অফিসার মিঃ চতুর্বেদী খুবই সহযোগিতা করেছেন।

এগার

শেষ পাতে রসগোল্লা

গতকাল ভবদুলাল সান্যাল এসেছিলেন। হাতে একটা বিরাট সাইজের রসগোল্লার হাঁড়ি। সেটা ঠক্ করে টেবিলে রেখে উনি মেঘনাদের হাতে তুলে দিলেন এক বড় অঙ্কের চেক। এই কেসে মেঘনাদের পারিশ্রমিক।

ভদ্রলোককে খুবই খুশি মনে হচ্ছিল। ওঁর অনামিকায় ঝকঝক করছে ফিরে পাওয়া সেই মহামূল্যবান পান্না বসান আংটি। পঁচিশ হাজার টাকাও ফেরত পেয়েছেন বলে জানালেন। অপরাধীরা তাদের সব অপরাধ স্বীকার করেছে।

ভবদুলালবাবু চলে যাবার পর বললাম, বাঃ! একই বলে কপাল। এ কেসে যা কিছু দুর্ভোগ আর ঝক্কি বইলাম আমি, আর ভবদুলাল সান্যাল রসগোল্লার হাঁড়ি সমেত পারিশ্রমিক দিয়ে গেলেন তোর হাতে।

উত্তরে মেঘনাদ হাঁড়ি থেকে গোটা দুই রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে আয়েস করে খেয়ে ছড়া কাটলো ঃ

যুদ্ধে যারে দেখা যায়
যুদ্ধটা কি সে চালায়?
মেঘের আড়ালে থাকে যে
শক্তিশেলে বাঁধে সে।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, কচু!

সঙ্গে সঙ্গে জোরে হেসে উঠে মেঘনাদ হাঁড়িটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, কচু নয় হে, নবীন ময়রার খাঁটি রসগোল্লা!